প্রথম প্রকাশ : শ্রীপঞ্চমী, ১০ই মাঘ, ১৩৬৭।

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী মহামায়া কর
১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রক :
শ্রীধর প্রিণ্টার্স
১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সেজদিকে দিলাম—

॥ বিমল ॥

গ্রন্থ-পরিচিতি

বছর তিরিশ আগে আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন আমাদের কাছে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ছিল দুটি—দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ও সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। প্রথম বইটির প্রকাশ উপলক্ষে লেখা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ, আর দ্বিতীয় বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য 'মহামূল্য শিরোভূষণ' রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। এই দুটি বই-ই ছিল গবেষণামূলক। আজ এই দুই বই ক্লাসিক পর্যায়ে উপনীত।

আজকাল বাংলা সাহিত্যের ছোট-বড় বহু ইতিহাস গ্রন্থ বেরিয়েছে। প্রধানতঃ সেগুলো পাঠ্য তালিকার প্রয়োজনে লেখা। বাংলা সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের মৌলিকতা এসব বইতে তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবু ব্যাপক পঠন-পাঠনের ফলে এসব বইয়ের কল্যাণেই বিষয়টি যেমন সহজ এবং সাবলীল হয়ে উঠেছে, তেমনি আমরা বিন্যাসগত বৈচিত্র্যকেও দেখতে পাচ্ছি। কেউ বিভিন্ন সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কেউ কোন তত্ত্ব অবলম্বনে সাহিত্যের ইতিহাসকে দেখেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুরনো বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেন নি। তিনি 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা' লিখেছিলেন। তাতে সন তারিখ নিয়ে তর্কে তিনি প্রবেশ করেন নি। তাঁর বইয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে সাহিত্য মূল্য নির্ণয়। সাহিত্য বিচারে তিনি অবলম্বন করেছেন আধুনিক সাহিত্য বিচার পদ্ধতি।

বাংলা সাহিত্যের বিবরণকে ইতিহাস রূপে পেতে হলে তার দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। প্রথমতঃ তাকে কালানুক্রমিক ও যুগবিভক্ত হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ নির্ণয়-সূত্রে কার্যকারণ যোগটি দেখাতে হবে। অবশ্য একাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব তখনই, যখন বইয়ের রচনাকাল এবং পাঠ নির্ণয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন ইতিহাস রচনার স্বীকৃত পদ্ধতির অবলম্বনে অগ্রসর হয়েছিলেন। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ, গৌড়ীয় যুগ, কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ ইত্যাদি নামকরণের দ্বারা ধর্ম কলহে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি যে সব অধ্যায় তিনি রচনা করেছিলেন তাতে বোঝা যায় সাহিত্যসৃষ্টির কার্যকারণ সম্বন্ধে তিনি কতখানি অবহিত ছিলেন। দীনেশচন্দ্র যেকালে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, সেকালের চিন্তাধারার মধ্যে এই নিয়ম সন্ধানের একটা সাধারণ প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকেও বলেছেন 'নিয়মের ফল'। শ্রীযুক্ত

সুকুমার সেন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসরণে শতাব্দ ভাগ করে এই ইতিহাসের বিন্যাস করেন। এই রীতি এ যাবৎ প্রচলিত। বিপুল পরিমাণ তথ্য এবং বহু মধ্যযুগীয় পুঁথির রচনাকাল নির্ণয় করে সাহিত্যের ইতিহাসকে উপকরণ সমৃদ্ধ করেন। তিনি প্রতি যুগের আরম্ভে এক একটি অধ্যায়ে যুগচরিত্রকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

আমাদের প্রচলিত বইগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে এতে সাহিত্যের শ্রেণীগত পরিচয়ই বিশেষ করে দেবার চেষ্টা থাকে। সেই সূত্রে প্রধান কয়েকজন কবির সম্বন্ধে বিস্তৃততর পরিচয় থাকে মাত্র। আমাদের স্কুল-কলেজের সাধারণ প্রয়োজন এতেই মিটে যায়। কিন্তু নেহাৎ প্রয়োজন মেটানো ছাড়া আর একটা বড় লক্ষ্য আছে, তা হচ্ছে ইতিহাস-বোধ ও সাহিত্য-বোধকে মেলানো। এই দুয়ের সার্থক সমন্বয় সহজলভ্য নয়। সেদিক থেকে শ্রীবিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের এই বইখানার প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

গ্রন্থকার চর্যাপদ থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রায় আটশো বছরের সাহিত্য বিবরণ রচনা করেছেন। পূর্বতন ইতিহাস রচনার যে রীতি-গুলোর উল্লেখ করেছি, এ বইতে তার সব কিছুরই আভাস আছে। 'আভাস' শব্দটা প্রয়োগ করলাম এইজন্যেই যে, গ্রন্থটির পরিসর বৃহৎ নয় বলেই এই আটশো বছরের ইতিহাসকে খুঁটিনাটি তথ্য দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সমালোচনায় লেখকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য থাকায় পাঠক এতে ভিন্ন এক স্বাদ পাবেন। সমালোচনাকে তিনি বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর মতামতের ঋজুতা, ভাষার পরিচ্ছন্নতা এবং ঐতিহাসিক যুক্তির সমাবেশ তাঁর সাহিত্য বিবরণকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছে। বৈষ্ণব সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য, ভারতচন্দ্র ও তৎকালীন যুগমানস বিশ্লেষণে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই সুখপাঠ্য বইটি শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহার্য মাত্র নয়, তার চেয়েও বড় প্রয়োজন সিদ্ধ করবে—সাহিত্য-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রকেই অবহেলিত পুরনো বাংলা সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে।

শ্রীভবতোষ দত্ত

মন্তব্য

স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুত বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিবর্তন' পুস্তক প্রকাশিত হতে দেখে ও পাঠ করে আনন্দিত হলাম। পুস্তকটি ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে লাগবে আশা করি।

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখকের নিবেদন

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভূদেব চৌধুরী, গোপাল হালদার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। বহু তথ্য এবং তত্ত্ব সমৃদ্ধ তাঁদের রচনা। প্রশ্নাতীত তাঁদের যোগ্যতা। আমি তাঁদের কাছ থেকে ঋণ করেছি, কোন নতুন তথ্য সংযোজনা এতে নেই। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে আমার এই প্রয়াস কেন? এর একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া কর্তব্য।

সাহিত্যের ইতিহাস দেশ, কালের পরিপ্রেক্ষিতে কবির জীবন ও জগতের প্রতি মনোভঙ্গীর (attitude) এবং তৎসঞ্জাত শিল্পরূপের কালানুক্রমিক বিবর্তনের মূল্যায়ণ। সুতরাং সাহিত্য মূল্যায়ণের মাপকাঠিতে সমাজচিন্তা, দর্শনচিন্তা মুখ্য নয়। সাহিত্য সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেল নাকি পিছিয়ে দিল, অর্থাৎ একালে যাকে বলা হয় প্রগতিশীল না প্রতিক্রিয়াশীল, এই সব বিচার সাহিত্যের এলাকায় পড়ে না। সাহিত্য-বিচারে লক্ষ্য করতে হবে যে, জাগতিক ব্যাপারের সংস্পর্শে এসে কবির যে আবেগ তরঙ্গিত হল তা ঠিক ভাষার প্রচ্ছদে রূপ পেল কি না। অবশ্য এমন মনে করলে ভুল করা হবে যে, আমি সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসকে গণনার মধ্যে আনছি না। ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই অবহিত থাকতে হবে। জাগতিক জ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতার ছাঁদ পাল্টে যায়। এই কারণে আমরা লক্ষ্য করেছি বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিরা সাধক হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মনোভঙ্গী এবং তৎসঞ্জাত শিল্পরূপের মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক হয়ে গেছে। লক্ষ্য করেছি মঙ্গল-কাব্যের কবিগোষ্ঠীদের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সগোত্রতা আদবেই নেই। এর পিছনে রয়েছে সমাজেতিহাসের বিবর্তনজনিত জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে অভিজ্ঞতার প্রভেদ। এটা যখন বুঝতে পারি তখন আমাদের সাহিত্য আস্বাদন হয় গভীর ও পরিচ্ছন্ন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবই জীবনের অঙ্গ। আর সাহিত্য জীবনের শিল্পায়িত রূপ। অতএব ঐ বিষয়-গুলোকে ছাঁটাই করা চলবে না। ঐগুলোকে মুখ্য করাতে আমার আপত্তি। তাই আমার বিচারে মুখ্য হল কবি-অভিজ্ঞতার (poetic experience) শিল্পায়িত রূপ। লক্ষণীয় হল কবির রূপ সৃষ্টি আমাদের চিত্তবৃত্তিকে কি ভাবে উদ্দীপিত করে, কোন্ ব্যঞ্জনার দীপ্তিতে আলোকিত করে সমগ্র সত্তাকে।

আমি মূলতঃ এই দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছি সাহিত্যের বিভিন্ন গোত্রের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি। অবশ্য এই কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে অসেতু-সম্ভব ব্যবধান না থাকলেও, সর্বত্র সেতু-বন্ধন সার্থক হয়েছে এমন দাবি করি না। আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে কি না সে বিচার করবেন পাঠকেরা। ত্রুটি-বিচ্যুতি যা কিছু পাঠকদের চোখে পড়বে তৎসম্পর্কে অবহিত করে সংশোধনের উপযুক্ত নির্দেশ দিলে বাধিত হব।

এবারে ঋণ স্বীকার এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পালা। যে সব শ্রদ্ধেয় লেখকদের গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি, তাঁদের গ্রন্থ এবং নামের উল্লেখ 'গ্রন্থ-পঞ্জী'তে করেছি। তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করি ডঃ অমলেন্দু বসুকে। তাঁর লিখিত "সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য সমালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধ আমার দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত "বাক্‌প্রতিমা" কথাটি তাঁর কাছ থেকে ধার করেছি। এই সুযোগে তাঁকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

এই প্রসঙ্গে একবার স্মরণ করি আমার অগ্রজোপম শিক্ষাগুরু রবি ঘোষকে। তিনি আমার সাহিত্য-বোধকে উদ্দীপিত করেছেন, অসীম ধৈর্যে সস্নেহে লালন করেছেন। নিছক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গুরু ঋণ পরিশোধ্য নয়। তাঁর আশীর্বাদ আমার সারস্বত সাধনার পাথেয় হক। এখানে স্মরণ করি রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ ক্ষুদিরাম দাসকে। বহু দূরে বহু ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি আমার খোঁজ-খবর নিয়ে প্রচেষ্টা ঝিমিয়ে পড়তে দেন নি। তাঁকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

ডঃ ভবতোষ দত্ত বহু ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও আমার প্রচেষ্টাকে সস্নেহে লালন করেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দিয়েছেন। সর্বোপরি 'গ্রন্থ পরিচিতি' লিখে দিয়ে গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। আমি তাঁর ছাত্রস্থানীয়। তাঁকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি।

আমার অনুজপ্রতিম সহকর্মী ইংরেজী সাহিত্যের কৃতি অধ্যাপক অম্লান-জ্যোতি মজুমদার লেখবার প্রেরণা যুগিয়ে, পাণ্ডুলিপি দেখে মূল্যবান আলোচনা করে কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাই না। কেননা বিলিতি 'এটিকেটে' আমার আস্থা নেই। সম্পর্কের নিবিড়তা মনে রেখে তাঁর অকৃপণ সাহায্য অনুজকৃত্য বলে গ্রহণ করলাম। এই মুহূর্তে স্মরণ করছি শ্রীমতী অর্চনা চট্টোপাধ্যায় এবং স্নেহভাজন ছাত্রী মমতা চক্রবর্তীকে। তাঁরা শ্রুতিলিখন নিয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরী সহজ-সাধ্য করেছেন।

যথেষ্ট যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু ছাপার ভুল রয়ে গেল। অবশ্য তেমন মারাত্মক ভুল বিশেষ নেই। তাই শুদ্ধিপত্র দিয়ে মাথা ভারী করলাম না। পাঠক সহানুভূতি দিয়ে ছাপার ভুল পেরিয়ে যাবেন বলে আশা করতে পারি।

পরিশেষে বলতে হয় আমার মেজদা শ্রীবিবেকভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। তিনি প্রকাশিকার সঙ্গে যোগাযোগ এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি কেবল লিখেই খালাস। তাঁর তৎপরতা ব্যতিরেকে গ্রন্থ প্রকাশনা এত শীঘ্র সম্ভব হত না। তাঁকে আমার প্রণাম নিবেদন করছি।

প্রকাশিকা শ্রীমতী মহামায়া কর লাভ-ক্ষতির চিন্তা পাশে সরিয়ে রেখে গ্রন্থ প্রকাশের গুরুদায়িত্ব নিয়ে চির-বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁকে আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম।

বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা

● প্রথম অধ্যায় ●

সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বাঙালীর কবিকৃতি এবং চর্যাপদ

[১]

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ শতাব্দীতে বৈদিক ভাষার কথ্যরূপ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল কতকগুলো উপভাষা। উপভাষাগুলো উদীচ্য, প্রতীচ্য, মধ্য দেশীয়, প্রাচ্য ও দাক্ষিণী নামে পরিচিত। এইগুলোকে মূল প্রাকৃত বা প্রাচীন প্রাকৃত বলা হয়। খ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে প্রাচীন প্রাকৃত থেকে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্ধমাগধী এবং পৈশাচী প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রাকৃতের জন্ম হল। খ্রীষ্টীয় ৬০০ শতাব্দীতে প্রাদেশিক প্রাকৃত বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হল তৎসংলগ্ন অপভ্রংশ ভাষা। আরো বিবর্তনের সূত্রে অপভ্রংশ থেকে জন্ম নিয়েছে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, অসমীয়া, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাসমূহ। মাগধী অপভ্রংশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ভাষা। এই কারণে এই ভাষাগুলোর মধ্যে চরিত্রগত ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কার বাংলা ভাষার (প্রাচীন বাংলার) নিদর্শন দেখতে পাই চর্যাপদে।

বাংলাভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা চর্যাপদে। অবশ্য চর্যাপদের আগেও বাঙালী কবিরা সাহিত্যচর্চা করেছেন। এই সাহিত্যচচার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা। এর কালসীমা গুপ্তযুগ থেকে সেনযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। উল্লিখিত কালসীমায় বাংলাদেশের সংস্কৃত চর্চার নিদর্শন ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন শিলালিপি, তাম্রলিপি, রাজপ্রশস্তি, দেবস্তুতি, স্মৃতি-সংহিতা, ন্যায়, ব্যাকরণ রচনার মধ্যে। এগুলো বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য নয়। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো, সেইটি হল বাংলাদেশের সংস্কৃত ব্যবহারের একটা বিশেষ রীতি গড়ে উঠেছিল। এই রীতিকে বলা হয় 'গৌড়ী রীতি'। এই রীতির লক্ষণ অনুপ্রাসবহুলতা এবং শব্দাড়ম্বর। শব্দ সংঘাতে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। শব্দাড়ম্বরের জন্য একে 'অক্ষরডম্বর' বলে। এই রীতি ক্রমবিবর্তনের পথে জয়দেবের কবিকৃতিতে সুষমামণ্ডিত হয়েছে। পরবর্তী বাংলাকাব্যেও এই রীতির সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে শিবের তাণ্ডবনৃত্যের বর্ণনায় গৌড়ী রীতির সার্থক ব্যবহার দেখতে পাই। যেমন :

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥"

অথবা

"লটাপট জটাজট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গা॥"

শব্দসংঘাতে সৃষ্ট ধ্বনি মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যকে প্রত্যক্ষ করায়, শিঙ্গাধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। কম্পিত জটাজুটের মধ্যে প্রবাহিত জাহ্নবীর ধারাকে যেন প্রত্যক্ষ করি এবং জলপ্রবাহের ছলছল-কলকল ধ্বনি কানে শুনি। মোটের উপর এই রীতির প্রয়োগে নৃত্যরত মহাদেবের মূর্তিটি আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বাঙালীর সংস্কৃত চর্চার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগ এইখানে অনুভব করা যায়। এইটে হল সংস্কৃত চর্চার ভাষাগত ঐতিহাসিক মূল্য। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রবিশেষে গৌড়ী রীতির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কবির অভিজ্ঞতাকে শিল্পায়িত করবার এও একটা উপযুক্ত মাধ্যম।

পাল রাজত্ব ও কবি অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্য ঃ

পালবংশের দেবপাল এবং রামপাল দেবের আমলে বাঙালীর উল্লেখযোগ্য কবিকৃতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই সময় সংস্কৃতে রচিত দুটি কাব্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। (১) কবি অভিনন্দ রচিত 'রামচরিত'। (২) সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত'। অভিনন্দ দেবপালের সভাকবি ছিলেন। অবশ্য তিনি বাঙালা ছিলেন কিনা তা নিয়ে সংশয় আছে। কিন্তু তাঁর 'রামচরিত' কাব্যে বাঙালী মেজাজের একটি মৌলিক দিক আভাসিত হয়েছে। দেবীর সাহায্যে লঙ্কাযুদ্ধ জয়ের প্রচ্ছদে ভক্তিভাবের প্রকাশ ঘটেছে। বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে এখানেই তাঁর পার্থক্য সূচিত হয়েছে। পরবর্তীকালে কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দেখব যে তিনি হুবহু বাল্মীকিকে অনুসরণ করেননি—সমগ্র রামায়ণ কাহিনীকে ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত করেছেন, বাঙালী মেজাজের অনুকূলে কাহিনী বিন্যাস করেছেন। অভিনন্দের সঙ্গে বাংলা কাব্যের এখানেই ঐতিহ্যগত যোগ।

সন্ধ্যাকর নন্দী বাঙালী কবি। তিনি নিজেকে 'কলিকাল বাল্মীকি' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর রচিত 'রামচরিত' দ্ব্যর্থবোধক কাব্য। আলংকারিক পরিভাষায় শ্লেষকাব্য বলা যেতে পারে। কাব্যটি চারটি পরিচ্ছেদে রচিত। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র এবং পালরাজা রামপাল দেবের কীর্তিকলাপ একাধারে

বর্ণিত হয়েছে। সন্ধ্যাকর সম্ভবতঃ কাব্যের ছাঁদ গ্রহণ করেছেন শ্রীকবিরাজ পণ্ডিতের 'রাঘব-পাণ্ডবীয়' কাব্য থেকে। ঐ কাব্যে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী একাধারে বর্ণিত হয়েছে।

'রামচরিতে'র লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল রাজপ্রশস্তি এবং দেবস্তুতির সুনিপুণ সমীকরণে। এই সমীকরণ লক্ষ্য করা যায় একই শ্লোকে কৃষ্ণ এবং শিবের স্তুতিরচনায় একই গুণবাচক শব্দের দ্ব্যর্থক প্রয়োগে। সাহিত্য যেহেতু বস্তু-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সাহিত্য বস্তুজীবনের শিল্পায়িতরূপ তাই অনুমান করতে বাধা নেই যে, ঐ সময় সমাজে শৈব-বৈষ্ণবের মধ্যে সমন্বয় সাধন চলছিল। আর সমন্বয়মুখীনতা বাঙালীর স্বভাবধর্ম।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল রচনাকৌশলগত। কাব্যে লক্ষ্য করি একটি আক্ষরিক অর্থ, অপরটি গূঢ় অর্থ। এই দিক থেকে অল্পপরবর্তী রচনা চর্যাপদের সঙ্গে তার মিল রয়েছে। অতএব এই কাব্যে বাঙালীর স্বভাবধর্ম এবং বিশেষ রচনারীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সেন রাজত্বকাল ও কবি জয়দেব :

সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল। সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট প্রসার ছিল। অবশ্য সেইটে সংস্কৃতের অবক্ষয়েরও যুগ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য। জয়দেব ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি। জয়দেবের সমসাময়িক কবিরা হলেন উমাপতি ধর, শরণ, ধোয়ী (ধোয়িক) ও গোবর্ধন আচার্য। এঁদের বলা হয় জয়দেবগোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে জয়দেবের কবিকৃতি কালোত্তীর্ণ এবং সর্বভারতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। বাংলা-কাব্যের সঙ্গে জয়দেবের কবিকৃতির নাড়ির যোগ রয়েছে। জয়দেবকে ছাড়া বাংলা-কাব্যের কথা, বিশেষ করে বৈষ্ণব-কাব্যের কথা চিন্তা করা যায় না।

'গীতগোবিন্দ' কাব্যে জয়দেব রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস বর্ণনা করেছেন। কাব্যটি ১২টি সর্গে রচিত। কাব্যের করণ-কৌশলে লক্ষ্য করি রাধা, কৃষ্ণ ও সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তির আশ্রয়ে কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। মাঝে মধ্যে বিবৃতি আছে, গান আছে। এই ছাঁদটি পরবর্তীকালে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' লক্ষ্য করব।

'গীতগোবিন্দ' যদিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত তথাপি একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এর ভাষা ও ছন্দভঙ্গি যতটা প্রাকৃত ঘেঁষা ততটা সংস্কৃতের নয়। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর ভাষাকে 'Sanskritized vernacular'

বলে অভিহিত করেছেন। বলা যেতে পারে 'গীতগোবিন্দে'র ভাষা সরলীকৃত সংস্কৃত—সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের কঠিন নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা নয়। বরঞ্চ লক্ষ্য করেছি 'বন্দেমাতরম্' গানের ভাষার সঙ্গে এর ঐক্য রয়েছে। আসলে জয়দেবের পদাবলী—"দেশীয়ভাব, ভাষাভঙ্গির অনুকরণে রচিত ধ্রুবপদ সমন্বিত গান"। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত এই মন্তব্য একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

'গীতগোবিন্দ' প্রেমের কাব্য। সংস্কৃত প্রেমের কাব্য প্রথাগত রূপের মধ্যে আবদ্ধ। তার মধ্যে কৃত্রিমতার ভাব রয়েছে। হৃদয়ানুভূতির অকুণ্ঠপ্রকাশ সেখানে বড় দেখা যায় না। জয়দেবের কাব্যে হৃদয়াবেগের অকুণ্ঠ প্রকাশ লক্ষ্য করি। যেমন:

"ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।"

পরবর্তীকালে বিদ্যাপতির 'হাথক দরপণ মাথক ফুল' পদকে স্মরণ করিয়ে দেবে। সংস্কৃত কাব্যের নায়িকারা এভাবে নিজেদের প্রকাশ করেন না। আমাদের আরও মনে হয় প্রকীর্ণ কবিতাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার যে প্রাকৃত রূপটি শিল্পায়িত হয়েছিল 'গীতগোবিন্দে' তাই সংহত রূপ লাভ করেছে। এখানে কৃষ্ণের ঐশী মহিমা নয়, প্রাকৃত প্রেমিকের রূপটি লক্ষ্য করি।

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের "ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী" অথবা "চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলং" পঙক্তিগুলো বাংলা বলে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। প্রথম পঙক্তির 'বসতি' কথাটি ছাড়া সবই বাংলা। দ্বিতীয় পঙক্তিতে অনুস্বারগুলো বসিয়ে ভাষাকে যেন জোর করে সংস্কৃতায়িত করা হয়েছে। অথবা জয়দেবের লিখিত "কলিতললিতবনমাল" আর রবীন্দ্রনাথের "ললিতগীতিকলিতকল্লোলে" বাক্যাংশের মধ্যে তফাত কতটুকু। ধ্বনিঝঙ্কারের ঐক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

'গীতগোবিন্দ' কাব্যের ছন্দের দিকে তাকালে সহজে বোঝা যায় সংস্কৃত ছন্দের কাঠামো অপেক্ষা প্রাকৃত অপভ্রংশের সঙ্গেই তার নাড়ির যোগ রয়েছে। সংস্কৃত ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস থাকলেও পদান্তের মিল থাকে না। অপরপক্ষে প্রাকৃত-অপভ্রংশ ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল অন্ত্যমিল। পরবর্তী বাংলা পয়ার ছন্দের সঙ্গে এর সগোত্রতা রয়েছে। এই কাব্যের প্রতিটি সর্গের প্রারম্ভে যে সংস্কৃত শ্লোক আছে তার সঙ্গে 'রাগমূলক পদাবলীর' তুলনা করলেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন মিলবে। এই ছন্দ পরে পয়ারে রূপান্তরিত হয়েছে।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ' গ্রন্থের ভূমিকায়

বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে প্যাটার্নের দিক থেকে 'গীতগোবিন্দের' সগোত্রতা দেশীয় গানের সঙ্গে সমধিক। সংস্কৃত কবিতায় চারটি করে পদ নিয়ে একটি স্তবক (stanza) তৈরী হয়। স্তবকগুলোর সমবায়ে একটি গোটা কাব্য গড়ে ওঠে। স্তবকগুলো পরস্পর সম্বন্ধ বা অসম্বন্ধ যাই হক না কেন, প্রতিটি স্তবক স্বয়ংসম্পূর্ণ। পদাবলীর ক্ষেত্রে তা নয়। পদাবলীর অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করা যায় না—সমগ্র কাব্যের প্যাটার্নের ভিতরেই তার অর্থ নিহিত। 'গীতগোবিন্দে' এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। পরবর্তী বৈষ্ণবকাব্যেও এই ধারার অনুবর্তন দেখা যাবে।

অতএব 'গীতগোবিন্দ' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের এবং মর্যাদার অধিকারী। কেননা বাংলা কাব্যের সঙ্গে এই কাব্যের রয়েছে নাড়ির যোগ। পরবর্তী বাংলা কাব্যকে নানাভাবে 'গীতগোবিন্দ' নিয়ন্ত্রিত করেছে।

জয়দেবের সমকালীন কবিদের মধ্যে ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অনুসরণে তিনি এই কাব্য রচনা করেছেন। এই কাব্যের অনন্যতা নেই, কোনো ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারেনি। এইকালে পাচ্ছি গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী'। 'আর্যাসপ্তশতী'তে অবৈধ প্রেম সম্পর্কিত দু-একটি শ্লোক পাওয়া যায় যাতে সমাজ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ প্রেম তিরস্কৃত হয়েছে। তবে 'আর্যাসপ্তশতী'তে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষার মধ্যে যে মৌলিক তফাত রয়েছে সেইটি কবি বেশ জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে কবি-শিল্পীরা ভাষাভেদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং নিজস্ব রীতি অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন। এই অনুসন্ধিৎসার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে।

[২]

সংস্কৃতে রচিত কিছু প্রকীর্ণ কবিতা দুটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই গ্রন্থ দুটির নাম 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। এই গ্রন্থ দুটিতে সংকলিত কবিতাগুলোতে বাঙালীয়ানা অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথমেই যা চোখে পড়ে সেইটে এর গীতিপ্রাণতা। গীতিপ্রাণতা বাংলা কবিতার ধাতুগত। এই দিক থেকে বাংলা কবিতার সঙ্গে এর যোগ অন্তরঙ্গ।

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় :

এফ. ডবলিউ. টমাস সাহেব নেপাল থেকে এই পুঁথিটি সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থের সংকলয়িতা কে জানা যায় না। কেননা পুঁথিটির প্রথম দিকের কয়েকটা পৃষ্ঠা নেই। ফলে আসল নামটি কি সেটিও জানবার উপায় নেই। তবে টীকাতে 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' কথাটির উল্লেখ আছে বলে গ্রন্থটি ঐ নামেই চলে আসছে। লিপিবিশারদেরা এই গ্রন্থের লিপি পরীক্ষা করে স্থির করেছেন যে, এটি দ্বাদশ শতকের লিপি, অক্ষর নেওয়ারী। এই অক্ষরের সঙ্গে তৎকালীন বাংলা অক্ষরের মিল আছে। এই পুঁথিতে ১১১ জন কবির কবিতা সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে কালিদাস, ভবভূতিও আছেন। আবার এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের কুলজী পরিচয় জানা যায় না, কিন্তু নাম দেখে মনে হয় তাঁরা বাঙালী, যেমন: শ্রীধর নন্দী, গৌড়-অভিনন্দ, রতিপাল ইত্যাদি। এঁদের রচনাতেও বাঙালী মেজাজ ফুটে উঠেছে। এই পুঁথিতে ঋতু বিষয়ক এবং আদি রসাত্মক কবিতা আছে। কবিদের মনোভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ।

সদুক্তিকর্ণামৃত :

শ্রীধর দাস এই গ্রন্থের সংকলক। গ্রন্থটির সংকলন শেষ হয়েছে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থে ৪৭৬টি শ্লোক আছে। শ্লোকগুলো ৫টি প্রবাহে বিন্যস্ত: (১) অমর প্রবাহ (২) শৃঙ্গার প্রবাহ (৩) চাটু প্রবাহ (৪) অপদেশ প্রবাহ (৫) উচ্চাবচ প্রবাহ। কালিদাস, ভাস, অমরু, ভর্তৃহরি, জয়দেব ইত্যাদি কবিদের পাশাপাশি লক্ষ্মণ সেন, কেশব সেন, উমাপতি, শরণ, ধোয়ী ইত্যাদির কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। প্রবাহবিন্যাস দেখেই বোঝা যায় যে, এটি বিচিত্র ধরণের কবিতার সংকলন 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। আর ঐ প্রবাহের নামকরণের সঙ্গে কাব্যবিষয়ের সঙ্গতিও আছে।

এই সংকলনে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতাবলীতে প্রাকৃত জীবন সংরাগের তীব্র জ্বালা কাব্য সৌন্দর্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের এখানে ঐশী মহিমা নেই— তাদের নামের আড়ালে মর্ত্য-প্রেমের ব্যঞ্জনা অনুভব করা যায়। ইন্দ্রিয় সংবেদী হয়েও ইন্দ্রিয়োত্তর জগতের দিকে হাতছানি দেয়। যেমন: "যঃ কৌমার হরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপাস্তে" বিখ্যাত পদটিতে রাধাকৃষ্ণের বেনামে মানবী-প্রেমের কথাই বলা হয়েছে। অথচ আমরা লক্ষ্য করছি রূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী' গ্রন্থে ঐ পদটি রাধিকার উক্তি হিসেবে গ্রহণ করে তার অধ্যাত্ম-তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজও 'চৈতন্য চরিতামৃত' কাব্যের

মধ্যলীলার ১ম ও ১৩শ পরিচ্ছেদে ঐ শ্লোকটি উদ্ধার করে অধ্যাত্ম অর্থ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। আসলে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে কালক্রমে আমাদের অধ্যাত্ম-সংস্কার জন্মে গেছে। ফলে, রাধাকৃষ্ণের নামেই আমরা অধ্যাত্ম-ভাবনা আরোপ করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এইসব কবিরা লৌকিক প্রেমের অভিজ্ঞতা রাধাকৃষ্ণকে আশ্রয় করে ব্যঞ্জিত করেছেন। ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই প্রেম দেহসমুখ, কিন্তু দেহসর্বস্ব নয়। পরবর্তীকালে বহু কবির অনুশীলনের সূত্রে তার আবেদন আরও সূক্ষ্মতর হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা সেইটি লক্ষ্য করব। আরও লক্ষ্য করব চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গে এসে চিত্তবৃত্তি হয়েছে পরিশোধিত, উদ্বর্তিত, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায় রূপান্তরিত হয়ে অধ্যাত্ম-রাগ-মণ্ডিত হয়েছে।

আসল কথা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথায় এই কালের কবিরা সম্ভোগকে প্রধান করে দেখেছেন। এমন কি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহ বাদ দিলে কাব্যটিকে সম্ভোগ প্রধান বলে গ্রহণ করতে হয়। আর বৈষ্ণব কবিরা বিরহকে মধ্য করে প্রেমের মধ্যে সূক্ষ্মতা এবং গভীরস্পর্শিতা সঞ্চার করেছেন এবং তা অধ্যাত্মলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই হল মুখ্য পার্থক্য।

চাটু প্রবাহে রাজপ্রশস্তি, বৃদ্ধ বন্দনা ইত্যাদি বিষয়ক কবিতা, অপদেশ প্রবাহে দেবস্তুতি, প্রকৃতি বর্ণনা; উচ্চাবচ প্রবাহে পল্লীজীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের বিষয় কাব্যরূপ লাভ করেছে।

[৩]

॥ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য ॥

গাথাসপ্তশতী, প্রাকৃতপৈঙ্গল ও দোহাকোষ ঃ

সমকালে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল প্রাকৃত সাহিত্য। প্রাকৃত বলবার কারণ হল এই যে, এই সাহিত্য সহজবোধ্য লোকমুখের ভাষায় রচিত। এই ভাষাই সেইকালের প্রকৃতিপুঞ্জের ভাষা। প্রাত্যহিক জীবন-ধারার সঙ্গে এর যোগ অত্যন্ত নিবিড়। প্রাত্যহিক জীবনের শিল্পায়িত রূপ লক্ষ্য করব এই রচনাবলীতে। এই জীবনধারার সঙ্গে বাঙালী জীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

গাথাসপ্তশতী :

'গাথাসপ্তশতী'র রচয়িতা কবি হাল। এঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে তর্ক আছে। কেউ অনুমান করেন খ্রীঃ পূঃ ২য় বা ১ম থেকে খ্রীষ্টাব্দ ১ম শতাব্দী পর্যন্ত সাতবাহন বংশের রাজত্বকালে এঁর আবির্ভাব। অপরের অনুমান খ্রীঃ ৫ম শতকের শেষে শালবাহন নামক কোন রাজা এই কাব্যের রচয়িতা। কাব্যটি পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ ভারতে। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে এইটি রচিত। এতে মোট ৭০০ শ্লোক আছে। এই গ্রন্থে প্রথম রাধার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে :

"মুহমারুএণ তং কণ্হ গোরঅং রাহিআ এঁ অবণেস্তো।
এতাণঁ বল্লবীনং অম্লান বি গোরঅং হরসি॥"

অর্থ হল—"কৃষ্ণ ফুঁ দিয়ে রাধিকার চোখ থেকে গোরুর পাদোত্থিত ধূলিকণা বের করবার অছিলায় রাধার মুখ চুম্বন করে অন্যান্য গোপীদের ঈর্ষার হেতু হয়েছেন।" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গোপীলীলার প্রাকৃত রূপটি এখানে ফুটে উঠেছে। ভাগবতে কৃষ্ণের গোপীলীলার ঐশী মহিমা এখানে নেই। পক্ষান্তরে আছে তার প্রাকৃত প্রেমিক রূপটি। দেখা যাচ্ছে, প্রেমের ছলাকলাতেও তিনি বেশ নিপুণ। এই পদে কবিকৃতির আরেকটি দিক লক্ষ্য করবার মতো। গোরুর পাদোত্থিত ধূলির উল্লেখে তিনি গোধূলি লগ্নের পরিবেশটি গড়ে তুলেছেন। এর ভিতরে পরবর্তীকালের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গল :

'প্রাকৃতপৈঙ্গলের' সংকলক পিঙ্গল। কাশীধামে ১৪শ শতাব্দীতে কাব্যটি সংকলিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই কাব্যে রাধাকৃষ্ণের গোপীলীলার প্রসঙ্গ আছে। কৃষ্ণের নৌকাবিলাসের একটি পদ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। পদটি হল :

"অরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব।
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি।
তুহুঁ এথনই সন্তার দেই।
জো চাহসি সো লেহি।"

অর্থ হল—"ওহে নৌকাচালক কৃষ্ণ, টালবাহানা ছাড়, দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করে দিয়ে যা চাও তাই নিয়ো।" বেশ বোঝা যাচ্ছে, কৃষ্ণ রাধিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে ভোগ করতে চান, ফলে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি

করেছেন যাতে রাধিকা তাঁকে দেহদানে স্বীকৃত হন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র নৌকা খণ্ডের সঙ্গে এর মিল রয়েছে। সেখানেও লক্ষ্য করব, কৃষ্ণ মাঝনদীতে নানা টালবাহানা করে রাধিকার দেহ ভোগের আয়োজন করেছেন। এই দিক থেকে পরবর্তী বাংলাকাব্যের সঙ্গে এর আন্তরিক যোগ রয়েছে। নৌকাবিহারের এই প্রাকৃত কাহিনী পরে অনেক পরিমার্জিত হয়ে অধ্যাত্মরাগরঞ্জিত হয়ে বাংলা কাব্যে এসেছে।

বাঙালী জীবনের ভোজন-বিলাসিতা দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ এই কাব্যে শিল্পায়িত হয়েছে। যেমন :

> "ওগ্‌গর ভত্তা, রম্ভঅ পত্তা।
> গাইক ঘিত্তা, দুদ্ধ সজুত্তা॥
> মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছা।
> দিজ্জই কন্তা, খাঅ পুণবন্তা॥"

অর্থ হল—"কান্তা কলাপাতায় করে সুসিদ্ধ ভাত, গাওয়া ঘি, দুধ, মৌরল্যা মাছ, নালতে শাক পরিবেষন করছেন, পুণ্যবান (কান্ত ?) আহার করছেন।" এমন বহু পদই আছে যার মধ্যে বাঙালিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট।

দোহাকোষ :

দোহাকোষগুলো অপভ্রংশে রচিত। এর সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগ রয়েছে। এর ভাষায় মাগধী অপভ্রংশ এবং শৌরসেনী প্রাকৃত অপভ্রংশের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। শৌরসেনী প্রথম স্বাতন্ত্র্য লাভ করে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে মাগধী অপভ্রংশের সঙ্গে তার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

'দোহাকোষে' এমন পদের সাক্ষাৎ পাচ্ছি যার সাধনতত্ত্বের সঙ্গে চর্যাপদ ও শাক্তপদাবলীর কবিদের সাধনতত্ত্বের আত্মিক যোগ রয়েছে। ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে চর্যাপদের সঙ্গে এর যোগ অত্যন্ত নিবিড়। যেমন :

> 'এথু সে সুরাসরি জমুনা এথু সে গঙ্গা সাঅরু।
> এথু পয়াগ বেণারসি এথু সে চন্দ দিবাঅরু॥'

অর্থ হল—"এখানেই (দেহের মধ্যেই) গঙ্গা, যমুনা, সুরেশ্বরী, এখানেই (দেহেই) প্রয়াগ, বারাণসী, চন্দ্র ও সূর্য রয়েছে। দেহকে কেন্দ্র করে সাধনার দ্বারা শুদ্ধ করে, আত্মদর্শন বাঙালী সাধনার বৈশিষ্ট্য এবং এই ধারা আজও অব্যাহত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, এই সব রচনায় বাঙালীর জীবনভঙ্গি, মেজাজ-মর্জি,

প্রকাশভঙ্গি অভিব্যক্ত হয়েছে। চর্যাপদের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালীর সাহিত্য-সাধনা বিভিন্ন খাত বেয়ে চলে আসছিল। সংস্কৃত সাহিত্য-সাধনার আভিজাত্যের সঙ্গে প্রাকৃত বাঙালী চেতনার জীবন রসিকতার সমীকরণের সূত্রে বাংলা সাহিত্যের পত্তন হয়েছিল। চর্যাপদে তার সংহত অভিব্যক্তি দেখা গেল। বক্ষ্যমান পরিচ্ছেদে তার বিস্তৃত আলোচনার অবসর নেই, তাই কেবলমাত্র দিগ্‌দর্শন করে আমরা চর্যাপদের আলোচনা সুরু করলাম।

[২]

॥ চর্যাপদ ॥

আবিষ্কার ও নামকরণ ঃ

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩১৬ সালে নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে তিনটি পুঁথি এবং চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেছিলেন। পুঁথি তিনটি হল ঃ

(ক) অদ্বয় বজ্রের সংস্কৃত টীকা সহ সরোজ বজ্রের দোহাকোষ।

(খ) "সংস্কৃত টীকামেখলা" সহ কৃষ্ণাচার্যের দোহাকোষ।

(গ) সংস্কৃত রচনাংশ সংবলিত ডাকার্ণব।

(ঘ) চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সব কয়টিকে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। চর্যাপদ ছাড়া অপর তিনটি পুঁথির অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তর্কের অবসর আছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে দোহাকোষের সঙ্গে চর্যাপদের আঙ্গিক এবং ভাবনার মৌলিক ঐক্য আছে। যাই হক না কেন, আমরা বর্তমানে চর্যাপদের ভিতরে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আনুকূল্যে উল্লিখিত দোহাকোষ দুইটি সহ "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়ে চর্যাপদের সম্পাদনা করেন। পরে তিনি পুঁথির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত অনুসরণ করে নাম পাল্টে গ্রন্থটির নামকরণ করলেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। চর্যার টীকাকার মুনিদত্তের অনুসরণে কোনও কোনও সমালোচক এর নামকরণ করতে চেয়েছেন 'আশ্চর্যচর্যাচয়'। তবে 'চর্যাপদ' নামেই বর্তমানে গ্রন্থটি পরিচিত এবং গৃহীত হয়েছে। আমরা 'চর্যাপদ' বলেই গ্রন্থটিকে অভিহিত করব।

রচনাকাল ঃ

চর্যাপদের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন মনে করেন চর্যার রচনা-কাল ৭ম৷৮ম শতক থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত বিস্তৃত। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় স্থির করেছেন চর্যাপদের রচনাকাল ১০ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই মতটি এখন সর্বজনগ্রাহ্য। কারণ এই সিদ্ধান্ত আরো কতকগুলো তথ্য সমর্থিত। এক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, চর্যাপদের অন্যতম পদকার লুইপাদ 'অভিসময়বিভঙ্গ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান উক্ত গ্রন্থ রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। দীপঙ্কর তিব্বতে আসেন ১০৩৮খ্রীঃ। আবার লুইপাদকে সিদ্ধাচার্যদের আদিগুরু বলে স্বীকার করা হয়। এর থেকে অনুমিত হয় লুইপাদ ১০ম শতাব্দীর লোক। দুই, চর্যাপদে কাহ্নপদের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন দোহাকোষের কবি কৃষ্ণাচার্য এবং কাহ্ন একই ব্যক্তি। তাঁর 'হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নাবলী' পাল রাজাদের শেষ রাজা গোবিন্দপালের আমলে রচিত। আবার গোরক্ষনাথের শিষ্য পরম্পরার হিসেবে কাহ্নপাদ তাঁর প্রশিষ্য। জালন্ধরীপাদ বা হাড়িপা হলেন কাহ্নর গুরু। ইনি ১২শ শতকের লোক। তিন, চর্যাপদে বৌদ্ধধর্মের সহজযান শাখার সাধন কথা বিবৃত হয়েছে। সহজযান সম্প্রদায়ের প্রভাব এবং প্রসার ছিল ১০ম থেকে ১২শ শতক পর্যন্ত। চার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বলেছেন যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর ভাষা আদি-মধ্যযুগের ভাষা এবং ১৪শ শতকের শেষভাগে কাব্যটি রচিত হয়ে থাকবে। চর্যাপদ-এর দুশো বছর আগে রচিত হয়েছে বলে ধরা হয়। এই সবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে চর্যাপদ ১০ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে।

পুঁথি পরিচয় ও কাব্য মূল্য ঃ

চর্যাপদ নামে সংকলনটির প্রকৃত নাম 'চর্যাগীতিকোষ'। সংস্কৃত টীকার নাম 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। নেপাল থেকে প্রাপ্ত পুঁথিটি মুনিদত্তের টীকাসহ পাওয়া গেছে। অবশ্য এইটে মূল পুঁথি নয়—তার নকল। এই সংকলনের লিপিকার দুটো পৃথক পুঁথি থেকে মূল পদ ও সংস্কৃত টীকা নকল করেছেন। মূল পুঁথিতে ৫১টি পদ ছিল। লাড়াডোম্বীপাদের রচিত ১১ সংখ্যক পদের টীকা মুনিদত্ত করেননি বলে সংকলক সেইটি বাদ দিয়েছেন। ফলে পদের সংখ্যা দাঁড়ালো

৫০টি। এর মধ্যে ২৪, ২৫ ও ৪৮ সংখ্যক পদের হদিশ মেলে না। কারণ পুঁথিটি খণ্ডিত। আবার ২৩ সংখ্যক পদটি খণ্ডিত। অতএব মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৬½টি। ২৪ জন কবি এই পদগুলির রচয়িতা। কবিরা সকলেই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। ভুসুকু, লুই, সবর, ঢেণ্টণ, ডোম্বি, কম্বলাম্বর, দারিক, কাহ্ন ইত্যাদি তাঁদের ব্যবহৃত ছদ্মনাম। প্রত্যেকের নামের শেষে 'পাদ' বা 'পা' শব্দটি যুক্ত আছে। তবে একটা কথা আছে, যদিও ক্রমিক সংখ্যায় ২৪ জনের নাম পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু কেউ-কেউ একাধিক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন বলে অনেকে অনুমান করেছেন। তাই চর্যাপদের কবির সংখ্যা স্থির নিশ্চিত করে বলবার উপায় নেই। চর্যাকারেরা সকলেই ধর্মমতে সহজিয়া বৌদ্ধ। এই সাধকেরা আপনাদের সাধনতত্ত্ব এবং নিগূঢ় অনুভূতিকে নানা প্রকার প্রতীক ও সংকেতের সহায়তায় কাব্যরূপ দিয়েছেন। এরই ফাঁকে ফাঁকে তাঁদের দার্শনিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। চর্যাপদের ভাষা কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। সেইজন্য এই ভাষাকে 'আলো আঁধারি' বা 'সন্ধ্যাভাষা' বলা হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতের ভাষার বা আঙ্গিকের সঙ্গে চর্যাপদের সগোত্রতা লক্ষ্য করবার মতো। চর্যাপদের আপাত অর্থ এক রকমের এবং তা লোকজীবনাশ্রয়ী, আবার অন্তর্নিহিত অর্থ ভিন্ন এবং তা বিশিষ্ট সাধনমার্গের অর্থবাহী। চর্যাপদের লোকজীবনমুখিতার জন্যই তা ধর্মভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কাজেই বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, তত্ত্ব না জানলেও চর্যাপদের কাব্যরস আস্বাদনে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না, আর ধর্মমতে দীক্ষিত হলে আস্বাদনের প্রকারভেদ ঘটে। কেননা সিদ্ধাচার্যেরা তাঁদের মন্ময় অনুভূতি প্রকাশের বাহন করেছেন প্রাকৃত-জীবনকে। উপমা, অলঙ্কার চয়নে বারবার প্রাকৃত জীবনের কথা এসে পড়েছে। ফলে চর্যাপদ জীবন-রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সৃষ্টির ভিতরে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ হয়ে থাকে, সৃষ্টি থেকে তাঁর ব্যক্তিক-সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। আবার যে-কোনও তত্ত্ব ব্যক্তির অনুভূতির স্পর্শে সাহিত্য হয়ে উঠে। চর্যাপদে ব্যক্তির অনুভব-সাক্ষিকতা পদগুলিকে মন্ময় ধর্মী (subjective) গীতি কবিতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে। এইবার দু' একটা উদ্ধৃতাংশ দিয়ে বক্তব্য পরিস্ফুট করা যাক :

"উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী ॥
নানা তরুবর মৌউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলো মহাসুহে কাপূর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক্ পুচ্ছিআ বিন্ধ নিঅমন বাণে।
একে শরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম ণিবাণে ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-সিহর-সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসে ॥"

[২৮ নং চর্যা]

এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল—"মানুষের সহজ স্বরূপ মায়ায় আবৃত থাকে। মায়াবদ্ধ জীব বিষয়ানন্দে মত্ত থেকে তাকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাকে উপলব্ধি করতে হলে কায়বাক্চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে অবিদ্যাপ্রপঞ্চকে জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট করে গুরু নির্দেশিত পথে তার ধ্যানে একাগ্রচিত্ত হয়ে পরম নির্বাণ লাভ করা যায়।" কিন্তু এই নিগূঢ় অর্থ বাদ দিলেও এই চর্যায় নরনারীর দেহাসক্তি-মূলক মিলনাকাঙ্ক্ষা যেভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে তা অত্যন্ত উপভোগ্য। কবিতাটিতে রতি শৃঙ্গার রসে আস্বাদ্যমান হয়ে তত্ত্বজ্ঞানহীন সংবেদনশীল পাঠক চিত্তকে রসাবিষ্ট করেছে।

এই কবিতার বাক্‌প্রতিমায় ভোগস্পৃহা-উদ্দীপক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে কবি মোহবিভ্রম সৃষ্টি করেছেন। পার্বত্যবাসী শবর-শবরীর নিবিড় প্রণয়াকৃতির যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়েছে তাতেই এর কাব্যত্ব। ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, গুঞ্জামালায় নয়নলোভন শবরীকে দেখে শবর আসঙ্গলিপ্সায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তার উন্মত্ততার ঝোঁক শবরীর পক্ষে সামলানো কঠিন ব্যাপার, সেইজন্যে তার মিনতি, —"উমতো সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি" প্রথমে "উমতো সবরো পাগল সবরো" সম্বোধনে স্নেহসূচক মনোভাব, তাতে রভস-মিলনের প্রশ্রয় যেন আছে, কিন্তু রাঙা আঁখি শবরকে দেখে যেন একটু ভীতির শিহরণও জাগে, তাই "গুলী গুহাড়া তোহোরি" কথায় যে ভাবে আছড়ে পড়েছে তাতে মিনতির ভাব ফুটে ওঠে। সবমিলে মিলনের ইচ্ছে, শারীর

শিহরণ, চাপা উল্লাস, ভীতির জড়াজড়ি-মেশামেশি। এর মূলে প্রথমে সম্বোধনের ভঙ্গি তারই অনুষঙ্গে "তোহোরি" কথাটির যোগ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে প্রথমে স্বর যে পর্দায় ছিল শেষে তা অনেক নীচে নেমে গেছে, আর এই দুয়ের মধ্যেখানে ফুঁড়ে উঠেছে "গুলী গুহাড়া" শব্দটির ধ্বনি। এখানে পদটির মাধুর্য। অথবা ৩৩নং চর্যায় :

"টালত ঘর মোর নাহি পড়িবেশী।
হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বডহিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামায়॥"

এখানেও তত্ত্ববিবিক্ত ভাবে দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট অতিরিক্ত সন্তান-পুষ্ট সংসারের অতিথি সৎকারের অক্ষমতার ক্ষোভ পরিস্ফুট হয়েছে। একেই বলেছি চর্যার সাহিত্যরস। এই গুণেই চর্যাপদ ধর্মকথা হয়েও সাহিত্য হয়েছে। এর মূলে রয়েছে প্রাকৃত জীবনরস প্রকাশভঙ্গির সিদ্ধি।

প্রাকৃত জীবনধারা ভাব-প্রকাশের অবলম্বন হওয়াতে সেদিনকার সমাজচিত্র চর্যাপদে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তেমনই প্রতিবিম্বিত হয়েছে নদীমাতৃক বাংলাদেশের, আরণ্যক বাংলাদেশের ভৌগোলিক চিত্রলেখা।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ :

চর্যাপদে কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ এবং ওড়িয়া মৈথিলী শব্দের ব্যবহার থাকায় রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও ডঃ জয়কান্ত মিশ্র চর্যাপদকে পূরবীয়া হিন্দী বলে দাবি করেছেন। কিন্তু তাঁদের দাবির পিছনে খুব জোরালো কৈফিয়ৎ নেই। কারণ মনে রাখতে হবে সেদিনকার বাংলাদেশের সীমানা ছিল সুবিস্তৃত। বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের কিয়দংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। চর্যাকারেরা অনেকেই ছিলেন সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী। চর্যাপদের রচনাকালে বাংলাভাষা সবেমাত্র মাগধী অপভ্রংশের খোলস ছাড়তে সুরু করেছিল। অথচ তখনও পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে শৌরসেনী প্রাকৃত অপভ্রংশ ছিল শিষ্ট ভাষা। আসাম, উড়িষ্যায় আঞ্চলিক ভাষা মাগধী অপভ্রংশ থেকে গড়ে উঠছিল। বাঙালী কবিরা নবসৃষ্ট বাংলা এবং শৌরসেনী অপভ্রংশে পদ রচনা করতেন। বিশেষতঃ সীমান্তবাসী বাঙালীর রচনায় উভয় ভাষার মিলন থাকাটা আশ্চর্য নয়। তাই সংমিশ্রণের ভিতর থেকে দু-চারটে পশ্চিমা অপভ্রংশের সাক্ষীর জোরে চর্যাপদের উপর হিন্দী-ভাষীদের অধিকার বর্তায় না।

বরঞ্চ বাঙালী পণ্ডিতেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, চর্যাপদের রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, বাগ্‌ভঙ্গিমা, শব্দ যোজনা, পদ-গঠন রীতি, ছন্দ, সন্ধ্যাভাষা, প্রবচন ইত্যাদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণ-সত্তার সঙ্গে জড়িত। যেমন বলা যেতে পারে সম্বন্ধ পদে 'অর' বিভক্তি, সম্প্রদানে 'কে', অধিকরণে 'অন্ত', 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ ; ক্রিয়ার কাল বোঝাতে অতীতকালে 'ইল', ভবিষ্যতকালে 'ইব' ব্যবহার, ধ্বনিতত্ত্বে অ-কারের ও-কারের মতো উচ্চারণ, জ, য, ণ, শ উচ্চারণে অভিন্নতা, হ্রস্ব এবং দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণে অভিন্নতা, প্রবচনে "অপণাঁ মাংসেঁ হরিণা বৈরী," "হাথের কাঙ্কণ মা লেউ দাপণ", "বর সুন গোহালী কিমো দুট্‌ঠো বলন্দেঁ" ইত্যাদি কথার ব্যবহার, শব্দযোজনা ও বাগ্‌ভঙ্গিমায় "গুণিয়া লেহুঁ", "দিল ভণিআ", "উঠি গেল", "আখি বুঝিঅ" ছন্দে পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহার, মন্ময়ধর্মী গীতিপ্রাণতা চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত করেছে গভীরভাবে।

ধর্ম-সংস্কৃতির বিচারে দেখা যাবে বাংলাদেশের তন্ত্র সাধনার সঙ্গে তার আত্মিক যোগ রয়েছে। তত্ত্বকে বস্তুরূপে জীবনের ভিতরে লাভ করবার বিশিষ্ট প্রবণতা বাঙ্গালীর মেজাজে রয়েছে। এখানেই বাঙালীর জীবনরস-রসিকতা। দার্শনিক চিন্তায় অমৃতত্ব লাভের জন্য বহির্মুখীন ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখীন করবার কথা বলা হয়েছে, তার কার্যকর পন্থা হল সাধনপ্রণালী। এর পারিভাষিক নাম "উল্টাসাধন"। দেহকে কেন্দ্র করে দেহোত্তীর্ণ হওয়াই তার কাম্য। চর্যাপদে ঐ সাধনার কথা বিবৃত হয়েছে সন্ধ্যাভাষায়। বাংলার নাথ, বাউল, সহজিয়া বৈষ্ণব, সাঁই, দরবেশ, শাক্ত সাধনার সঙ্গে এর রয়েছে নাড়ির যোগ, এমন কি প্রকাশভঙ্গির সঙ্গেও এর যোগ অতি নিবিড়। কাজেই চর্যাপদের ভিতরে বাংলা দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনধারার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। তাই চর্যাপদকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্বসূরী বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

● দ্বিতীয় অধ্যায় ●

বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

রাষ্ট্রিক দুর্যোগ ও সামাজিক বিবর্তন :

চর্যাপদ ছাড়া আর কোনও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন আমাদের হস্তগত হয় নি। এর কারণ তুর্কী আক্রমণ ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয়। খ্রীষ্টীয় ১২০০ অব্দে বাংলা দেশে তুর্কী অভিযান সুরু হয়। জাতি হিসেবে তুর্কীরা ছিল দুর্ধর্ষ এবং কঠোর প্রকৃতির, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইসলামী ধর্মোন্মাদনা। যা কিছু ইসলাম ধর্ম বহির্ভূত তাই ছিল তাদের চোখে 'কুফেরি'। তাই এই দেশে সামরিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী, শাস্ত্র-সংস্কৃতি, শিল্পকলা ধ্বংস করবার তাণ্ডব নৃত্যে তারা মেতে উঠেছিল। তুর্কীদের অত্যাচারের ভয়াবহতায় বাঙালী স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। সৃষ্টির প্রেরণা গিয়েছিল পঙ্গু হয়ে। ফলে দুই শতাব্দী ব্যাপী বাংলা সাহিত্যের কোনো প্রসার বা উন্নয়ন ঘটে নি। এই দু'শ বছর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হল, "সাহিত্য শূন্যতার ইতিহাস।"

আবার এই অন্ধকারময় যুগ বাংলার সমাজ বিবর্তনের ত্বরান্বিত হওয়ার যুগ। তুর্কী আক্রমণের অভিঘাতে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সমাজ নিম্নবর্ণের সঙ্গে একই ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের ধর্ম সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্য কেবলমাত্র হিন্দু পরিচয়ের ছত্রতলে দাঁড়িয়ে সামাজিক প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তুলেছিল। এর ফল হল দুই রকমের। প্রথমতঃ, আত্মরক্ষার তাগিদে দুইটি বর্ণ একত্রিত হওয়ার ফলে উভয়ের ভাব-ভাবনার সমীকরণ ঘটেছিল, লৌকিক দেবতাদের আর্যীকরণ ঘটেছিল এবং নিম্নবর্ণের মানুষেরা নিজেদের মানসিকতা অনুযায়ী উচ্চ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। লোকজীবনের সঙ্গে সংযুক্তির ফলে বাংলার নিজস্ব লৌকিক ধর্মাশ্রিত আখ্যায়িকাগুলো 'মঙ্গল-কাব্য'-রূপে বিকশিত হল, অপরদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগস্থাপিত হল অনুবাদ কাব্যের সূত্র ধরে। এইটে হল প্রগতির দিক। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিক্রিয়ার দিক হল ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্য, গোঁড়ামি জনিত বিমুখতা।

এ ছাড়াও এই দেশে দীর্ঘ দিন বসবাসের ফলে, এদেশের মানুষের সঙ্গে সামাজিক আদান প্রদানের ফলে বিজেতারাও বাঙালী হয়ে পড়েছিলেন।

অপরপক্ষে পূর্ব বাংলার বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেও মূলতঃ তাঁরা ছিলেন বাঙালী। এর ফলে বাঙালী সংস্কৃতি বিকাশের পথে, বিস্তারের পথে কোন বাধা রইল না। মুসলমান নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় তুর্কী অভিঘানের দুশো বছর পর থেকে বাংলা সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। এইখানে মধ্যযুগের সূত্রপাত। এর আদি পর্বে আছে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। আমরা যে সমীকরণের কথা উল্লেখ করেছি তার অস্ফুট প্রকাশ অবচেতনভাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' দেখা যায়। আদি পর্বে এইটেই স্বাভাবিক; পরিপূর্ণ সমীকরণে আরও সময় লেগেছিল। এর পূর্ণায়ত রূপ দেখা যাবে মঙ্গল কাব্যে, বৈষ্ণব কাব্যে, অনুবাদ কাব্যে। একটু বিস্তৃত করে বলা যেতে পারে, অভিজাত ও লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে ধীর লয়ে যে সমীকরণ অজ্ঞাতসারে হয়ে আসছিল জয়দেব, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাসের ভাবসাধনায় তাই ত্বরান্বিত হয়েছে তুর্কী আক্রমণের অভিঘাতে। শুধু তাই নয়, নবীন জীবন চেতনা ও মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মধ্যযুগের সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ঐ মিলনাকাঙ্ক্ষার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার সার্বিক জীবনাদর্শে উত্তরণ ঘটেছে চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে প্রাক্‌চৈতন্য এবং পরচৈতন্য যুগ বলে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রাক্‌চৈতন্য যুগের তোরণপথে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার ও নামকরণ :

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৩১৬ সালে বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের এক ভদ্রলোকের গোয়ালঘর থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিটি উদ্ধার করেন। ১৩২৩ সালে তাঁর সম্পাদনায় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৌজন্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুঁথিটি আদ্যন্ত খণ্ডিত, ভিতরেও কয়েকটি পাতা নেই। ফলে গ্রন্থটির নাম কি ছিল জানা যায় নি। বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ করেছেন। তবে পরোক্ষ সাক্ষ্য-প্রমাণে জানা যায় যে এই গ্রন্থটির নাম ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ'। একটি তুলোট কাগজের রসিদে দেখা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন নামে কোন ব্যক্তি সন ১০৮৯, ২১শে অগ্রহায়ণ; ৯৫ পৃঃ থেকে ১১০ পৃষ্ঠা মোট ১৬ পৃষ্ঠা নিয়ে গিয়েছিলেন। ঐ রসিদে পুঁথিটিকে 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই মনে করা যেতে পারে ঐ সময় পর্যন্ত পুঁথিটির নামপত্রটি ছিল। পরে হারিয়ে গেছে। ঐ রসিদে উল্লিখিত নাম থেকে পুঁথিটির নাম হওয়া উচিত 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ'। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম গ্রন্থ প্রকাশের কাল

থেকে চালু থাকায় এখন সংস্কারে বসে গেছে এবং ঐ নামেই গ্রন্থটি গৃহীত হয়েছে।

চণ্ডীদাস সমস্যা ও পুঁথি রচনাকাল :

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কারের পূর্বে বাংলা দেশের পাঠক চণ্ডীদাস বলতে একমাত্র পদাবলীর চণ্ডীদাসকে বুঝত। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র আবিষ্কার একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব ঘোষণা করল। এখান থেকেই চণ্ডীদাস সমস্যার উৎপত্তি। কোনও কোনও সমালোচক একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, যৌবনে চণ্ডীদাস রিরংসাতপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেছিলেন এবং প্রৌঢ়কালে পদাবলী রচনা করেছিলেন। মূলতঃ কবি একজনই। সমস্যার এতটা সরলীকরণ যুক্তিনিষ্ঠ নয়। কারণ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং পদাবলীর ভাষার মধ্যে বিবর্তনজাত ব্যবধান রয়েছে, এছাড়াও কবি-ভাবনা, মনন, কাহিনী পরিকল্পনা, আঙ্গিক ইত্যাদির ভিতরেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বিচার করে দেখেছেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র ভাষা আদি-মধ্য-যুগের বাংলা ভাষা। পদাবলীর ভাষা তা নয়। পদাবলীর ভাষা অনেকটা প্রাগ্রসর। ভাষার বিবর্তনের কালে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে উত্তীর্ণ হতে ন্যূনতম পক্ষে ২০০ বছর সময় লেগেছে। দ্বিতীয়তঃ পদাবলীতে আছে পূর্বরাগ, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' আছে পূর্বভোগ। পদাবলীর রাধা মহাভাব-স্বরূপিণী, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা মানবী-মূর্তি। পদাবলী অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' লৌকিক রসসিক্ত। এর উপর অধ্যাত্মব্যঞ্জনার আরোপ ঘটেছে শ্রীচৈতন্যের আস্বাদনের সূত্র ধরে। জয়দেব, বিদ্যাপতি সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা যেতে পারে। কাজেই এইটে স্থির সিদ্ধান্ত যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং পদাবলীর চণ্ডীদাস ভিন্ন ব্যক্তি। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে এবং রসরুচির বিচারে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে বড়ু চণ্ডীদাস পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি এবং প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি।

কাব্য পরিচয় :

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটির কবি বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যটি আদ্যন্ত খণ্ডিত, ভিতরেও কয়েকটি পাতা নেই। পুঁথিতে তিন ধরণের হস্তলিপি পাওয়া যায়। এই কাব্যের বিষয়বস্তু কৃষ্ণলীলা। যদিও কংসের বধের নিমিত্ত কৃষ্ণের মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ঐ-পর্যন্তই। আসলে কাব্যে

কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলার বর্ণনাই কবির উপজীব্য। কৃষ্ণের সম্ভোগের পোষ্টাই-এর জন্য লক্ষ্মী রাধা রূপে মর্ত্যধামে দেবতাদের অনুরোধে অবতীর্ণা হয়েছেন—প্রথম খণ্ডে রয়েছে এই কাহিনী। পরবর্তী বারোটি খণ্ডে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যে তেরটি খণ্ড আছে—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালীয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ। বিভিন্ন খণ্ডের নামকরণ সেই খণ্ডের কাহিনীর সঙ্গে বেশ মানানসই হয়েছে। উল্লিখিত তেরটি খণ্ডের মধ্যে কাব্যোৎকর্ষের বিচারে বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ শ্রেষ্ঠ। বড়ু চণ্ডীদাস প্রচলিত লোকগাথা এবং পুরাণকাহিনীর সমবায়ে কাব্যটি রচনা করেছেন। এই কাব্যের মূল বক্তব্য হল, ছলে-বলে-কৌশলে কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার দেহভোগের আয়োজন, তারপর ধীরে ধীরে রাধার কৃষ্ণপ্রাণা হয়ে উঠবার মুখে রাধাকে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের মথুরা যাত্রা এবং রাধার বিরহ বর্ণনা। রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বিবৃত করবার কৌশল হিসেবে নাট্য, গীতি এবং বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছেন কবি বড়ু চণ্ডীদাস।

কাব্যবিচার ও সাহিত্য মূল্য :

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে চরিত্র আছে ছয়টি—রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই, যশোদা, বলরাম ও নারদ। এদের মধ্যে রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই প্রধান। যশোদা, বলরাম, বড়াই রাধাকৃষ্ণের লীলার সহায়ক পটভূমিকা রচনা করেছেন। নারদের ভিতর দিয়ে স্থূল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন কবি। যশোদা, বলরাম ও বড়াই-এর মধ্যে বড়াই-এর ভূমিকা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। বড়াই রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের প্রত্যক্ষ সহায়তা করেছে। বড়াই চরিত্রের পরিকল্পনায় কবি বাৎস্যায়নের কামসূত্রের তাত্ত্বিকতার দ্বারা এবং দামোদর গুপ্তের 'কুট্টিনীমতম্', জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণনরত্নাকরে'র কুট্টিনী চরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকলেও বড়াই পুরোপুরি কুট্টিনী নয়—তার ভিতরে মানবিক গুণ রয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ "মধুর-লীলা-বিলাসী শ্যামরায়" নয়—দেহমনে সুস্থ, স্বাস্থ্যবান, রূপলোলুপ, অমার্জিত গ্রাম্য যুবক। এই চরিত্রের dynamic ক্রমপরিণতি নাই—চরিত্রে মাধুর্য, সৌকুমার্য নাই। তবে কৃষ্ণের স্থূল গোঁয়াতুর্মির পরিপ্রেক্ষিতে রাধার চরিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এইখানেই তার সার্থকতা। রাধা চরিত্র পরিকল্পনায় কবির প্রতিভা তুঙ্গ স্পর্শ করেছে। কবি ঘটনার ঘাতে-সংঘাতে, দেহ ও মনের দোটানায় অত্যন্ত নিপুণভাবে পড়তে পড়তে রাধার চরিত্রের যে ক্রমপরিণতি দেখিয়েছেন তা একালের ঔপন্যাসিকেরও ঈর্ষার বস্তু।

বড়ুর রাধা পদাবলীর "মহাভাব-স্বরূপিণী রাধা-ঠাকুরাণী" নয়—কোনও ভাব নির্যাস নয়—রক্তমাংসে সজীব, প্রাণোত্তাপে চঞ্চলা, বাক্য-কুশলা বাস্তব চরিত্র ; মনে হয়, পায়ে কাঁটা ফুটলে রক্ত ফেটে পড়বে। চরিত্র সৃষ্টিতে কবি বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টির অনুসরণ করেছেন। তাই রাধার মর্মবেদনা যেখানে লিরিক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে সেখানেও তা রাধার বেদনা হয়ে ফুটেছে। রাধাকৃষ্ণের রূপ বর্ণনাতেও কবি তাদের চোখ দিয়ে দেখেছেন পরস্পরের রূপজৌলুসকে। চরিত্রকার হিসেবে বড়ুর কৃতিত্ব প্রশংসার যোগ্য। কবি একই সঙ্গে রাধা ও কৃষ্ণের মুখোস পরেছেন।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কাহিনীটি রাধা, কৃষ্ণ, বড়াই-এর সংলাপের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। মাঝে মধ্যে কাহিনীর যোগসূত্র রক্ষা করেছে বিবৃতি এবং গভীর হৃদয়-ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি আশ্রয় নিয়েছেন গীতির। কাজেই দেখা যাচ্ছে কাব্যে গীতি, নাট্য এবং বিবৃতির সমন্বয় ঘটেছে এবং সমন্বয় কৌশলে কাব্যটি হয়েছে জীবনঘনিষ্ঠ। কারণ জীবনে ঐ তিনটির সমন্বয় মাত্রাভেদে রয়েছে। ঐ তিনটি গুণের সমন্বয় কাব্যে ঘটেছে বলে কাব্যটিকে "গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ পরিহাসের সূক্ষ্মতা তেমন দেখা যায় না। সে ক্ষেত্রে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতরে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তির্যকতা অবশ্যই লক্ষ্য করবার মতো। এই ধারা মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রে দেখা যাবে। চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব এই কারণে উল্লেখযোগ্য যে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ নাগরধর্মী এবং এর মূলে থাকে অসঙ্গতিজনিত বুদ্ধিবিলাস। ভারতচন্দ্রের পরিবেশ নাগরধর্মী ছিল এবং ব্যঙ্গবিদ্রূপের সহায়তা করেছিল। চণ্ডীদাস গ্রামীণ পরিবেশের ভিতরে থেকেও ব্যঙ্গবিদ্রূপের রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন। এইখানে কবির কৃতিত্ব।

এই কাব্যে উপমা, অলংকার-বৈচিত্র্য এবং তার প্রয়োগ-কুশলতা কবিশক্তির নিদর্শন। বিশেষ নায়ক-নায়িকার কলহ, মন-মেজাজের উত্তাপ, দৃঢ় অসম্মতি, প্রেমের আত্মনিবেদন ইত্যাদির রূপায়ণে কবি চলমান প্রত্যক্ষ-গোচর জীবনধারা থেকে উপমা চয়ন করে প্রয়োগ কুশলতার গুণে কাব্য-গুণোপেত করে তুলেছেন। পক্ষান্তরে প্রাকৃত জীবন-সংসক্তি এবং জীবন-সম্ভোগের নবরীতি বাংলা কাব্যকে সংস্কৃত কাব্যের উপবিভাগ থেকে মুক্ত করে স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছন্দের বিচারে দেখা যাবে পয়ার, ত্রিপদী ছাড়াও অনেক নতুন ছন্দের প্রয়োগ করেছেন কবি। বৈষ্ণব পদাবলীতে ঐ ছন্দ পরিমার্জিত হয়ে পরিণত রূপ লাভ

করেছে। এই কাব্যের ভাষা আদি-মধ্য-যুগের বাংলা ভাষা। চর্যাপদের তুলনায় একটু বেশি সংস্কৃতানুসারী। বোধ হয় এইটে পৌরাণিক চেতনার ফলশ্রুতি।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে অধ্যাত্মরূপক ব্যঞ্জনা ছিল না—তবে এই কথা বলা অসঙ্গত হবে না যে, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, নৌকাখণ্ড, দানখণ্ডে নায়িকার ছলাকলা, নায়কের উৎপীড়নমূলতার অন্তরালে পরস্পরের মিলনোৎকণ্ঠার যে প্রচ্ছন্ন প্রেরণা ছিল তাই পরবর্তী অভিসারের পদে উপরকার আবরণ সরিয়ে প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাসে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিকায় প্রেম সাধনার দুরূহতায় রূপান্তরিত হয়েছে। কাম এবং প্রেম একই বৃত্তির দুই রূপ। কাম বিবর্তিত এবং উদ্বর্তিত হয়ে প্রেমে রূপান্তরিত হয়। এইটে জীবনের ধর্ম। এই কাব্যের বংশীখণ্ড এবং রাধাবিরহে তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে। এইটি পরে বৈষ্ণব পদাবলীতে পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। এইখানে কৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে বৈষ্ণব কাব্যের ঐতিহাসিক যোগ। বড়ুর কাব্যের ইঙ্গিত পরবর্তী কাব্যে পূর্ণতা লাভ করেছে, এইখানে এই কাব্যের অনন্যতা।

● তৃতীয় অধ্যায় ●

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব এবং ঐতিহাসিক পটভূমি :

ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন,—"বাংলাদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রথম আলোকরশ্মি পড়তে সুরু হয়েছে উত্তর-পশ্চিম থেকে আর্যদের আগমনের ও বসতি স্থাপনের পর হতে। তার পূর্বে এদেশে দ্রাবিড়, মোঙ্গল, কোল প্রভৃতি যে সব অনার্য জাতির বাস ছিল, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইসারা পাই শুধু কতকগুলি স্থানের নাম এবং কয়েকটি চলিত শব্দে।" এর থেকে বোঝা যায় এদেশে আর্য-সভ্যতা বিস্তারের আগে যারা ছিল তারা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। অনার্য সংস্কৃতিতে লৌকিক দেব-দেবীর সংখ্যাও কম নয়। এই দেবদেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে পাঁচালী গানে। আর্যসভ্যতার চাপে পড়ে তা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায় নি। এই রকম অনুমান করা যেতে পারে। ঐ পাঁচালী কাব্যের ভিতরে আজকের মঙ্গলকাব্যের বীজ নিহিত ছিল। তুর্কী আক্রমণের প্রবল অভিঘাতে আর্য-অনার্য যখন পরস্পরের নিকটে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন দ্রুতগতিতে উভয় সংস্কৃতির সমীকরণ ঘটতে থাকে। এমত সময় অনার্য লৌকিক দেবতাদের আর্যীকরণ ঘটে। আর্যেতর দেবদেবীরা এই সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তবে ঐ প্রতিষ্ঠা বড়ো সহজে ঘটেনি—অনেক বিরোধ সংঘাতের ভিতর দিয়ে তাঁরা সার্বিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের প্রতিষ্ঠা লাভের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্য বা বলা যেতে পারে পাঁচালী কাব্যগুলো গোত্রান্তরিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে। এই প্রসঙ্গে পুরাণ কাব্যের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের যোগাযোগের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। আর্যেতর দেবতাদের আর্যীকরণের আকাঙ্ক্ষা থেকে পুরাণ-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছিল। মঙ্গলকাব্যেও একই উদ্দেশ্যের অনুবর্তন ঘটেছে। কাজেই পুরাণ-সাহিত্যের কাঠামোতে বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করবার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক-ভাবেই এসেছে। এরই ফলে মঙ্গলকাব্যের সংস্কারগত রূপাঙ্গিক গড়ে উঠেছে। অবশ্য পুরাণকার এবং মঙ্গলকাব্যের কবিদের কবি-অভিজ্ঞতার (Poetic-experience) মধ্যে পার্থক্য হল গোড়ঘেঁষা। যদিও লক্ষ্য করি উভয়ক্ষেত্রে

কোন একটি আখ্যানকে অবলম্বন করে দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। দেবতাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। পুরাণে দেবতার প্রতিষ্ঠালাভের মুখে কোন বাধা নেই—কোন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি তাঁকে হতে হয় না। মঙ্গলকাব্যে দেখি কোন একজন স্বর্গবাসী মানবদেহ ধারণ করে মর্ত্যে আসেন কোন একটি বিশেষ দেবতার পূজা প্রচার করবার উদ্দেশ্যে। তাঁকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, নানা বাধা-বিরোধ অতিক্রম করে দেবতার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে হয়। ফলে কাব্যে নাটকীয় 'টেনশন' সৃষ্টি হয়। পুরাণে এমন অবকাশ নেই। যেহেতু পুরাণের সঙ্গে মর্ত্যজীবনের যোগ যৎসামান্য এবং মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পার্থিব জীবনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ তাই মঙ্গলকাব্যের Human interest অনেক বেশি।

দ্বিতীয় কথা, পুরাণ সর্গ, প্রতি সর্গে বিভক্ত। এতে সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রজাসৃষ্টি, রাজবংশ বা ঋষিবংশের বংশ পরিচয়, তাঁদের কার্যাবলী, মন্বন্তর বর্ণিত হয়। মঙ্গলকাব্যে দেখি সর্গ এবং প্রতি সর্গ খণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। 'দেবখণ্ডে' সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা, দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনাদি পুরাণানুগ। 'নরখণ্ডে' অভিশপ্ত স্বর্গচ্যুত দম্পতির উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা প্রচার কাহিনী বিবৃত হয়। নরখণ্ডের মানবিক আবেদন এর কাব্যোৎকর্ষের কারণ। দেবখণ্ড ও নরখণ্ডের মধ্যে নাড়ির সম্পর্ক নেই—যেন আলগাভাবে জোড়া। নরখণ্ডের কাব্যিক আবেদন পুরাণ থেকে মঙ্গলকাব্যকে আলাদা করে দিয়েছে, অর্থাৎ দুটি এক গোত্রের নয়। মঙ্গলকাব্য হয়েছে মূলতঃ মানুষের কাহিনী, পুরাণ নিছক দেবতার কাহিনী। কাজেই মঙ্গলকাব্যের আদল পুরাণের অনুরূপ হলেও কবি অভিজ্ঞতার ফারাকের জন্যে একটা স্বতন্ত্র শিল্পগোত্র গড়ে উঠেছে।

দেবদেবীর উদ্ভব ও স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য :

বাস্তব পরিবেশ যখন মানুষের বোধ-বুদ্ধির অতীত শক্তিরূপে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয় তখন আত্মরক্ষার তাগাদায় মানসিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় শেষ আশ্রয় হিসেবে মানুষ অলৌকিকতার শরণাপন্ন হয়। এই রকমের একটা মানসিক অবস্থায় ভয়ার্ত মানুষ রক্ষাকর্ত্রী শক্তি-দেবতার কল্পনা করে তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে থাকে। মানুষের এই অপরিণত কল্পনা থেকে শক্তি-দেবতার উদ্ভব ঘটেছে। বহু পরবর্তীকালে তার উপর দার্শনিকতার আরোপ ঘটেছে, শক্তিময়ী দেবী অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত হয়ে উঠেছেন। তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড অভিভবে আত্মশক্তিতে আস্থাহীন বাঙালী উচ্চ এবং

নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে দৈবীশক্তির দ্বারস্থ হয়ে তার সন্তুষ্টি বিধানের দ্বারা সংকট অতিক্রম করতে চেয়েছিল। এরই সাহিত্যিক অভিব্যক্তি মঙ্গলকাব্য। কাজেই বলা যেতে পারে মঙ্গলকাব্য বুদ্ধিভীরু পরিবেশে রচিত সাহিত্য। যে সকল দেবতাদের মহিমা-কীর্তন করে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন—মনসা, চণ্ডী, অন্নদা এবং ধর্মঠাকুর। এঁদের মধ্যে ধর্মঠাকুর ছাড়া আর সকলে স্ত্রীদেবতা। স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য অনার্য-প্রভাবের ফল। বৈদিক ধর্মে স্ত্রীদেবতার উল্লেখ থাকলেও তাঁদের স্থান গৌণ। আবার তন্ত্রশাস্ত্রে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য। বাংলাদেশ তন্ত্রের পীঠস্থান। কাজেই নারীদেবতার প্রাধান্য স্বাভাবিক। এই বস্তুটি অনার্য-সংস্কৃতি থেকে এসে থাকলেও আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবে তার পরিমার্জনা ঘটেছে এবং মাতৃ-প্রধান বাঙালী-সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের ফলে সার্বিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং পূজালোলুপ, খামখেয়ালীপনার পর্যায় থেকে ভুয়মানা মহামায়ায় রূপান্তরিত হয়ে উচ্চতর দার্শনিক মনন এবং অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত হয়ে উঠেছে।

কাব্যের নামকরণ :

কাব্যের সঙ্গে 'মঙ্গল' কথাটির সংযুক্তি মঙ্গলকাব্যের অভিধা নয়। তাই যদি হত 'চৈতন্যমঙ্গল' মঙ্গলকাব্যের গোষ্ঠীভুক্ত হত। কিন্তু তা হয়নি। মঙ্গলকাব্য নামকরণের কারণ নির্ণয় করেছেন পণ্ডিতেরা এইভাবে ;—(১) যে কাব্য ঘরে রাখলে, পাঠ করলে, পাঠ শ্রবণ করলে অশেষ মঙ্গল সাধিত হয় তাই মঙ্গলকাব্য। (২) যে কাব্য এক মঙ্গলবার থেকে সুরু করে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত পাঠ করা হয় তাই মঙ্গলকাব্য। (৩) 'মঙ্গল' কথাটির হিন্দী অর্থ 'যাত্রা' বা 'মেলা'। গায়েনরা যে কাব্য মেলায় মেলায় গান করে বেড়ান তাই মঙ্গলকাব্য। আমাদের মনে হয় প্রথম মতটি গ্রহণযোগ্য। কারণ ঐ মনোভাবের ভিতরে তৎকালীন যুগমনের অন্ধ ভক্তি-প্রবণতার সায় রয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য :

মঙ্গলকাব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা এই কাব্যগুলোকে অন্যান্য কাহিনী কাব্য থেকে পৃথক করে দিয়েছে। আর এই বৈশিষ্ট্য, কাব্যরচনার বিশিষ্ট ঢঙের সংস্কারগত প্রথা (Convention) থেকে গড়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল।

মঙ্গলকাব্য চারটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে যে দেবতার পূজা প্রচার

করা হবে তাঁর পক্ষের এবং বিপক্ষের দেবদেবীর বন্দনা। দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থরচনার কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়। এই অংশে কবির আত্মপরিচয়ও থাকে। গ্রন্থরচনার কারণ হিসেবে কবিরা সকলেই দৈবাদেশ বা স্বপ্নাদেশের দোহাই দিয়েছেন। এমন কি কোনও কোনও কবি পূর্বসূরীর প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। যেমন মনসামঙ্গলের বিজয়গুপ্ত কানা হরিদত্তের নিন্দা করেছেন এবং স্বপ্নাদেশের সাফাই গেয়েছেন নিন্দার সমর্থনে। দৈবাদেশ বা স্বপ্নাদেশের দোহাই দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল অলৌকিকতায় বিশ্বাসী শ্রোতাদের শ্রদ্ধা দাবি করা। পরে এইটে প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র। তিনি রাজাদেশে কাব্যরচনা করেছেন।

তৃতীয় খণ্ডকে বলা হয় 'দেবখণ্ড'। এই খণ্ডে পুরাণানুগ পন্থায় অনার্য লৌকিক দেবতাকে আর্যদেবতাসুলভ আভিজাত্যে উন্নীত করা হয়। সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা, দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ের কন্যারূপে নবজন্ম, মদনভস্ম, উমার তপস্যা, গৌরীর বিয়ে, হরগৌরীর দাম্পত্য কলহ, শিবের গৃহত্যাগ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়। এই অংশে লক্ষ্য করবার বিষয় হল শিবের প্রাধান্য, লৌকিক এবং আর্যসংস্কৃতির সমীকরণ-প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—আর্যেতর দেবতার প্রতিষ্ঠা বড়ো সহজে হয় নি—প্রবল বিরোধ সংঘাতের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে। দক্ষের শিবনিন্দায় আর্যসমাজের মনোভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। দক্ষের যজ্ঞ পণ্ড করে শোণিতাক্ত অপবিত্র যজ্ঞবেদীর উপর শ্মশানেশ্বর গায়ের জোরে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, তখন সমাজ গঠনে নানা জাতের বিসদৃশ চিন্তা-সাধনার বিরোধ-সমন্বয়ের প্রচেষ্টা চলছিল। দ্বিতীয়তঃ লক্ষণীয় হল, কবিরা লৌকিক রুচি-বিশ্বাসের উপরে উঠতে পারেন নি বলে মঙ্গলকাব্যে উদ্ভট কল্পনার পূজাবিধির সমাবেশ ঘটেছে। তৃতীয়তঃ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে বিষয়-বস্তুর বিন্যাসে ঈষৎ ব্যতিক্রম রয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা কাব্যের গোত্রগত পরিচয়ের কোন ব্যত্যয় ঘটে না।

চতুর্থ খণ্ডটি হল 'নরখণ্ড'। এইটি নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ খণ্ড। এখানে দেখানো হয় কোন স্বর্গদম্পতি শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে এসেছেন উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা প্রচারের জন্য এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরে লীলা সংবরণ করে স্বর্গে ফিরে গেছেন। নরখণ্ডটি জীবন রসসিক্ত। এই খণ্ডের নানা আলোকিকতার ফাঁকফোকর দিয়ে বাস্তব জীবন উঁকিঝুঁকি মারে; মানবীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। বারমাস্যা, নায়কের সঙ্গে তুলনা

করে রমণীদের স্ব স্ব পতিনিন্দা, কাঁচুলি নির্মাণ, চৌতিশা এই খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়। এইগুলো ধীরে ধীরে প্রথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করতেই হবে। এই খণ্ডের 'চৌতিশা' (বিপদগ্রস্ত নায়কের চৌত্রিশ অক্ষরে বিপদুদ্ধারের কামনায় দেবতার স্তব) পরবর্তীকালে পার্থিব আকাঙ্ক্ষা বিযুক্ত হয়ে নিঃসর্ত আত্মনিবেদনে রূপান্তরিত হয়েছে শাক্ত পদাবলীতে। ঐতিহাসিক বিবর্তনজাত যোগটুকু মনে রাখবার মতো।

মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় এই কাব্যের ভাবগত ঐক্যের দিকটিও সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন এবং পূজাপ্রচার এর উপজীব্য। এবং এটাও লক্ষ্য করেছি যে জাতির মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগে অনার্য স্ত্রীদেবতারা পূজার বেদী গায়ের জোরে দখল করেছেন। এই সব দেবদেবীর চরিত্রগত ঐক্য মঙ্গলকাব্যের গোত্রপরিচয়কে আরও সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবীরা সকলেই খাম-খেয়ালী, ক্রুরকর্মা, পূজালোলুপা। এঁদের ক্রিয়াকলাপ, গতিবিধি কোনও ন্যায়শাস্ত্রের, ধর্মশাস্ত্রের বিধান মেনে চলে না। স্বৈরাচারী দেবীরা নিছক গায়ের জোরে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁদের প্রসন্নতার জন্য কোনও সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষার দরকার হয় না—কেবলমাত্র করজোড়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। আবার সেখানে পান থেকে চূণ খসলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। দেবীরা অকারণে কারও প্রতি প্রসন্না, কারও প্রতি কুপিতা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন নবাব-বাদশার অকারণ প্রসন্নতায় কেউ উজীর হচ্ছিলেন এবং ক্রোধে কেউ ফকির হচ্ছিলেন তেমনই অরাজকতা চলেছিল অধ্যাত্মরাজ্যেও। অবশ্য এই মন্তব্য 'মনসামঙ্গল'-এর দেবীর সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য ততটা নয় চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল এবং পরচৈতন্য মনসামঙ্গল কাব্যের দেবতাদের সম্পর্কে। কারণ হল, মানুষের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বসবাসের ফলে তাঁদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কিছুটা হৃদ্য হয়ে উঠেছিল, সমাজের স্বীকৃতি নবাগত দেবতারা পেতে সুরু করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্য-প্রেমধর্মের প্রভাবে উগ্রচণ্ডা দেবী শান্ত হয়ে এসেছিলেন। তাই চণ্ডী এবং অন্নদা জীবধাত্রী এবং অন্নদাত্রী রূপে বিবর্তিত হয়েছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের দেবতা এই ব্যাপারে কিছুটা নিস্পৃহ। তাই সেখানকার কাহিনীতে দেব-মানুষের প্রবল বিরোধ নেই, মনসার মতো অতন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণতা ধর্মঠাকুরের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে নি। মোটের উপর বলা যেতে পারে নারী-দেবতারা অনার্যসম্ভূতা হলেও কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক তন্ত্রের সঙ্গে মিশ্রণ

প্রক্রিয়ার সূত্রে মাতৃপ্রধান বাঙালী জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন এবং সার্বিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আজ শক্তিদেবতা মহামায়া রূপে বাঙালীর কাছে স্তূয়মানা ও সম্পূজিতা।

এখন আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন প্রাথমিক ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বিশেষের সম্পদ ছিল ; তাই নানা কার্যকারণ ও ঘটনা পরম্পরায় স্তর বেয়ে সার্বজনীনতা লাভ করে বাংলার জাতীয়কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে।

(ক) মনসামঙ্গল কাব্য

মনসাদেবীর উদ্ভব :

মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যের আবির্ভাব প্রাচীনতর বলে অনুমান করা যেতে পারে। মনসা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পূর্ববঙ্গে মনসা পদ্মা নামে অভিহিতা এবং মনসামঙ্গল পূর্ববঙ্গে পদ্মপুরাণ নামে সমধিক পরিচিত। সর্পসঙ্কুল দেশে সর্পভীতি থেকে তার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা এবং তাঁর তুষ্টিবিধানের জন্য পূজা করবার রীতি-পদ্ধতি প্রাগার্য যুগ থেকে চলে আসছে। এই দেবীর পূজা উপচারবহুল এবং আড়ম্বরপূর্ণ ; এবং সারা ভারতবর্ষে তাঁর পূজার প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে আর্যসম্প্রদায় আর্যেতর দেবীকে স্বীকৃতি দেন। তবে একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেইটি হল এই যে, সারাদেশে মনসা পূজার প্রচলন ছিল ঠিকই কিন্তু তাঁর মূর্তি কল্পনায় বিভিন্নতা দেখা যায়। উত্তর ও মধ্য ভারতে নাগরাজ বাসুকি ও তাঁর সরীসৃপ মূর্তি পূজিতা। দক্ষিণ ভারতে জীবন্ত সর্পপূজার প্রচলন দেখা যায়, বাংলাদেশে সর্পদেবতার মাতৃকা-মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

মনসার চরিত্র কল্পনায় দৈন্য ও সমাজ মন :

আমরা পূর্বেই বলেছি, প্রাগার্য যুগে সর্পভীতি থেকে মনসা পূজার উদ্ভব। আদিম মানুষের ভীতিবোধ থেকেই ভক্তির উদ্ভব। সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার

চরিত্রেও সর্পসুলভ নীচতা, হিংস্রতা, অকারণে আক্রমণ স্পৃহা, রহস্যময় গোপন চলাফেরা লক্ষ্য করা যায়। মনসা যে হীন চক্রান্ত, ক্রুর প্রতিহিংসা-পরায়ণতার পথে পূজা আদায় করেছেন, দেবমণ্ডলীতে আসন সংগ্রহ করেছেন, তাকে ধর্মবুদ্ধি দিয়ে সমর্থন করা যায় না। মনসার উপর দেবমর্যাদার আরোপের পিছনে বুদ্ধিভীরু মানুষের প্রতিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা, অনির্দেশ্য ভীতিবোধ থেকে আত্মরক্ষার প্রেরণা সমধিক ক্রিয়াশীল। ভক্তির বিশুদ্ধ কাঞ্চন এখানে নেই—ভীতির খাদ মিশ্রিত হয়ে তা' মনসাকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

মনসামঙ্গল কাব্য পাঠে আমাদের এই ধারণাই হয় যে, মনসার দেবত্ব একমাত্র অপ্রতিহত শক্তির প্রকাশেই প্রতিষ্ঠিত এবং এই শক্তি ন্যায়ের নয়, ধর্মের নয়। এই কাব্যের দেবচরিত্রের হীন কল্পনা থেকে সেদিনকার সমাজের অধোগতি, আত্মশক্তিতে আস্থাহীনতা পক্ষান্তরে দৈবানুগ্রহে একান্ত নির্ভরশীলতার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এর ভিতর দিয়ে কালের নিরিখে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, তুর্কীশক্তির কাছে পরাভব এই বোধকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছিল। ফলে বিদেশী শক্তির মন জুগিয়ে জীবনের নিরাপত্তা খুঁজে পেতে চেয়েছিল মানুষ। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে জাতীয় চরিত্রের অধোগতির ফলে তুর্কী-বিজয় এত সহজ হয়েছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতা ও সৃষ্টি :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"পুরাতনকে নূতন করিয়া, বিচ্ছিন্নকে এক করিয়া দেখাইলেই সমস্ত দেশ আপনার হৃদয়কে যেন স্পষ্ট ও প্রশস্ত করিয়া দেখিয়া আনন্দলাভ করে। ইহাতে সে আপনার জীবনের পথে আরও একটা পর্ব যেন অগ্রসর হইয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, কেতকাদাস প্রভৃতির মনসার ভাসান, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এইরূপ শ্রেণীর কাব্য ; তাহা বাংলার ছোট ছোট পল্লীসাহিত্যকে বৃহৎ সাহিত্যে বাঁধিবার প্রয়াস। এমনি করিয়া একটা বড়ো জায়গায় আপনার প্রাণপদার্থকে মিলাইয়া দিয়া পল্লীসাহিত্য ফুলধরা হইলেই ফুলের পাঁপড়িগুলির মতো ঝরিয়া পড়িয়া যায়।" রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলকাব্যের পরিণতির সুর নির্দেশ করেছেন। "পল্লীসাহিত্য" বলতে তিনি ব্রতকথা, পাঁচালীর ইঙ্গিত করেছেন। যদিও মঙ্গলকাব্যের সন্ধান পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পাওয়া যায় তবুও অনুমান করতে বাধা নেই যে তারও দুই-তিন শতাব্দী পূর্ব থেকেই এই কাব্যের অস্তিত্ব ছিল। এইরূপ অনুমান করবার কারণ হল এই যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত মঙ্গলকাব্যগুলোর আখ্যান-

বস্তুর মধ্যে মৌলিক ঐক্য রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের ব্যাপক প্রচার এবং জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই দীর্ঘদিনের কাব্যানুশীলনের ফল। অবশ্য যেভাবে আজ আমরা মঙ্গলকাব্যকে দেখছি এইরূপে তা ছিল না। তখন ব্রতকথা এবং পাঁচালীর রূপে তা ছড়িয়ে ছিল। হরিদত্ত, কেতকাদাসের কাব্যের কাহিনী-বিন্যাসে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ আদি কবি হরিদত্তের কাব্যের পাঁচালী-ধর্মিতার জন্য তিনি কারও কারও নিন্দাভাজন হয়েছেন। পরবর্তীকালের কবিরা বেহুলা-লক্ষীন্দরের মূল কাহিনীর সঙ্গে দেবখণ্ডাদি যুক্ত করে চাঁদ-মনসার বিরোধ-সংঘাত, বাণিজ্যযাত্রা ইত্যাদির পল্লবিত কাহিনী বিন্যাসের দ্বারা পুরাণের ছাঁচে বৃহদাকায় রূপদান করেছেন। বিশাল বিস্তৃতি, বিস্ময়কর ঘটনা, চরিত্রের ঘাত-সংঘাত প্রভৃতি এই কাব্যকে মহাকাব্যোচিত মহিমা দান করেছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই সিদ্ধান্ত না করে উপায় নেই যে, ঐ সাদৃশ্য একান্তই বাহ্যিক। মহাকাব্যের বিশালতার বিশিষ্ট রূপটি, উদাত্ত রচনারীতি, চরিত্র কল্পনার গৌরব এবং রসনিষ্পত্তি মঙ্গলকাব্যে নেই—যদিও তার সম্ভাবনা ছিল। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়িয়া উঠিতে পারে নাই।"

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী :

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীর সূচনাংশে রয়েছে 'দেবখণ্ড'। এই খণ্ডে মনসার জন্ম থেকে পূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে আগমন পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এই অংশে দেখা যাবে মহাদেবের মানস-কন্যা মনসা জন্মেছেন। তিনি কৈলাসে এলে চণ্ডী মনে করলেন মহাদেব সতীন নিয়ে এসেছেন, ফলে মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদ-বিসংবাদ সুরু হয়ে গেল। ক্রুদ্ধা চণ্ডী মনসার এক চোখ কানা করে দিলেন, মনসার কোপদৃষ্টিতে চণ্ডী মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পরে মহাদেবের অনুনয়ে মনসার প্রচেষ্টায় জ্ঞানলাভ করলেন। তবুও কলহের নিবৃত্তি হল না। শেষ পর্যন্ত মনসা কৈলাস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। মনসা বিয়ের পরেও স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে পারলেন না। তিনি পৃথক হয়ে জয়ন্তী নগরীতে বসবাস করতে থাকলেন। এই পর্যন্ত দেবখণ্ডের কাহিনী। এরপর নরখণ্ডে তাঁর পূজা প্রচারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই খণ্ডটি মানবিক রসপূর্ণ।

'নরখণ্ডে' কাহিনী হল এই যে, মনসা পৃথিবীতে পূজা আদায় করে দেবসমাজে উঠতে চাইলেন। প্রথমে সমাজের নিম্নবর্ণের কাছে পূজা আদায়

করলেন। উচ্চবর্ণের কাছে পুজো না পেলে জাতে উঠা যাবে না—কিন্তু তাঁকে জাতে উঠতে হবে। তখনকার দিনে চম্পকনগরের নেতৃস্থানীয় বণিকশ্রেষ্ঠ চন্দ্রধরের পূজা পেলে মনসা সমাজে উঁচু আসন পেতে পারেন। তাই মনসা চাঁদবেনের দ্বারস্থ হলেন। তিনি প্রথমে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পূজা আদায় করলেন, চাঁদ তখন বাণিজ্য করতে দেশের বাইরে ছিলেন। শিবভক্ত চাঁদ ফিরে এসে মনসার পূজার ঘট দিলেন ফেলে। এর পিছনে চণ্ডীর কিছুটা উস্কানি ছিল। চাঁদ যখন কোনমতেই মনসা দেবীর পূজায় সম্মত হলেন না, মনসা তখন চাঁদের উপর নির্মম অত্যাচার স্রুরু করলেন। ছলনা করে চাঁদের 'মহাজ্ঞান' হরণ করলেন, সর্পবৈদ্যক নিহত করলেন, বাগান নষ্ট করলেন, ছয় পুত্রকে একে একে মেরে ফেললেন, "সপ্তডিঙা মধুকর" ডুবিয়ে দিলেন। এই অতন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণতার ফাঁকে ফাঁকে কেবল পূজার বিনিময়ে সব কিছু প্রত্যর্পণ করবার প্রলোভন দেখাতে থাকলেন। চাঁদ তবু অচল, অটল। বিধবা পুত্রবধূদের কান্না, স্ত্রী সনকার কান্না কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। ইন্দ্রের শাপে মনসার পূজা চালু করবার উদ্দেশ্যে অনিরুদ্ধ চাঁদের ঘরে জন্ম নিলেন। তাঁর নাম হল লখিন্দর। পাণ্টা ঘরে অনিরুদ্ধর স্ত্রী উষা জন্ম নিলেন। তাঁর নাম হল বেহুলা। কোষ্ঠীবিচারে দেখা গেল বিয়ের রাতে সাপের কামড়ে লখিন্দরের মৃত্যু হবে। তবুও লখিন্দরের বিয়ে হল বেহুলার সঙ্গে। চাঁদ সব রকমের সাবধানতা অবলম্বন করলেন যাতে বাসর ঘরে মৃত্যু হানা দিতে না পারে। সব সাবধানতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে নিয়তি জয়লাভ করল। মানুষের বিরুদ্ধে দেবতার ষড়যন্ত্র জয়ী হল। অদৃশ্য ছিদ্রপথে কালীয়-নাগ এসে লখিন্দরকে দংশন করল। শোকের তুফান বয়ে গেল বণিকের পুরীতে। সর্পদৃষ্টের দেহ ভাসিয়ে দেওয়াই হল নিয়ম। শোকস্তম্ভিত চাঁদ হুকুম করলেন কলার মান্দাসে লখিন্দরের শব ভাসিয়ে দিতে। শবের সঙ্গে বেহুলাও যাত্রী হলেন অনির্দেশ্যের পথে! ভেলা চলল দেশ-বিদেশ পেরিয়ে—পথে কত বিভীষিকা, ছলনা, প্রলোভন। সব কিছুকে জয় করে বেহুলা এসে পৌঁছুলেন স্বর্গে, তখন তাঁর আঁচলে বাঁধা লখিন্দরের অস্থি-কঙ্কাল। নৃত্যগীতে দেবমণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করে স্বামীর ও ভাসুরদের প্রাণ ফিরে পেলেন—পেলেন চাঁদের বিধ্বস্ত সম্পদ। কেবল সর্ত হল, দেশে ফিরে চাঁদকে দিয়ে মনসার পূজা করাবেন। বেহুলা দেশে ফিরলেন। বহু অনুনয় করে চাঁদকে রাজী করালেন মনসার পূজা করতে। চাঁদ মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে মনসার পূজা দিলেন। এরপর থেকে মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচারিত হল। লখিন্দর-বেহুলা স্বর্গে ফিরে গেলেন।

কাহিনী সমালোচনা :

'মনসামঙ্গল' কাব্যের কাহিনীর 'চারপাশ ঘিরে রয়েছে অসম্ভবের রাজ্য। কল্পনার আতিশয্যে, অলৌকিকতার দুর্ভেদ্য অরণ্যে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু মর্ত্যের মাটির সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকায় কাব্য মানবিক রস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই যোগসূত্র সৃষ্টি হয়েছে চাঁদবেনের কাহিনীকে অবলম্বন করে। কল্পনার বায়ব্যস্ফীতি থেকে 'নরখণ্ডে' বস্তুজীবনের সম্পৃক্ততায় এসে পাঠক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। এই কাব্যপাঠে আমাদের এই ধারণাই হয় যে, এই কাহিনী মনসার বিজয় ততটা নয়—যতটা বেহুলার। এই কাব্যে চাঁদবেনের ভাগ্যবিপর্যয় সেদিনকার সমাজের সাধারণ বস্তু ছিল। চাঁদ সওদাগরের চরিত্রের দৃঢ়তা এবং বেহুলার গরিমা ট্রাজিক কাব্যের নায়ক-নায়িকার চরিত্রের মর্যাদা লাভ করেছে। এই দুইটি চরিত্রের পাশে অন্যান্য চরিত্রাবলী ম্লান হয়ে যায়। দেবসমাজে নির্যাতিতা মনসাকে যেমন সংগ্রাম করে স্থানলাভ করতে হয়েছে, তেমনই উচ্চবর্গের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে নিম্নবর্গের মানুষ বিরোধ-সংঘাতের ভিতর দিয়েই।

মনসামঙ্গল কাব্যে বর্ণিত দৈবাহত মানবজীবনের জন্য আমাদের করুণা জাগে। চাঁদের লাঞ্ছিত ক্ষতবিক্ষত পুরুষকার, সনকার শোকদীর্ণ হাহাকার, লখিন্দর-বেহুলার জীবনসম্ভোগের মুখেই চির বিদায় গ্রহণ, ক্রুর কুটিল প্রতিহিংসাপরায়ণ দৈবশাসন—মানবজীবনের তাৎপর্যরিক্ত সংগ্রামের অসহায়তাকে পরিস্ফুট করেছে। এরই ফাঁকে স্থূল জীবন-পিপাসার অনিবার্য, বিচার বোধহীন তাগাদায় চন্দ্রধর, লখিন্দরের কামোন্মত্ততা, স্ত্রীদের পতিনিন্দা, স্থূল হাস্য-পরিহাস জীবনের স্বাভাবিক ছন্দানুবর্তন বলেই মনে হয়। কারণ জীবন যেখানে মৃত্যুর তর্জনী সংকেতে ম্রিয়মান, দৈবের সর্বগ্রাসী প্রভাবে বিশীর্ণ সেখানে জীবনাসক্তির স্থূলতা থেকে সূক্ষ্ম উদ্বর্তনের অবকাশ কোথায়? কাজেই যেটুকু জীবনসম্ভোগের সময় পাওয়া যায় সেইটুকুই গোগ্রাসে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবধর্মের অনুকূলে অভিব্যক্ত হয়েছে। এইটেই স্বাভাবিক। কাজেই মঙ্গলকাব্যের রুচিবিকার সর্বথা নিন্দনীয় নয়। বরং জীবনের এই অসহায়তা এবং তার থেকে উপজাত স্থূলতা, বর্বরতা, আস্ফালন, খেদ ইত্যাদি করুণার যোগ্য। জীবনের বিষাদ-করুণ রূপরসের আস্বাদনের সার্থকতার উপর মনসামঙ্গল কাব্যের সাহিত্যমূল্য প্রতিষ্ঠিত। কারণ,—"Criticism no longer judges by absolute standards; it applies the standards of the author's own environment."

মনসামঙ্গল কাব্যের কবিগোষ্ঠী :

বহু খ্যাত এবং অখ্যাত কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করে তার ধারাটিকে পরিপুষ্ট করেছেন। সকলের সম্বন্ধে আলোচনা সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়— প্রয়োজনও নেই। আমরা কেবল প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েকজন কবির সম্পর্কে আলোচনা করব, তা-ও অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে কবিদের প্রাক্‌চৈতন্য এবং পরচৈতন্য এই দুই ভাগে ভাগ করে নেব। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি হলেন কানা হরিদত্ত, নারায়ণদেব এবং বিজয়গুপ্ত। পরচৈতন্য যুগের কবি দ্বিজ বংশীদাস, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ।

॥ কানা হরিদত্ত ॥

কবি ও কাব্য পরিচয় :

কানা হরিদত্তের কোনও পুঁথি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। বিজয়গুপ্তের কোনও কোনও কাব্যে তাঁর নামের এবং কবিকৃতির উল্লেখ রয়েছে। তবে তাঁর কবিকৃতির যে উল্লেখ বিজয়গুপ্ত করেছেন তা মোটেই প্রশংসাসূচক নয়। বিজয়গুপ্ত বলেছেন —

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥
গীতে মতি না দেহ কেহ মিছে লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥"

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে হরিদত্তর রচনা সৌষ্ঠব ছিল না। তাঁর কাব্যের, গীতের অপ্রাচুর্য, পক্ষান্তরে শরীর ভঙ্গির স্থূলতা, ছন্দের স্খলিত বয়ন, শ্রুতিকটুত্ব, ঢিলে ঢালা উপস্থাপনা রীতি বিজয়গুপ্তের কাব্য বোধকে পরিতৃপ্ত করিতে পারেনি। সম্ভবতঃ এই কারণে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেননি। আমাদের মনে হয় মঙ্গল কাব্যের আদিম ব্রতকথার পাঁচালীতে রূপান্তরিত হওয়ার কালে হরিদত্তের আবির্ভাব ঘটে থাকবে। ব্রতকথাকে পাঁচালীর ঢঙে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন। যেহেতু তাঁর কোনও কাব্য পাওয়া যায়নি,

কাজেই পরোক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে ভালো মন্দ কোনও সুনিশ্চিত রায় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এখান থেকে আরেকটা বিষয় পরিস্ফুট হয় যে হরিদত্তের পর রুচি বদলের পালা সুরু হয়েছে; কাব্যাঙ্গিকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল। পরবর্তীকালে নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্তের হাতে এসে মঙ্গলকাব্য পরিমার্জিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। জন্ম ও বৃদ্ধির মধ্যে প্রাণধর্মের মৌলিক ঐক্য থাকলেও অবয়ব সংস্থানের গরমিল থাকবেই, অর্থাৎ দুবল দেহ বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তাই শিথিল কাহিনী বিন্যাস, ছন্দপতন, স্বরভঙ্গের জন্য হরিদত্ত অশালীন আক্রমণের হেতু না হয়ে আদি কবি রূপে সহানুভূতি দাবী করতে পারেন। সমালোচকেরা অনুমান করেছেন, হরিদত্ত বিজয়গুপ্তের একশ' বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। ময়মনসিংহ জেলা থেকে তাঁর রচিত পদাংশ উদ্ধার করা হয়েছে।

॥ নারায়ণ দেব ॥

কবি পরিচয়ঃ

নারায়ণ দেব মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। নারায়ণ দেবের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নারায়ণ দেবের পিতার নাম নরসিংহ, মাতার নাম রুক্মিণী। তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাঢ় অঞ্চল পরিত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বোর গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তা ঈর্ষার বস্তু। বাংলাদেশের সীমা পেরিয়ে আসাম পর্যন্ত তার কাব্যের প্রচার ঘটেছিল। জনপ্রিয়তার ফলে তাঁর কাব্যে বহুল প্রক্ষেপ ঘটেছে। ফলে কবির যথার্থ পরিচয় চাপা পড়ে গেছে।

কাব্য পরিচয়ঃ

তবে যেটুকু আমাদের হস্তগত হয়েছে তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যে 'দেবখণ্ড' বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এতে পুরাণ মহিমার প্রতিফলনে তাঁর কৃতিত্ব লক্ষ্য করবার মতো। 'নরখণ্ড' এর তুলনায় সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভাব-কল্পনার সংহতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চাঁদ-

বেনের চরিত্রের দৃঢ়তা, বেহুলার চরিত্রের আত্মবিশ্বাস, দৈবী নির্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার আকৃতি মণ্ডনকলা নিরপেক্ষভাবে আদিম রূপ নিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। চন্দ্রধরের চরিত্রের আদিম বর্বরতার নিরাভরণ প্রকাশ আমাদের বিস্মিত করে। শোকে, প্রতিহিংসায়, স্বার্থপরতায়, আনন্দে, যে কোনো অবস্থায় সে আত্মগোপনে অক্ষম। চরিত্রের এই ঋজুতা, ভাবের নিরাবরণ অভিব্যক্তির জন্য নারায়ণ দেবের কাব্য স্বরূপধর্মে কতকাংশে স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের সামীপ্য অর্জন করেছে। তবুও মঙ্গলকাব্য মহাকাব্য নয়। কারণ মহাকাব্যের উদাত্ত প্রকাশ-রীতি, অনুভূতির সমুন্নতি, বিভিন্ন উপাদানের একাধিক সমাবেশ এতে নেই।

॥ **বিজয়গুপ্ত** ॥

কবি পরিচয়ঃ

বিজয়গুপ্তের পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী। বাখরগঞ্জের গৈলা ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁদের বাস ছিল। জাতিতে ইনি বৈদ্য। বিজয়গুপ্তের কাব্য রচনাকাল ১৪৯৪ খ্রীঃ। সময়টা হোসেন শাহের রাজত্বকাল।

বিজয়গুপ্ত মণ্ডনকলার অভাবের জন্য হরিদত্তের কাব্যের নিন্দা করেছেন। তাঁর কাব্যে মণ্ডনকলার প্রতি সচেতন তৎপরতার পরিচয় নিহিত। তাঁর কাব্যের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ, বস্তু থেকে বাস্তব রস নিষ্কাশন, পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাজ চিত্রণ, অমার্জিত পরিহাস, রসিকতা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। বাক্‌ বৈদগ্ধে, ছন্দোবৈচিত্র্যে, অলংকার প্রয়োগ নৈপুণ্যে ভারতচন্দ্রের পূর্বাভাস যেন সূচিত হয়েছে বিজয়গুপ্তের মধ্যে।

কাব্য পরিচয়ঃ

বিজয়গুপ্তের কাহিনী বর্ণনায়, চরিত্র পারিকল্পনায় বৈচিত্র্য যদিও আছে—সংহতি নাই। বিচিত্র উপাদানগুলোকে ভাবানুভূতির তাপে গলিয়ে একীভূত করে সমগ্র কাহিনীকে সংহতি দান করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। আমাদের মনে হয় এর জন্য তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ কিছুটা দায়ী। কেননা তখন সবেমাত্র নবাগত মুসলমান এবং হিন্দুদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার সূত্রে নতুন সমাজ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। তখনও পর্যন্ত সংহত জীবনধারা গড়ে ওঠেনি। অখণ্ড সুসংহত জীবন-বোধের অভাব বাস্তব জীবন থেকে তাঁর

কাব্যে সঞ্চারিত হয়েছে। তিনি সংহতি অভাবজনিত ঘাটতি পূরণ করেছেন ছন্দোবৈচিত্র্যে, বাচনভঙ্গীর কলা-কৌশলে, অলঙ্করণ চমৎকারিত্বে। তাঁর রচিত পালা এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর গল্পরস উপভোগ্য। আধুনিক যুগে চরিত্র পরিকল্পনার অসংহতি আমাদের শিল্পবোধকে আহত করে, কিন্তু সেদিনকার তরল সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঐটেই ছিল স্বাভাবিক। মহাদেবের লাম্পট্য, চাঁদের কামুকতা, দেবতার সঙ্গে অসম সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে লাঞ্ছনা, চণ্ডীর নির্দেশে মনসাকে পূজা করা সেদিনকার পাঠক-শ্রোতার কাছে অসঙ্গত বলে মনে হয় নি। এই দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর কাব্যের ত্রুটি কিছুটা সুসহ মনে হতে পারে। তাই আমরা আবার বলছি, বিজয়গুপ্তের কাব্য ছন্দোসুষমার চমৎকারিত্ব, বাক্ বৈদগ্ধ্য, অলঙ্করণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি পালার গল্পরস ও বাস্তবতার অবতারণায় সুখপাঠ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

॥ দ্বিজ বংশীদাস ॥

কবি পরিচয়ঃ

দ্বিজ বংশীদাস চৈতন্যোত্তর যুগের উল্লেখযোগ্য কবি। এঁর কাব্য রচনা-কাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে ধরা যেতে পারে। বাংলা কাব্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা। ইনি "মহিলা কৃত্তিবাস" নামে পরিচিত। চন্দ্রাবতীর পিতৃ পরিচয়ের উল্লেখ থেকে জানা যায়, যাদবানন্দ হলেন কবির পিতা, মাতার নাম অঞ্জনা। এঁদের বাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে। মনসার পূজক ছিলেন বলে লক্ষ্মী যাদবানন্দকে পরিত্যাগ করেছিলেন। তারপর থেকে দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাঁরা জর্জরিত হতে থাকেন। বংশীদাস মনসার ভাসান গেয়ে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। কথিত আছে, তাঁর গান শুনে দস্যু কেনারামের হৃদয়ের পরিবর্তন হয়েছিল এবং সে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে কবির সহচররূপে বাকি জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল।

কাব্য পরিচয়ঃ

আমরা পূর্বেই বলেছি, দ্বিজ বংশীদাস চৈতন্যোত্তর যুগের কবি। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত প্রেমধর্মের অনতিক্রম্য প্রভাব তখন বাংলা সাহিত্যের উপর ছায়াপাত

করেছিল। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে তাই সমন্বয়মূলক মনোভাব ফুটে উঠেছে। মনসাও উগ্রচণ্ডা মূর্তি ত্যাগ করে কিছুটা শান্ত হয়েছেন, কারণ সমাজে তখন তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। বংশীদাসের কাব্যে বোধ করি এই কারণে দেখা যায় যে, মনসা এবং চাঁদের বিরোধ-সংঘাত সরাসরি শত্রুতামূলক নয়। চাঁদ মনসা এবং চণ্ডীর মধ্যে কোনও তফাৎ দেখেন নি, 'আদ্যা প্রকৃতির' রূপভেদ হিসাবে দেখেছেন এবং পূজা দিতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু বিরোধের বীজ উপ্ত করলেন চণ্ডী। চণ্ডী-মনসার পারিবারিক কলহের ফলে চণ্ডী প্রতিহিংসা-বশে স্বপ্নে চাঁদকে মনসার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বিরোধ সৃষ্টি করলেন। তাঁদের পারিবারিক কলহের সঙ্গে চাঁদবেনের ভাগ্য জড়িত হয়ে পড়ছে। তার পরেকার কাহিনী গতানুগতিক। পরিশেষে শিবের মধ্যস্থতায় বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটে।

দ্বিজ বংশীদাস মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে উন্নত অধ্যাত্মিক অনুভূতির আরোপ করেছেন। মনসা এখানেও স্বৈরাচারা। ভীতি থেকেই ভক্তির উদ্ভব। তবুও তার মধ্যে দাস্যভাবের নম্রতা স্ফুরিত হয়েছে। পূর্বেকার হীনতাবোধ বহুল পরিমাণে কেটে গিয়ে বিনয়, সহিষ্ণুতা, স্নেহ, প্রীতি ইত্যাদি কোমল বৃত্তির ছোঁয়া লেগেছে। এইটে অবশ্যই চৈতন্য-প্রভাবের ফল। এতৎসত্ত্বেও লক্ষ্য করবার মতো হল এই যে, কোমলতার স্পর্শ সত্ত্বেও চাঁদ চরিত্রের পৌরুষ-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নি। সৌকুমার্য, ঔদার্য ও পৌরুষের সমবায়ে চাঁদ ভাস্কর্য-প্রতিম রূপ লাভ করেছে। এই রসপরিমিতি বোধ ছিল বলেই দ্বিজ বংশীদাস চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। রসসৃষ্টির জন্য আরবী, ফার্সী, দেশী যে শব্দ যেখানে প্রয়োজন সেখানেই তাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কি পৌরুষ-প্রাখর্য প্রকাশে, কি বেদনা-বিধুর করুণ রসসৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধকাম শিল্পী।

॥ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ॥

কবি পরিচয়ঃ

বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে কেতকাদাসের জন্ম। পরে নানা অশান্তির চাপে পড়ে তাঁরা মূল বাসস্থান ছেড়ে চলে যান। ভারামল্ল তাঁকে তিনটি গ্রাম দান করেন। সেই গ্রামে থাকাকালে খড় কাটবার সময় মাঠে মুচিনীর ছদ্মবেশে এসে মনসা তাকে কাব্য রচনা করতে আদেশ করেন। তারপর তিনি কাব্য রচনা করেন। মনসাকে তিনি 'কেতকা' বলে অভিহিত করেছেন এবং

নিজেকে তাঁর দাস বলে পরিচিত করেছেন। তাঁর আসল নাম হল ক্ষেমানন্দ। এই নামের সঙ্গে কেতকাদাস উপাধি যুক্ত করে তিনি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ নামে পরিচিত হয়েছেন।

কাব্য পরিচয় :

কেতকাদাস পণ্ডিত ব্যক্তি। কাব্যে প্রকাশভঙ্গিতে তাঁর পাণ্ডিত্য ফুটে উঠেছে। এছাড়া সামাজিক রীতি-নীতি এবং বেহুলার যাত্রাপথের বস্তু-নিষ্ঠ ভৌগোলিক বর্ণনায় তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কেতকাদাসের কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন,—"যে ২২টি ঘাট বা গ্রামের নাম আছে, তন্মধ্যে ১৪টি ঘাট বা গ্রাম এখনও দামোদর ও তাহার শাখা বাঁকা নদীর এবং বর্তমান বেহুলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত।" কেতকাদাসের কাব্যে গ্রাম্যতা দোষ নেই, কবিত্বও প্রশংসার যোগ্য। মুকুন্দরামের আবির্ভাবের ৫০ বছর পরে কেতকাদাসের আবির্ভাব। তাই তাঁর কাব্যে পূর্ববর্তী কবিদের তুলনায় ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও চৈতন্য-প্রভাবজনিত উন্নত জীবনমানের অভিব্যক্তি ঘটেছে। কাহিনী ও চরিত্রের আনুপূর্বিক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। করুণ রসোৎসারে তিনি নারায়ণ দেবের প্রতিস্পর্ধী। তাঁর কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হল ব্যালাডের Refrain (ধুয়া) প্রয়োগ। এর ফলে বক্তব্যে তীক্ষ্ণতা এসেছে। কেতকাদাসের আবির্ভাব সপ্তদশ শতকে হয়েছিল বলে সমালোচকেরা অনুমান করেছেন।

আলোচিত কবি গোষ্ঠী ছাড়াও মঙ্গলকাব্যের অন্তিম স্তরে জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র ইত্যাদি কবিরা কাব্য রচনা করেছিলেন। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের সুবলয়িত কাহিনী, উদ্ভটত্বের পরিবর্তে কল্পনার স্বাভাবিকতা, এবং অতিরঞ্জন-মুক্তি সম্ভব হয়েছে এই জাতীয় কাব্যের দীর্ঘানুশীলন এবং দেবতার সঙ্গে কিছুটা স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে। এই পর্যায়ে দেবতার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের ভীতি ও আড়ষ্টতা কেটে গেছে, বাস্তব চেতনার কিছুটা স্ফুরণ ঘটেছে, চৈতন্য প্রভাব জীবনবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে, দীর্ঘদিনের ঘরকন্নার ফলে দেব-মানবের সম্পর্কের তিক্ততা কেটে গেছে। ফলে মূল কাঠামো এক থাকলেও কিছুটা ভক্তি-নম্র মনোভাবের প্রতিফলন এই কালের কাব্যে ঘটেছে। তবুও কোপনস্বভাবা দেবীর সম্পর্কে শঙ্কিত মনোভাবের মৌল পরিবর্তন ঘটে নি।

শেষ কথা :

মনসামঙ্গল কাব্য এই যুগে দায়ে না ঠেকলে কেউ পড়েন না। কিন্তু তার অনতিক্রম্য প্রভাব জনচিত্তে ক্রিয়াশীল। এই প্রভাবকে দুই দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। (ক) প্রাকৃত জীবনের দিক থেকে (খ) বুদ্ধিজীবি মানুষের দিক থেকে। প্রাকৃত মানুষ সর্পভীতি নিবারণ ও সমৃদ্ধির জন্য দেবীর নিকট নৈবেদ্য উপচার এখনও নিবেদন করে। বুদ্ধিজীবি মানুষ মনসার প্রতি বিরূপ। তাঁর কার্যকলাপ ন্যায়ানুমোদিত নয়, দেবীত্বের গুণাবলী তাঁর নেই। বিমুখ-চিত্ত নিতান্ত ভীতিবশেই তাঁকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েও এক অনির্দেশ্য অস্বস্তি বোধ করে এবং মনসা পূজা করলেই সর্পভীতি থাকবে না জ্ঞানে তা স্বীকার করে। কিন্তু অন্তরের গূঢ় সত্তায় তার স্বীকৃতি নেই। তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগেও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের অনেকের বাস্তুদেবী রূপে মনসা পূজিতা। এর মূলে আদিম মনোভাবই ক্রিয়াশীল।

(খ) চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর উদ্ভব :

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অধিদেবতা চণ্ডীদেবী। ইনি মঙ্গলচণ্ডী নামেও পরিচিতা। চণ্ডীদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্দেশ্য। চণ্ডীদেবতা মূলতঃ অনার্য সংস্কৃতি জাত। কিন্তু তাঁর মূল অনার্য রূপটির হদিশ করা আজ দুঃসাধ্য। কোনও প্রাচীন পুরাণ বা মহাকাব্যে চণ্ডীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, হরিবংশ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ রয়েছে, আর উল্লেখ রয়েছে তন্ত্রে। যে পুরাণগুলোর নামোল্লেখ করেছি সেইগুলো অর্বাচীন পুরাণ বলে কথিত। এবং এইটেও আমরা দেখেছি যে উল্লিখিত পুরাণগুলোর রচনাকালে আর্যেতর দেবীদের আর্যীকরণ ঘটেছিল অর্থাৎ তাঁরা বর্ণহিন্দুর কাছে স্বীকৃতি পেতে সুরু করেছিলেন। এইটে দ্বাদশ শতকের কথা। কাজেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, অনার্য চেতনাসম্ভূত দেবী কালে কালে পৌরাণিক ধর্ম, হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রের সঙ্গে মিলে গিয়ে বিচিত্র রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ষোড়শ শতকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

এই সমীকরণের একটি সাধারণ ক্ষেত্র নির্দেশ করা দুরূহ নয়। আর্য ধর্মেও আদ্যাশক্তির বিশ্বব্যাপিনী মাতৃকারূপ পরিকল্পিত হয়েছে। ইনি বিশ্বজীবন-ধারার নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে বন্দিতা। এই পরিকল্পনা সূক্ষ্ম দার্শনিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মাতৃচেতনার মূল পরিকল্পনার ভিত্তিতে আর্য-অনার্য চিন্তার স্বচ্ছন্দ সমীকরণের কোন বাধা ছিল না। বস্তুতঃপক্ষে এইক্ষেত্রে এসে উভয় সংস্কৃতির জীবনদর্শনের ভেদরেখাটি লুপ্ত হয়ে কালক্রমে চণ্ডী এবং দুর্গা অভিন্ন হয়ে পড়েছেন। ব্যাধপূজিতা, পশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী জটিল রহস্যময় বিবর্তন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বর্ণ নির্বিশেষে সার্বিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, জীবন-ছন্দের পরিবর্তনের তালে অন্নপূর্ণায় রূপান্তরিত হয়েছেন।

চণ্ডীর চরিত্র পরিকল্পনা :

চণ্ডীদেবীর যাবতীয় কার্যকলাপ, পূজা লোলুপতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে তিনি মনসার মতো উগ্রা নন। পূজা আদায়ের জন্য অতন্দ্র প্রতিহিংসাপরায়ণতার বশবর্তী হয়ে মানুষের উপর নির্মম পাশবিক অত্যাচার করেন নি। তাঁর দৈবী মহিমার প্রকাশ হিংস্র আতিশয্যের ভিতর দিয়ে ঘটে নি—দৈবী মহিমার প্রকাশ ঘটেছে দুর্বোধ্য লীলাবিলাসে। তিনি যে কেন কলিঙ্গদেশ প্লাবিত করলেন, ব্যাধের উপর অযাচিত করুণা করলেন তার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না। বরঞ্চ তাঁর খামখেয়ালী মেজাজ, স্নিগ্ধ অথচ স্থূল কৌতুক, লৌকিক মাতৃসুলভ সন্তান বাৎসল্য, শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত পূজা-উপচারে সন্তুষ্টি মানবিক সহানুভূতি দাবি করে।

আমাদের মনে হয় মানুষের সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে চণ্ডী-চরিত্র কল্পনায় প্রসন্নতার ছাপ পড়েছে। ব্রাহ্মণ্য চেতনার দ্বারা পরিমার্জিত হওয়ার ফলেও দেবী চরিত্রে কোমলতার স্পর্শ লেগেছে। এইটে সভ্যতার অগ্রগতির স্মারক এবং জীবনছন্দানুবর্তনের পরিপূরকও বটে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর উৎস :

মঙ্গলচণ্ডীর পূজা বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তাঁকে কেন্দ্র করে ব্রতকথার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বিশেষতঃ অন্তঃপুরিকাদের অর্চনীয়া ছিলেন। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালকেতু এবং ধনপতির উল্লেখও পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে,—"আপনি স্বর্ণ-গোধিকা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কালকেতুকে বর দিয়াছেন, আপনি শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও

উদ্গিরণ করতঃ কমলে-কামিনী রূপে শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।” বৃহদ্ধর্ম পুরাণ অর্বাচীন পুরাণ বলে স্বীকৃত। এই পুরাণে কালকেতু-ধনপতির উল্লেখ থেকে মনে করা যেতে পারে কালকেতু-ধনপতি কাহিনী ঐ পুরাণ রচনার আগে থেকেই লোকগাথায়, ব্রত-পাঁচালীতে ছিল, যার অস্তিত্ব এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। ঐ সকল বিচ্ছিন্ন কাহিনী ষোড়শ শতকে কবি কল্পনায় জারিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকায় রূপান্তরিত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী :

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুইটি কাহিনী রয়েছে। একটি কালকেতু-ফুল্লরার অপরটি ধনপতি সদাগরের। এই দুইটি কাহিনীর মধ্যে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। দুইটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক গল্প। এই দুইটি গল্পের মধ্যে একমাত্র ঐক্য বিধায়ক সূত্র হল দুটিই দেবীর পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। দুইটি গল্পের পটভূমিকার বিভিন্নতা থেকে এই অনুমান করা যেতে পারে যে ব্যাধ-পূজিতা দেবী ধীরে ধীরে বণিক সম্প্রদায়ের পূজ্যা হয়ে উঠেছিলেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতোই দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ ইত্যাদি পুরাণানুগ বর্ণনার পর নরখণ্ডে মর্ত্য-কাহিনীর সূত্রপাত হয়েছে। মর্ত্য-কাহিনীতে কালকেতু-ফুল্লরা এবং ধনপতি সদাগরের গল্প পরিবেশিত হয়েছে। গল্প দুইটি নীচে বিবৃত হল।

কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী :

দেবী চণ্ডী নিজের পূজা এবং মাহাত্ম্য মর্ত্যে প্রচার করবার জন্য ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর এবং পুত্রবধূ ছায়াকে বাহন হিসেবে বেছে নিলেন। তিনি মহাদেবকে ধরে বসলেন নীলাম্বর এবং ছায়াকে শাপ দিয়ে নরদেহ ধারণ করিয়ে মর্ত্যে পাঠাতে। মহাদেব তাতে রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত অনেক অনুরোধ উপরোধের পর রাজী হলেন। মহাদেব অতঃপর নারদের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে চণ্ডীর সহায়তায় কৌশলসাধ্য উপায়ে নীলাম্বরকে অভিশাপ দিলেন। নীলাম্বর মর্ত্যে ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্ম নিলেন। তাঁর নাম হল কালকেতু। এদিকে বধূ ছায়া স্বামী বিরহে দেহত্যাগ করে সঞ্জয়ের ঘরে জন্ম নিলেন। তাঁর নাম হল ফুল্লরা। কালকেতু ধীরে ধীরে বড় হলেন। যেমন সুগঠিত তাঁর স্বাস্থ্য তেমনি তাঁর শক্তিমত্তা। তাঁর শক্তি ও সৌন্দর্য সত্যিই ঈর্ষার যোগ্য। কিন্তু

তাঁর আহার্য বস্তু ও আহার করবার ঢঙ্‌ হাস্যকর। বয়সকালে কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিয়ে হল। উভয়ের মিলন একেবারে রাজযোটক। কবির কথায় —হাঁড়ির উপযুক্ত সরা। ব্যাধের সংসার দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট। কিন্তু ঐ দারিদ্র্য তাদের মুখের হাসি ম্লান করতে পারে নি। পরস্পরের প্রতি গভীর প্রেমবোধ সংসারের দুঃখ কষ্টকে আনন্দে রূপান্তরিত করেছে। কালকেতু শিকার করে আনে, ফুল্লরা মাংস বিক্রী করে সংসার চালায়। কালকেতুর শিকারের ফলে বনের পশুরা সন্ত্রস্ত হয়ে দেবী চণ্ডীর কাছে কালকেতুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তাদের অভিযোগের তিরস্করণীর ফাঁকে সেদিনকার সমাজের মাৎস্যন্যায়ের চিত্রটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু কোথাও তিক্ততা নেই। দেবী কালকেতুর অত্যাচার থেকে পশুদের রক্ষা করবার জন্য মায়া বিস্তার করে সব পশুকে লুকিয়ে ফেললেন এবং নিজে স্বর্ণ-গোধিকার রূপ ধরে পথে পড়ে থাকলেন। কালকেতু শিকার না পেয়ে, অমঙ্গলসূচক গোধিকাটিকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে নিয়ে এলো। উদ্দেশ্য হল, গোধিকাটিকে শিকপোড়া করে আজকের ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। ফুল্লরা বেরিয়ে গেল খুদ ধার করে আনতে এবং কালকেতু গেল স্নান করতে। এর মধ্যে দেবী গোধিকামূর্তি ত্যাগ করে ষোড়শীর মূর্তি ধারণ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ফুল্লরা ফিরে এসে তাঁকে দেখে বিস্মিত হল। প্রশ্নোত্তরে জানতে পারল, সতিনীর অত্যাচারে পীড়িত হয়ে তিনি গৃহত্যাগ করে এসেছেন, কালকেতুর গুণে তিনি বশীভূত এবং কালকেতু তাঁকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে নিয়ে এসেছে। কাজেই এখন থেকে তিনি এখানে থাকবেন। ফুল্লরা পুরাণাদি থেকে সতীত্বের মহিমা কীর্তন করে, লৌকিক বুদ্ধি দিয়ে, দারিদ্র্যের ভয় দেখিয়ে চণ্ডীকে তাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে কালকেতুর কাছে গিয়ে হাজির হল। কালকেতু তো প্রথমে বিশ্বাসই করল না। ঘরে ফিরে এসে দেখল কথা ঠিক। তখন সে অনুনয়-বিনয়ে ব্যর্থ হয়ে ধনুকে শর যোজনা করল দেবীকে তাড়াবার জন্য। কিন্তু দেবীর মায়ায় শরচালনা আর করতে পারল না—অসাড় স্তম্ভিত বাহু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এইবার দেবী আত্ম-পরিচয় দিয়ে কালকেতুকে একটি আংটি এবং সাতঘড়া ধন দিলেন। তাকে আদেশ করলেন আংটি বিক্রয় লব্ধ অর্থে গুজরাটে নগর বসিয়ে তাঁর পূজা করতে। কালকেতু আংটি বিক্রী করতে গেল মুরারি শীলের কাছে। মুরারি অত্যন্ত ধূর্ত। সে প্রথমে কালকেতুকে ঠকাবার চেষ্টা করল। কিন্তু দৈববাণী হল: "সাত কোটি টাকা দিয়ে আংটি কেন, চণ্ডিকার বরে তোমার ধন বৃদ্ধি হবে।" মুরারি তখন কালকেতুকে 'সাত কোটি তঙ্কা' দিয়ে আংটি কিনে নিল।

কালকেতু ঐ টাকা দিয়ে বন কেটে গুজরাট নগরীর পত্তন করল। তার কাজে সহায়তা করল চণ্ডীর নির্দেশে বিশ্বকর্মা ও হনুমান। নগর তো হল কিন্তু নাগরিক কোথায়? চণ্ডী স্বপ্নে কলিঙ্গবাসীদের নির্দেশ দিলেন কালকেতুর নগরীতে গিয়ে বসবাস করতে। তারা সেই নির্দেশ অগ্রাহ্য করল। চণ্ডী ক্রুদ্ধ হয়ে প্লাবনে কলিঙ্গদেশ ভাসিয়ে দিলেন। মানুষের দুর্গতির সীমা রইল না। রাজাও কর মকুব করেন না। তখন তারা যুক্তি-পরামর্শ করে গুজরাটে গিয়ে বসতি স্থাপন করল। কালকেতু তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালো। এলো বুলান মণ্ডল, ভাঁড়ু দত্ত সকলে। যে যার জাতি-কর্ম অনুযায়ী এক একটি অঞ্চল ঘিরে বসতি স্থাপন করল। ভাঁড়ু দত্ত অত্যন্ত শঠ প্রকৃতির লোক। একমাত্র বংশাভিমান ছাড়া তার সম্বল বলতে কিছুই নেই। সে মিষ্টি কথায় কালকেতুকে ভুলিয়ে হাটে 'তোলা' তোলার কাজ নিল। 'তোলা' তুলবার অছিলায় মানুষের উপরে ভাঁড়ু অত্যাচার সুরু করে দিল। কালকেতু তা জানতে পেরে ভাঁড়ুকে দূর করে দিলে ভাঁড়ু তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কলিঙ্গরাজকে উত্তেজিত করে কালকেতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করালো। প্রথম যুদ্ধে কালকেতু জয়লাভ করলেও দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে সে ব্যাধোচিত বুদ্ধিতে ধানের গোলায় আত্মগোপন করল। ভাঁড়ুর কৌশলে শেষ পর্যন্ত কালকেতু বন্দী হল। বন্দীদশায় দেবীর স্তব করলে দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন কালকেতুকে মুক্তি দিতে। কালকেতু মুক্ত হল, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে তার সখ্যতা হল, ভাঁড়ু তার শঠতার শাস্তি পেল। তারপর দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করে শাপের মেয়াদ ফুরুলে কালকেতু-ফুল্লরা স্বর্গে চলে গেল।

ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান :

ব্যাধপূজিতা দেবী বণিক সম্প্রদায়ের কাছে কি ভাবে পূজ্যা হলেন ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে তার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। এখানেও দেখা যাবে চণ্ডী তাঁর পূজা প্রচারের অভিলাষে স্বর্গরাজ্যের নাগরিক নর্তকী রত্নমালা এবং ইন্দ্রের পুত্র মালাধরকে শাপগ্রস্ত করিয়ে মর্ত্যে পাঠিয়েছেন। মর্ত্যজীবনে রত্নমালার নাম হল খুল্লনা, মালাধরের নাম হল শ্রীমন্ত। খুল্লনার পিতা হলেন লক্ষপতি, মাতা হলেন রম্ভা। তাঁদের বাস ইচ্ছানি নগরে। শ্রীমন্তের পিতা হলেন ধনপতি, মাতা হলেন খুল্লনা। এঁদের বাস উজানী নগরে। ধনপতি উজানীরাজ বিক্রমকেশরীর প্রজা, শৈব-সদাগর। রূপে-গুণে-কুলে ধনপতি বিশেষ খ্যাতিমান। ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার জ্যেঠতুত বোন লহনার আগেই

বিয়ে হয়েছিল। পরে খুল্লনার রূপে আকৃষ্ট হয়ে ধনপতি খুল্লনাকে বিয়ে করল। এই বিয়ের খবর শুনে লহনা তো রেগেই আগুন। কেননা স্বামীর সোহাগের ভাগীদার জুটেছে। কে-ই বা তা সহজে মেনে নেয়। যাই হোক, ধনপতির মধ্যস্থতায় দুই সতীনের মধ্যে মিলমিশ হয়ে গেল। ধনপতি ব্যবসা করতে দেশের বাইরে গেলেন। এই সুযোগে দাসী দুর্বলা লহনা-খুল্লনার মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দিল। সখী লীলাবতীর বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়ে লহনা ধনপতির জাল চিঠি দেখিয়ে খুল্লনাকে ছাগল চরাতে, ঢেঁকিশালে শয়ন করতে বলল। খুল্লনা তাতে রাজী হবে কেন? তা নিয়ে কথা-কথান্তর, হাতাহাতি হল। শেষ পর্যন্ত খুল্লনা পেরে উঠল না। তাকে ছাগল চরাবার কাজই করতে হল। এর মধ্যে একটি ছাগল গেল হারিয়ে। ছাগল খোঁজবার সময় তার সঙ্গে পাঁচজন দেবকন্যার দেখা হল, তারা খুল্লনাকে বললো চণ্ডীর পূজা করতে। খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করবার পর হারানো ছাগল ফিরে পেল। এই সবই চণ্ডীর কারসাজি। এদিকে চণ্ডী খুল্লনার উপর অত্যাচার করবার জন্য লহনাকে স্বপ্নে খুব শাসালেন। খুল্লনাকে তাঁর পদে অচলা ভক্তি থাকবে বলে বর দিলেন। চণ্ডীর শাসানিতে ভীত হয়ে লহনা খুল্লনাকে ঘরে তুলে নিয়ে আদর যত্ন করতে থাকল। ইতোমধ্যে ধনপতি দেশে ফিরে সব ঘটনা জেনে লহনাকে তিরস্কার করল। এরপর ভালভাবে কিছুদিন কেটে গেল। সহসা ধনপতির পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতৃশ্রাদ্ধের সময় শরীকেরা ঘোঁট পাকাল, তখন খুল্লনার সতীত্বের প্রশ্ন উঠল। সতীত্বের পরীক্ষায় খুল্লনা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এরপর ধনপতি বাণিজ্য উপলক্ষে সিংহল যাত্রা করল। যাত্রার প্রাক্কালে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দেওয়াতে খুল্লনা চণ্ডীপূজার আয়োজন করল। লহনার কাছ থেকে তা জানতে পেরে সদাগর পূজার ঘট লাথি মেরে ফেলে দিয়ে চলে গেল। চণ্ডী এতে রুষ্ট হলেন। পথে সদাগরের আর্থিক ক্ষতি হল, কমলে-কামিনী মরীচিকায় বিভ্রান্তির ফলে সিংহল রাজার কারাগারে বন্দী হল। সদাগর কালীদহে দেখেছিল পদ্মের উপরে অধিষ্ঠিতা এক দেবী একবার হাতী গিলছেন পরক্ষণেই তাকে উগরে ফেলছেন। ধনপতি সিংহলে পৌঁছিয়ে সেখানকার রাজার কাছে কমলে-কামিনীর অলৌকিক কাহিনী বিবৃত করল। রাজা বিশ্বাস করতে চাইলেন না, ধনপতিরও রাজাকে বিশ্বাস করাবার রোখ চেপে গেল। শেষে উভয়ে চুক্তিবদ্ধ হল যে, রাজাকে ঐ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করাতে পারলে রাজা তাকে অর্ধেক রাজ্য ছেড়ে দেবেন, আর না পারলে ধনপতিকে বারো বছর কারাবাস করতে হবে। বলা বাহুল্য ধনপতি চণ্ডীর ছলনায় শিকার হল।

তার কপালে জুটল কারাবাস। ইতোমধ্যে শ্রীমন্তের জন্ম হয়েছে—সে বড়ো হয়েছে। শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে সিংহলে এলো। শ্রীমন্তকে দেবী একই ভাবে ছলনা করলেন। ফলে সিংহলের রাজা তার প্রাণদণ্ড দিলেন। এই সময় শ্রীমন্ত ভক্তিভরে চণ্ডীর স্তব করল। দেবী চণ্ডী এবার তুষ্ট হয়ে ধনপতি-শ্রীমন্তের মুক্তি বিধান করলেন। সিংহল রাজার কন্যার সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে হল। ধনপতি, শ্রীমন্ত ও শ্রীমন্তের পত্নী সুশীলা দেশে ফিরে এলো। স্বদেশের রাজা বিক্রমকেশরীর কাছে কমলে-কামিনীর কথা বিবৃত করলে তিনিও বিশ্বাস করলেন না। বরঞ্চ বললেন, কমলে-কামিনী দেখাতে না পারলে শ্রীমন্তের প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমন্ত রাজাকে দেবীর কৃপায় কমলে-কামিনী প্রত্যক্ষ করালো। বিক্রমকেশরী তাঁর কন্যা জয়াবতীর সঙ্গে শ্রীমন্তের বিয়ে দিলেন। জয়াবতী স্বর্গের মালাধরের পত্নী ছিলেন। ধনপতিও দেবীর কৃপায় বুঝতে পারল, শিব ও শক্তি অভিন্ন। এরপর শ্রীমন্ত মর্ত্যে দেবীর পূজা প্রচার করে স্বর্গে ফিরে গেল। কবি বললেন :

> "এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ।
> বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন ॥"

কাহিনী সমালোচনা :

কাব্য-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে দেশ, কাল, পটভূমিকার পরিচয় নেওয়া দরকার। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রীঃ। মুকুন্দরামের কাব্য রচনাকাল নিঃসংশয়ে বলা দুরূহ, তবে কাব্যের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এবং ঐতিহাসিক তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৫৯৪—১৬০০ খ্রীঃ মধ্যে তিনি কাব্য রচনা করে থাকবেন। এই সময় বাংলার শাসন ব্যবস্থায় নৈরাজ্য চলছিল। মুকুন্দরামের কাব্যে সেই নৈরাজ্যের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। জমি জরীপে চোরামি, উৎকোচ গ্রহণ, টাকায় আড়াই আনা বাট্টা আদায়, শক্তিমানের অত্যাচার, জীবনের অনিশ্চয়তা স্বাভাবিক জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। এই সময় মানুষ দৈব-শক্তির আশ্রয় নিয়ে স্বস্তি-লাভ করতে চেয়েছে। যে দেবতার কাছে মানুষ আশ্রয় নিল তিনি হলেন চণ্ডী। পক্ষান্তরে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগে চণ্ডীও তাঁর আসন প্রতিষ্ঠা করে নিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, সেদিনকার রাষ্ট্রনীতিতে "উসকো শির লে আও" না বলা পর্যন্ত রাজশক্তির অস্তিত্বই টের পাওয়া যেত না। নবাব-সম্রাটদের নবাবীত্ব-সম্রাটত্বের

একমাত্র পরিচয় ছিল শক্তির অপ্রতিহত প্রয়োগে। এই শক্তির খামখেয়ালী-পনায় উজীর ফকির হয়েছে, ফকির উজীর হয়েছে। শক্তির ভীষণতার কাছে মানুষ আত্মসমর্পণ করে তার দয়াভিক্ষা করেছে। বাস্তব জীবনে মনুষ্যত্বের এই অভিভব জনিত চিত্ত কলুষ, দৈন্য, দেব চরিত্রকেও কলুষিত করেছে। মানুষ তাঁর শক্তিকে বড করে দেখেছে, এই শক্তির কাছে নিঃসত্ত আত্মসমর্পণ করেছে। চণ্ডীর দৈবী মহিমার প্রকাশ ঘটেছে শক্তির অহৈতুক প্রসাদে বা ক্রোধে। তাব মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ধর্মাধর্ম, যোগ্যতা-অযোগ্যতার ভেদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে। এই শক্তি যখন প্রসন্না তখন মাতা, যখন রুষ্টা তখন চণ্ডী। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুব যথার্থ বলেছেন—"বাস্তব জগতে খামখেয়ালী এক একজন নবাবশাবক রাজত্ব করেছেন, অধ্যাত্ম-রাজ্যেও তেমনি এক একজন দেবশাবক রাজত্ব করেছেন। এই শক্তি কোনও সংযম মানে না, তা বাধাবিহীন লীলা।"

তবুও আমরা এই কথা বলতে পারি, চণ্ডীর মধ্যে মনসার মতো ভীষণতা নেই। তাঁর দৈবীমহিমার প্রকাশ ঘটেছে স্বর্ণ-গোধিকার মূর্তি গ্রহণে, কালকেতু শর চালনা করতে উদ্যত হলে তাকে স্তম্ভিত করায়, কমলে-কামিনী মূর্তিতে ধনপতি-শ্রীমন্তকে ছলনায়, নানা দৈবী দুর্বিপাক সৃষ্টিতে, আবার স্তবে পরিতুষ্ট হয়ে সকল মুস্কিল-আসানে। সম্ভবতঃ এর মূলে রয়েছে মনসামঙ্গলের কালের চাইতে আপেক্ষিক অর্থে কিছুটা স্থিরতা, দ্বিতীয়তঃ চৈতন্য-প্রভাব, তৃতীয়তঃ প্রাথমিক পরিচয়ের ভীতির অপনোদন। তবুও শক্তির যদৃচ্ছাচারিত্বের অভিযোগের ব্যত্যয় ঘটে না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণে বলেছেন,—"তাঁহার শাস্তির মধ্যে যেমন হিংস্র আতিশয্য নাই, তাহার কৃপার মধ্যেও সেইরূপ অপরিমিত দাক্ষিণ্যের অভাব। তাঁহার ক্রোধ প্রভাত মেঘের ন্যায় ক্ষণিক বিপর্যয় ঘনাইয়া তোলে; তাঁহার প্রসাদও সেই স্বল্প-বর্ষণ মেঘকে গলাইয়া আবার সূর্যোকরোজ্জ্বল আকাশ-নীলিমাকে অবারিত করে।"

যেহেতু দেবতার অমোঘ শাসন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে গ্রাস করে নি, দেবী কিছুটা শান্ত মূর্তিতে আবির্ভূতা, মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্কে সম্পর্কিতা, সেই জন্য এই কাব্যের সমাজ চিত্রে জীবন-ছন্দের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে। চরিত্রের চলনে-বলনে, প্রাণবন্ততায়, সামাজিক ঘোঁট পাকানোতে, বসতি স্থাপনে, জাতি-কুল-ধর্মের আচার-বিচারে, সতীনের কোঁদলে, হাস্য-পরিহাসের ঝিলিকে, এমন কি পূজ্যা দেবীর প্রতি সহাস্য তির্যক কটাক্ষে সমগ্র জীবন তার স্বাভাবিক ছন্দানুবর্তন করেছে। এইখানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সাহিত্য গৌরব।

॥ মাণিকদত্ত ॥

কবি পরিচয় ঃ

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংখ্যাপ্রাচুর্য মনসামঙ্গল কাব্যের অনুরূপ নয়। লক্ষণীয় এই যে মনসামঙ্গল অসংখ্য কবির দ্বারা রচিত হতে হতে ধারাক্রমে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। পক্ষান্তরে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য দ্বিজ মাধব এবং মুকুন্দরামের প্রতিভাস্পর্শে মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠীর মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছে। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কারণে আদি কবি বলে অনুমিত মাণিকদত্তের নাম স্মরণ করতে হয়। কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে মাণিকদত্তের উল্লেখ করে বলেছেন যে, কাব্য-রচনার কাঠামো তিনি মাণিকদত্তের কাছে পেয়েছেন। মাণিকদত্তের পুঁথি মালদহে পাওয়া গেছে। মাণিকদত্তের আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, তিনি মালদহের ফুলুয়া বর্তমানে ফুলবাড়ীতে বসবাস করতেন। তিনি কানা এবং খোঁড়া ছিলেন। কাব্যরচনার ফলে দেবীর কৃপায় সুস্থ হয়েছিলেন। তাঁর কাব্য রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বলে অনুমান করা হয়।

॥ দ্বিজ মাধব ॥

কবি পরিচয় ঃ

দ্বিজ মাধবের ব্যক্তিক পরিচয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাঁর পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কারণে সুধীভূষণ ভট্টাচার্য চট্টগ্রামে কবির বাস ছিল বলে দাবি করেছেন। অথচ কাব্যে ঐ অঞ্চলের নদ-নদী-গ্রামের কোন উল্লেখ নেই। তাই কবির আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক পয়ারকে মূল ধরে কোনও কোনও সমালোচক বলেছেন, কবি ত্রিবেণীর নিকটবর্তী সপ্তগ্রামের আদি বাসিন্দা। পরে দেশে বিশৃঙ্খলার সময় চট্টগ্রামে চলে গিয়েছিলেন এবং চট্টগ্রামে বাসকালে কাব্য রচনা করেছিলেন। আবার কবির আত্মপরিচয়ের প্রামাণিকতাও প্রশ্নাতীত নয়। দ্বিজ মাধবের কাব্য রচনা কাল ১৫৭৯ খ্রীঃ। এই বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। তাঁর গ্রন্থের আসল নাম "সারদাচরিত"। "সারদামঙ্গল" সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য নামকরণ করেছেন "মঙ্গলচণ্ডীর গীত"। নাম পরিবর্তনের পক্ষে তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তা খুব জোরালো বলে মনে হয় না। কবিকৃত নাম অক্ষত রাখাটাই যুক্তিযুক্ত ছিল।

কাব্য পরিচয় ঃ

দ্বিজ মাধবের কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এতে রয়েছে দেবীর মঙ্গলাসুর বধ, তন্ত্র, হঠযোগ, সহজিয়া সাধন প্রকরণের সবিশেষ উল্লেখ, ধর্ম-ঠাকুরের বন্দনা। এর থেকে মনে হয়, তখন তন্ত্র, হঠযোগ, ধর্মমঙ্গল কাব্যের গূঢ় সঞ্চারী প্রভাব বাংলাদেশে ক্রিয়াশীল ছিল। কাহিনী বর্ণনা গতানুগতিক। গল্পটি পূর্বেই বলেছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁর কাব্য সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যেতে পারে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—"মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দ্বিজ মাধব একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। আনুপূর্বিক সঙ্গতি রক্ষা করিয়া পূর্ণাঙ্গ চরিত্র সৃষ্টির এমন মৌলিক প্রয়াস তাঁহার পূর্বে আর খুব বেশী কবি দেখাইতে পারেন নাই। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্যে তখনও মুকুন্দরামের আবির্ভাব হয় নাই।" এইটে ঠিক কথাই যে তাঁর পূর্বে চরিত্র সৃষ্টির গৌরব একমাত্র নারায়ণ দেবের কাব্যে পেয়েছি। তারপরে এসে দেখি দ্বিজ মাধবের কাব্যে। দ্বিজ মাধব প্রথম চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যানকে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিচ্ছন্ন রূপ দেন। সমাজের চিত্রলেখা তাঁর কাব্যে খুঁটিনাটি সব কিছু নিয়ে বিশদভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই তাঁর কাব্য তথ্য-ভারাক্রান্ত ;—তথ্যের রসরূপায়ণ কচিৎ দেখা যায়। তাঁর কাব্যে বৈষ্ণব প্রভাব সুপ্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। আখ্যানের বিভিন্ন অংশে তিনি ভাবানুযায়ী বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে "বিষ্ণুপদ" রচনা করেছেন।

॥ মুকুন্দরাম ॥

কবি পরিচয় ঃ

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কয়েক পুরুষ ধরে বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামে তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর অধীনস্থ প্রজা রূপে বসবাস করতেন। রাজনৈতিক এবং সামাজিক সংকটের ফলে তিনি বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি পত্নী, শিশুপুত্র, কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং দামোদর নামে এক অনুচরকে নিয়ে গৃহত্যাগ করলেন। পথের মাঝে যা কিছু সম্বল ছিল রূপ রায় নামে এক ডাকাত তা ছিনিয়ে নিল। অনেক কষ্টে-সৃষ্টে কবি মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের সভায় উপস্থিত হলেন। বাঁকুড়া রায় কবির কথাবার্তায়, বিদ্যাবুদ্ধিতে পরিতুষ্ট হয়ে তাঁকে পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কবির দিন এবার ভালভাবে কাটতে লাগল। এদিকে

আসবার পথে গুচুড়ে গ্রামে পুকুরের পাড়ে কবি আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন চণ্ডী স্বপ্নে তাঁকে চণ্ডীর মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্য রচনা করতে আদেশ করেছিলেন। বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে আসবার পর কবির আর সে কথা মনে ছিল না। অনুচর দামোদর স্বপ্নের কথা জানতেন। তিনি কবিকে স্বপ্নাদেশের কথা মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কবি বিশেষ গা করেন নি। ইতোমধ্যে তাঁর পুত্রবিয়োগ হল। কবি এবার 'অভয়ামঙ্গল' রচনা করলেন। এইটে নামান্তরে 'চণ্ডীমঙ্গল' নামে খ্যাত। এই কাব্য রচনায় রঘুনাথ রায় তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিলেন।

কবির চরিত্রে চৈতন্য-সংস্কৃতি গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। এইজন্যই তাঁর মধ্যে মানবজীবনের প্রতি সার্বিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছিল। মামুদ-সরীপের অত্যাচারে বাস্তচ্যুত হলেও ব্যক্তির অপরাধকে সম্প্রদায়ের উপর তিনি আরোপ করেন নি। সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের জীবন ধারাতেও তিনি লক্ষ্য করেছেন যে সমাজের অখণ্ড জীবনস্রোত প্রবহমানতায় এদেরও বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে এবং সেখানে তার নিজস্ব মূল্যেই সে গরীয়ান। কালকেতুর নগর পত্তনে তা পরিস্ফুট হয়েছে। জীবনদৃষ্টির এই ঔদার্যকে বলেছি চৈতন্য-সংস্কৃতির গূঢ় প্রভাব। সম্ভবতঃ এই সপ্রেম দৃষ্টি তাঁর রচনার প্রাণশক্তি এবং এরই জোরে তিনি মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবির পদে উন্নীত হয়েছেন।

তাঁর গ্রন্থে মানসিংহের উল্লেখ আছে। মানসিংহকে তিনি গৌড়-বঙ্গ-উৎকলাধিপ বলেছেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মানসিংহ ১৫৯৪—১৬০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার সুবেদার ছিলেন। আবার দেখা যাচ্ছে রঘুনাথ রায়ের আমলে কাব্য রচনা করেছেন। রঘুনাথের রাজত্বকাল ১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীঃ। কাজেই মনে করা যেতে পারে কবি ১৫৯৪-১৬০৬ খ্রীঃ মধ্যে কাব্য রচনা করেছেন।

কাব্য পরিচয় ঃ

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যানবস্তুতে কোন বৈচিত্র্য সঞ্চার করেন নি। প্রচলিত কাঠামোতে তিনি প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন। এইখানেই তাঁর অনন্যসাধারণতা। জীবনরস রসিকতা তাঁর কাব্যকে অসাধারণ শিল্প-গুণে মণ্ডিত করেছে। তাঁর কাব্যের বাস্তবরস, জীবনানুভূতি, সমাজচিত্র, চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে সূক্ষ্ম সঙ্গতিবিধান দেখে মনে হয় আগামী যুগের

কথা-সাহিত্যের বীজ তিনি রোপণ করে গেছেন। তিনি যদি এই শতকে আবির্ভূত হতেন তাহলে শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক রূপে বরণীয় হতেন। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে জীবন সম্পর্কে নিরাশ করে নি—বরঞ্চ জীবন সংসক্তিকে আরও গভীর করেছে। মন্তব্যটি আপাতঃভাবে বিসদৃশ মনে হতে পারে। কিন্তু রহস্য হল এই যে, যে কবির জীবনবোধ গভীর, দুঃখের অভিঘাতে তাঁর সেই বোধ আরও পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ বৃত্ত এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠে। দুঃখের অভিঘাত তাঁকে নত করতে পারে না। জীবন রসিকতার ভিয়ানে দুঃখও রস হয়ে উঠে। মুকুন্দরামের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। বাস্তবজীবনে তিনি যে স্থূল দুঃখ ভোগ করেছেন, আশপাশে দুঃখ-দুর্দশার যে কালো রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তার থেকে তাঁর মানসিক উত্তরণ ঘটেছিল, ফলে তাঁর কাব্যে সেই দুঃখ রস হয়ে উঠেছে। জীবনের প্রতি এইটে এক সানুরাগ দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে মুরারি, ভাঁড়ু, এমন কি চণ্ডী পর্যন্ত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রক্তমাংসের প্রাণবন্ততায় সহানুভূতি দাবি করেছে। তাই নিঃসংশয়ে বলতে পারি মুকুন্দরামের কাব্যে যে বস্তুরসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে দুর্লভ এবং চরিত্রাবলী সার্বভৌমিক বাস্তব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। জীবনে ভালো-মন্দ দুই-ই রয়েছে, শুভ-অশুভ দুয়ের টানা পোড়েনে জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করে। জীবন-রসিক ব্যক্তি এই দুয়ের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেন। যেখানে অসঙ্গতি দেখেন সেখানে কৌতুক বোধ করেন—জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ প্রসন্ন দৃষ্টি থাকে বলেই এই রকমটি হয়। ফলে জীবন আপন বাস্তবতায় ভাস্বর হয়ে উঠে। তিনি যেন যবনিকা সরিয়ে বলেন—'দেখ জীবনের কি বিচিত্র বিকাশ।' মুকুন্দরামের ক্ষেত্রে এইটে ঘটেছে। জীবনকে দেখবার বিশেষ মনোভঙ্গীর জন্য তাঁর কাব্যে অভূতপূর্ব বাস্তবরস, রসিকতার ছাপ পড়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত এই কারণে বলেছেন,—"The thought and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature."

(গ) ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মঠাকুরের উদ্ভব :

ধর্মঠাকুর মূলতঃ অনার্য দেবতা। ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের আদিবাসী কোমেদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রাচীনকালে রাঢ় অঞ্চল বলতে বোঝাত পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল বেষ্টিত ভূখণ্ডকে। রাঢ় দেশ দীর্ঘদিন আর্যপ্রভাব মুক্ত ছিল। এই অঞ্চলের আর্যেতর জাতি হল 'কোম'। এদের সমাজে ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলের আর্যীকরণের বিলম্বের ফলে ধর্মোপাসকেরা নিজ নিজ আচার-আচরণ, বিধি-বিধান, সামাজিকতার চারপাশে দৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে ধর্মঠাকুরের আর্যীকরণও ঘটেছিল বহু পরে। ধর্মপূজার পুরুতরা ছিলেন ডোম, কৈবর্ত, বাগদী ইত্যাদি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী-ভুক্ত। ধর্মঠাকুরের প্রতীক হল খরম। ধর্মঠাকুরের বর্তমান যে রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেইটি বৌদ্ধ লোকাচার এবং পৌরাণিক হিন্দুধর্মের তান্ত্রিকতার আচার ক্রিয়াদির মিশ্রণে সৃষ্ট সঙ্কর রূপ। শূন্য-পুরাণে বলা হয়েছে ধর্মঠাকুর নিরাকার, তার বাহন শাদা পেঁচা বা কাক। তার প্রতীক কোথাও কূর্মাকৃতি, কোথাও ডিম্বাকৃতি শিলা বিগ্রহ। এই প্রতীকের মাথায় খড়মের চিহ্ন দেখা যায়। ধীরে ধীরে ধর্মঠাকুর বৈদিক বরুণ, সূর্য, কল্কি অবতার ইত্যাদি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছেন। এজন্য বলেছি ধর্মঠাকুর সঙ্কর দেবতা। ধর্মঠাকুর কোথায়, কিভাবে, কোন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে বর্তমান রূপ লাভ করেছেন তার জটিল গ্রন্থি উন্মোচন আজ অসাধ্য। তবে একথা ঠিক যে ধর্মঠাকুর দীর্ঘদিন ধরে বাংলার অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পূজা ভক্তি পেয়ে আসছেন। অনার্য দেবদেবীর আর্যীকরণের সন্ধিক্ষণেও নিজের ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করেই তিনি পৌরাণিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পৌরাণিক মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার মুখে উচ্চবর্ণের কবিদের দ্বারা তার মাহাত্ম্য-প্রচারক কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই কাব্য ধর্মমঙ্গল নামে পরিচিত।

ধর্মঠাকুরের চরিত্র ও কাব্যে প্রভাব :

মনসার মতো ধর্মঠাকুরের চরিত্রে হিংস্র পূজালোলুপতা নেই। চণ্ডীর মতো ভক্তকে প্রলুব্ধ করবার প্রয়োজনও তিনি বোধ করেন নি। এর কারণ

বোধকরি সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে তাঁর প্রতিষ্ঠা পূর্ব থেকেই ছিল বলে তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন নি—অথবা তাঁর "প্রেষ্টিজ" বোধটা মনসা, চণ্ডীর মতো উগ্র নয়, কিংবা ঔদাসীন্যের আড়ালে "প্রেষ্টিজ" বোধ চাপা পড়ে গেছে। ধর্মঠাকুরের চরিত্রে নিস্পৃহ, ঔদাসীন্যের ছাপ পড়েছে। তাঁর কৃপালাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয় হীন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর শরণ নিলে তিনি ফলদান করেন না। মহামদের পূজা পেয়েও তাকে আকাঙ্ক্ষিত ফলদান করেন নি—বরঞ্চ সে তাঁর রোষ-ভাজন হয়েছিল। কাজেই বলা যেতে পারে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর সাধারণ চরিত্র-লক্ষণের সঙ্গে তাঁর চরিত্র-ধর্মের পার্থক্য রয়েছে। যেহেতু কোনও দেব-মানবের সংঘর্ষের সঙ্গে ধর্মঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, সেইজন্য কাব্যে দৈবী প্রভাব থাকলেও তা ঐ কাব্যের যুদ্ধবিগ্রহের অন্তরালশায়ী মানবিক বিজিগীষা এবং লৌকিক কার্যকারণ সম্পর্ককে আচ্ছন্ন করে নি।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী :

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ধর্মোৎসবে বারো রাত্রি ধরে পাঠ করা হত। তাই একে বারোমতি বা বার্মাতি বলা হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী বারোদিনের পালায় বিভক্ত। এক একদিনের পালাকে এক এক 'মতি' বলা হয় এবং এই কাব্য দুইটি খণ্ডে বিভক্ত। একটি 'ধর্মপুরাণ'—ধর্মপূজার বিধি-বিধান-প্রকরণ এর উপজীব্য। দ্বিতীয়টি ধর্মদেবতার মাহাত্ম্য প্রচারক কাব্য বা ধর্মমঙ্গল কাব্য। এর উপজীব্য লাউসেনের গল্প-কথা। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো ধর্মমঙ্গল কাব্যেরও একটি প্রাচীন রূপ লাউসেনের কাহিনীর ফাঁকে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী থেকে অনুমান করা যেতে পারে। রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় শালে ভর দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনা করতে চাইলে কর্ণসেন তাতে সংশয় প্রকাশ করেন। তখন রঞ্জাবতী হরিশ্চন্দ্রের পত্নী মদনা ধর্মপূজা করে কি ভাবে পুত্রলাভ করেছিলেন সেই কাহিনী বর্ণনা করেন। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনীটি সম্ভবতঃ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিম রূপ। পরবর্তীকালে গৌড়েশ্বরকে কেন্দ্র করে লাউসেনের কাহিনী যুক্ত হয়ে ঐ কাহিনী বিশাল রূপ পরিগ্রহ করেছে। লাউসেনের কাহিনীর জনপ্রিয়তা মূল কাহিনীকে নিজের উপাঙ্গ হিসেবে গ্রাস করে নিয়েছে। এখন আমরা লাউসেনের কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত করব।

ধর্মপালের পুত্র তখন গৌড়ের রাজা। তার মন্ত্রী ছিলেন তাঁর শ্যালক মহামদ। এই মহামদ ছিলেন অত্যন্ত কুচক্রী, ঈর্ষালু প্রকৃতির মানুষ। মহামদ

প্রজা সোমঘোষের উপর নানা অত্যাচার করেন। ফলে রাজা সোমঘোষকে ত্রিষষ্ঠীগড়ের সামন্তরাজ কর্ণসেনের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। সোমঘোষের পুত্র ইছাই পার্বতীর বরে বলীয়ান হয়ে কর্ণসেনকে রাজ্যচ্যুত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। গৌড়েশ্বর দুর্বিনীত ইছাইকে শায়েস্তা করবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করলেন। যুদ্ধে তিনি পরাজিত হলেন, কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হলেন, পুত্রবধূরা সহমৃতা হলেন, পত্নী শোকে প্রাণত্যাগ করলেন। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনের সঙ্গে শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিয়ে দিলেন। এতে মহামদ রুষ্ট হলেন, কারণ বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে ভগ্নীর বিয়েতে তাঁর আপত্তি ছিল। তিনি কর্ণসেনকে 'আঁটকুড়া' বলে অপমান করলেন। রঞ্জাবতী এইজন্য পুত্র কামনায় শালে ভর দিয়ে প্রাণান্তকর সাধনায় ধর্মঠাকুরকে তুষ্ট করতে চাইলেন। কর্ণসেন তাঁকে নিবৃত্ত করতে চাইলে রঞ্জাবতী হরিশ্চন্দ্র-মদনার কৃচ্ছ্রসাধনার দ্বারা ধর্মকে পরিতুষ্ট করে পুত্রলাভের কাহিনী বিবৃত করলেন এবং সাধনায় বসলেন। ধর্মের কৃপায় তিনি এক পুত্রলাভ করেন। এই পুত্রের নাম লাউসেন। লাউসেন হনুমানের কাছ থেকে মল্লযুদ্ধ শিখলেন। চরিত্রবলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পার্বতীর কাছ থেকে তরবারী লাভ করলেন। এরপর তিনি কর্পূরসেনকে নিয়ে গৌড়যাত্রা করলেন। পথের নানা বাধা, বিঘ্ন, বিভীষিকা অতিক্রম করে, নানা প্রলোভন জয় করে তিনি গৌড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে মহামদের চক্রান্তে চোর বলে অভিযুক্ত হলেন এবং কারারুদ্ধ হলেন। ধর্মের কৃপায় কারামুক্ত হলেন। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। মহামদের চক্রান্তে রাজা তাঁকে কামরূপ জয় করতে পাঠালেন। ধর্মঠাকুর রক্ষিত লাউসেন কামরূপ জয় করলেন, রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিয়ে করলেন। দেশে ফিরবার পথে মঙ্গলকোট ও বর্ধমানের রাজকন্যা অমলা-বিমলাকে বিয়ে করলেন। লাউসেনের সাফল্য মহামদের প্রতিহিংসা বৃত্তিতে ঘৃতাহুতি দিল। এদিকে সিমুলার রাজকন্যা কানড়াকে বিয়ে করবার জন্য রাজা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কানড়া রাজী হলেন না। ক্রুদ্ধ রাজা যুদ্ধ যাত্রা করলেন। কানড়া তখন একটি লোহার গণ্ডার এনে প্রস্তাব করলেন, গণ্ডারকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করতে পারলে কানড়া রাজাকে বিয়ে করবেন। রাজা তা পারলেন না। লাউসেন গণ্ডারটিকে দ্বিখণ্ডিত করলেন এবং কানড়াকে বিয়ে করলেন। এইবার মহামদ রাজাকে পরামর্শ দিলেন ইছাইকে দমন করবার জন্য লাউসেনকে নিযুক্ত করতে। লাউসেন রাজাদেশে ইছাই ঘোষকে দমন করলেন। ইছাই যুদ্ধে নিহত হল। ইতোমধ্যে দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা গেল। রাজা এবার লাউসেনকে সূর্যের পশ্চিমোদয় ঘটাতে নির্দেশ করলেন।

লাউসেন এবার কঠিন সাধনায় বসলেন। নিজের দেহকে নয়টি খণ্ডে বিভক্ত করে ধর্মসাধনায় বসলেন। এই ফাঁকে মহামদ কর্ণসেনকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে লখাই, ডোমনী ও কানড়ার হাতে পরাজিত হয়ে মুখে চূণকালি মেখে চলে এলেন। এদিকে লাউসেনের সাধনায় তুষ্ট হয়ে ধর্ম পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটালেন। মহামদ তাকেও মিথ্যা প্রমাণ করতে চাইলেন। ফলে ধর্মের রোষে কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত হলেন। শেষে লাউসেনের প্রার্থনায় তাঁর রোগমুক্তি ঘটল। এইভাবে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করে লাউসেন পুত্র চিত্রসেনকে রাজ্যভার দিয়ে দেহত্যাগ করলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের 'নরখণ্ড' এইখানে সমাপ্ত হয়েছে।

কাহিনী সমালোচনা :

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কাহিনীটি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত থাকলেও তার বর্তমান কাব্যরূপের সূত্রপাত তুর্কী আক্রমণোত্তর কালে। ষোড়শ শতকের আগে ধর্মমঙ্গলের কোনও পুঁথি পাওয়া যায় নি এবং এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি পাচ্ছি অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এর কারণ হল এই যে, ধর্মপূজা নিরক্ষর অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের ভিতরেই আবদ্ধ ছিল। ফলে সেই সমাজের স্থূল কল্পনার বন্ধন মুক্তি ঘটতে বেশ সময় লেগেছিল। দীর্ঘকাল সাপেক্ষে ধর্ম-ঠাকুরের আর্যীকরণ হওয়ার পর উচ্চতর কবিশক্তিকে আশ্রয় করে তার বর্তমান কাব্যরূপটি গড়ে ওঠে।

ধর্মমঙ্গল কাব্য-কাহিনীতে ইতিহাসের ক্ষীণ ছায়াপাত অনুভূত হলেও তার ঐতিহাসিকতা সংশয়াতীত নয়। তবে রাঢ় অঞ্চলের জনজীবনের অরুগ্ন-বলিষ্ঠ-বর্বরতা, প্রাণ-ঝড়ে উড়ে চলবার উল্লাস অভিব্যক্ত হয়েছে। দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার এর লক্ষ্য হলেও এবং তৎসূত্রে অলৌকিকতার সমাবেশ-প্রাচুর্য কাব্যে অভিব্যক্ত হলেও তা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। এখানকার যুদ্ধবিগ্রহ, কূটচক্রান্ত, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণ ও হীন স্বার্থ-বুদ্ধি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যদিও লাউসেন ধর্মপ্রসাদ পুষ্ট হয়েই যুদ্ধে জয়লাভ করেছে বা ষড়যন্ত্রের জাল কেটে বেরিয়েছে, তবুও ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব অপেক্ষা মানবীয় লৌকিক দিকটিই সেখানে বেশি পরিস্ফুট। যুদ্ধে কর্ণসেনের পুত্রদের মৃত্যু, পুত্রবধূদের সহমরণ, রাণীর অসহ্য দুঃখে আত্মহত্যা কর্ণসেনের জীবনে যে বেদনা ঘনীভূত করেছে তার কোনও অলৌকিক সান্ত্বনা-প্রয়াস এখানে নেই—বরঞ্চ সুন্দরী যুবতী নারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দুঃখ-বেদনা ভোলাবার লৌকিক প্রয়াস মানবরসকে সমুজ্জ্বল করেছে। তাঁর ভাগ্য বিড়ম্বনা আমাদের সমবেদনার

বিষয়। তেমনই লাউসেনের বিরুদ্ধে মহামদের যাবতীয় কুটিল হীন চক্রান্ত মানবিক বিজিগীষা বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই কাব্যে লাউসেন এবং ইছাই ঘোষ ছাড়া আর সকল চরিত্র লৌকিক রসপুষ্ট হয়েই যার যা ভূমিকা অভিনয় করেছে। কলিঙ্গা, কানড়া, কালু ডোম, লখাই, মহামদ সকলেই মানবিক সবলতা-দুর্বলতা নিয়েই আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সহানুভূতি দাবি করেছে।

কাহিনী বয়নে এই কাব্যে যে বিচিত্র উপাদানের সমাবেশ ঘটেছে, মানবীয় বৃত্তির যে নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেছে, রাঢ় অঞ্চলের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, অন্ত্যজ শ্রেণীর নরনারীর সাহসিকতা, দেশাত্মবোধ পরিস্ফুট হয়েছে তা মহাকাব্যের যথার্থ উপাদান। উপযুক্ত কবির হাতে পড়লে ধর্মমঙ্গল রাঢ়ের মহাকাব্য বলে অভিহিত হতে পারত। কেবলমাত্র রচনা-সৌকর্যের অভাবে ধর্মমঙ্গল কাব্য মহাকাব্যের প্রান্তিক সীমায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবিগোষ্ঠী :

ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূরভট্ট। ময়ূরভট্টের কোনও পুঁথি পাওয়া যায় নি। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'হাকন্দপুরাণ'। এই তথ্যগুলো উল্লিখিত হয়েছে ঘনরাম চক্রবর্তী, মাণিকরাম গাঙ্গুলি, সীতারাম দাস ইত্যাদি কাব্য-রচয়িতাদের কাব্যে। তাঁরা সকলে নিজ নিজ কাব্যে ময়ূরভট্টের বন্দনা করেছেন। ময়ূরভট্টের কাব্যরচনাকাল মোটামুটি পঞ্চদশ শতাব্দী। মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাল সম্পর্কে বিশেষ কিছু সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কারো কারো মতে ইনি সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়ে থাকবেন। আবার অনেকে তাকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বলতে চান। এছাড়া আছেন খেলারাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী, রামদাস আদক ও ঘনরাম চক্রবর্তী। এই কবিগোষ্ঠীর মধ্যে রূপরাম এবং ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। সুতরাং আমরা এই কবিযুগলের কবিকৃতির পরিচয় নিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করব।

॥ রূপরাম চক্রবর্তী ॥

কবি পরিচয় :

রূপরাম চক্রবর্তীর পিতার নাম অভিরাম চক্রবর্তী। বর্ধমান জেলার দক্ষিণে কাইতি শ্রীরামপুর গ্রামে তাঁরা বাস করতেন। কবিরা তিন ভাই, দুই বোন। বড় ভাই রত্নেশ্বর যেন "জ্বলন্ত আগুন"। রূপরাম ছেলেবেলায় লেখা-

পড়ায় অমনোযোগী ছিলেন বলে রত্নেশ্বর তাঁকে তিরস্কার করেন। যাই হোক পিতার তত্ত্বাবধানে ব্যাকরণ, অভিধান পাঠ করেন। পরে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে লেখাপড়া শেখেন। ছাত্র হিসেবে তিনি মেধাবী ছিলেন, তাই প্রথম দিকে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ভালই ছিল। পরে শিষ্যের সঙ্গে তর্ক হওয়াতে গুরু তাঁকে বিদায় করে দিলেন। রূপরাম নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। যাওয়ার আগে মা'কে দেখবার ইচ্ছে হল, তাই বাড়ীতে এলেন, কিন্তু "জলন্ত আগুন" দাদাকে দেখে পথে বেরিয়ে পড়লেন। মায়ের সঙ্গে দেখা হল না। ইতোমধ্যে পথে পলাশবনের বিলের কাছে পথশ্রান্ত অবস্থায় দেখলেন, দুটি শঙ্খচিল উড়ছে বিষ্ণু-পদতলে। আবার কাছেই "দুটা বাঘ দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে"। এই দৃশ্য দেখে দৌড়ুতে গিয়ে গোটা দুই আছাড় খেলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশী ধর্ম এসে ধর্মের গীত বারমতি গাইতে বললেন। তারপর অনেক কষ্টেসৃষ্টে এড়াইল গ্রামে উপস্থিত হলেন। সেখানকার জমিদার ছিলেন গণেশ। ধর্মঠাকুর তাঁকেও স্বপ্নে রূপরামের কথা বলেছিলেন। গণেশ কবিকে আশ্রয় দিলেন। এঁরই আশ্রয়ে থেকে রূপরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যের রচনা কাল স্থিরীকৃত হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ডঃ সুকুমার সেন পুথির কালজ্ঞাপক পয়ার বিশ্লেষণ করে স্থির করেছেন যে কবি কাব্যরচনা করেছিলেন ১৬৫০ খ্রীঃ; যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির মতে ১৬৪১ খ্রীঃ। যাই হোক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ কাব্যরচনাকাল ধরলে কোনও মারাত্মক ভুল হবে না। ধর্মমঙ্গল রচনার জন্য তিনি জাতিচ্যুত হয়েছিলেন।

কাব্য পরিচয় :

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী লোকমুখে ছড়া-পাঁচালী-ব্রত কথার মতো ছড়িয়ে ছিল। এই অসম্বদ্ধ, বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে রূপরাম সংহত আখ্যান কাব্যের রূপে বেঁধে দিয়েছেন। দেব মাহাত্ম্য প্রচার করতে বসেও তিনি মানুষের কথা ভুলে যান নি। দেবতার মহত্ত্ব সংকুচিত না করেও তিনি মানুষের বীর্য, মহত্ত্বকে অভিব্যক্ত করেছেন। তাঁর রচনায় অলঙ্কার-পারিপাট্য নেই, কিন্তু সহজ স্বচ্ছন্দ বর্ণনার জন্য তা সুখপাঠ্য হয়েছে। বাৎসল্য রস সৃষ্টির সহজ ভঙ্গিমা বলিষ্ঠ কবি-প্রতিভার পরিচয় রয়েছে।

॥ ঘনরাম চক্রবর্তী ॥

কবি পরিচয় :

ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বর্ধমান জেলার দামোদর নদের তীরে কইয়ড় পরগণার কুকুড়া কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম। তাঁর পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতার নাম সীতা। কবিরা রামভক্ত ছিলেন। কাব্যের ভণিতায়, রামায়ণের কাহিনীর উল্লেখে, পুত্রদের নামকরণে রামভক্তির পরিচয় আছে। কবি তার গুরুর কাছ থেকে 'কবিরত্ন' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর কাব্যে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখে মনে হয়, তিনি কবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। ঘনরাম ১৭১১ খ্রীঃ কাব্য রচনা শেষ করেছিলেন।

কাব্য পরিচয় :

ঘনরাম হরিশ্চন্দ্র-লাউসেনের প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে পুরাণ-উপপুরাণের গল্প, উপমা যুক্ত করে রচনাকে মহাকাব্যোচিত বিশালতা দান করেছেন। তাঁর কাব্য চব্বিশটি পালায় বিভক্ত। লাউসেনের শক্তিমত্তার সঙ্গে চারিত্রিক দৃঢ়তা, নারীদের বীরত্বের সঙ্গে কোমলতা, প্রেমানুরাগ, ভক্তের ভক্তির ঐকান্তিকতা, মহামদের ক্রুরতা, নৈসর্গিক এবং অনৈসর্গিক ঘটনার সমন্বয়, স্পষ্ট ঘটনা-সংবেগ মহাকাব্যের উপযোগী। কিন্তু যে কবি-দৃষ্টির সমগ্রতায় সব বাস্তব অবাস্তব প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়ে গৌরব সমুন্নতি লাভ করে তার অভাবে ঘনরামের রচনা বহিরঙ্গে মহাকাব্যোপম হয়েও আন্তরধর্মে মহাকাব্যের সামীপ্য অর্জন করে নি। তবে ঘটনা বিন্যাসের কৃতিত্ব অবশ্যই রয়েছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীকে গ্রাম্যতা মুক্ত করে তিনি রসিক চিত্তের সহানুভূতি দাবি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ বীরাঙ্গনা চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর সার্থকতা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এক বিশেষ ব্যতিক্রম। কবির এই কৃতিত্ব অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই। নারীচরিত্রে কল্পনায় বীর্য ও লাবণ্যের সমন্বয় ধর্মমঙ্গল কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু চরিত্রে ঐ দুইটি ভাবের আনুপাতিক সামঞ্জস্যের সার্থক রূপায়ণ-কৃতিত্ব ঘনরামের।

ঘনরাম বিদগ্ধ ব্যক্তি। তার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ রয়েছে অলঙ্করণে। এই বৈদগ্ধ্য কাব্য কাহিনীকে সজীব করে তুলেছে, বহু স্বাভাবিক উক্তিকে প্রবচনের মহিমা দান করেছে। শব্দ-ধ্বনি সংঘাতে তিনি আকাঙ্ক্ষিত ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে লাউসেনের সঙ্গে লোহটা বজ্জরের যুদ্ধ বর্ণনা স্মরণ করা যেতে পারে।

আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, পুরাতনের অনুবৃত্তির যুগে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ পটভূমিতে থেকেও গতানুগতিক কাব্য কাহিনীকে ঘনরাম চিন্তার সংযমে বেঁধে রচনা সৌকর্যে, শালীনতা বোধে পরিসিক্ত করে ভদ্ররুচিসহ করেছেন। এইজন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এরপর সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ, হৃদয়রাম ইত্যাদি কবিকুল ধর্মমঙ্গল কাব্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। কোনও বিশেষ কবিকৃতিতে এঁরা স্মরণীয় নন। কাজেই তাঁদের আলোচনা অনাবশ্যক।

(ঘ) শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য

শিব একাধারে আর্য এবং অনার্য দেবতা। তবে তাঁর রূপ কল্পনায় পার্থক্য রয়েছে। আর্য শিব "নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখের রাত্রৌ" স্বরূপ আত্মস্থ, সমাহিত। যোগীশ্বর ছিলেন জ্ঞানীর দেবতা। পক্ষান্তরে অনার্য শিব হলেন কৃষির দেবতা। লৌকিক সবলতা-দুর্বলতায় মাখা চরিত্র। এই শিবও অলস ও উদাসীন অথচ লৌকিক সুখলোলুপ। আমরা লক্ষ্য করেছি শক্তি দেবতারা যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তখন শিব উপেক্ষিত। কেবলমাত্র হর-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবনের সম্বন্ধের যোগসূত্র রূপে মঙ্গলকাব্যে শিবের আবির্ভাব ঘটেছে। দেব পরিবারের কর্তারূপে শিবের যে স্থান নির্দেশিত হয়েছে তারই সূত্রে শিব-কাহিনী সংকলন করে মঙ্গলকাব্যের ধাঁচে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছিল। এতে কোনও নতুনত্ব নেই, কল্পনায় কোনও মৌলিকতা নেই, লৌকিক এবং পৌরাণিক উপাখ্যানের সংমিশ্রণে শিবের জীবন-কথা বিবৃত হয়েছে। মনে হয় শিব হৃতরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হলেন।

শঙ্কর কবিচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ রায় সপ্তদশ শতাব্দীতে এই শিবায়ন কাব্যের প্রণেতা। তবে রামেশ্বর ভট্টাচার্যই এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি বলে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকে তিনি কাব্য রচনা করেছেন বলে মনে হয়। যদিও তিনি দাবি করেছেন "ভব-ভাব্য, ভদ্র-কাব্য" রচনা করেছেন বলে, কিন্তু তাঁর রচনা ঐ দাবিকে সমর্থন করে না। ইচ্ছার সঙ্গে উপায়ের এই অসঙ্গতির কারণ কি? পৌরাণিক শিবের নিঃসঙ্গতা, আত্মস্থ চরিত্র মহিমা জনমানসের আগ্রহ লাভ করে নি। তাঁকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়েছে। পক্ষান্তরে লৌকিক শিবের চারিত্রিক স্খলন, আলস্য, সাংসারিক বোধশূন্যতা, বাস্তব হিসেব-নিকেশ চেতনা-হীন নির্বিকারত্ব জনমানসকে অধিকতর আকর্ষণ করেছে—তাঁকে আপনজন বলে

স্বীকার করেছে। ফলে তাঁর কাব্যে লৌকিক শিবের এমন অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটেছে। কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কৃষিভিত্তিক সমাজের বৃহত্তর জনজীবনের গতিছন্দের সঙ্গে সহজেই থাপ থাইয়ে নিয়েছেন।

মঙ্গলকাব্যধারার আলোচনা আমরা এইখানে শেষ করলাম। এই প্রসঙ্গে একটি কথা জানিয়ে রাখতে চাই। সেইটি হল এই, ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এই ধারার অন্তর্ভুক্ত হলেও স্বরূপে তা ভিন্ন। বরঞ্চ বলা যায় ভারতচন্দ্রে এসে মঙ্গলকাব্যের অন্তিম প্রহরই শুধু নয়, মধ্যযুগের অন্তিম প্রহর ঘোষিত হয়েছে। তাঁর মুখ অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। সেই কথা আমরা পরে আলোচনা করব। ভারতচন্দ্রের স্বরূপ স্বাতন্ত্র্যের জন্য তাকে এই গোষ্ঠীভুক্ত করি নি। কারণ মঙ্গলকাব্যের কাঠামোতে তিনি আধুনিক জীবন চর্চাই করেছেন।

অনুবাদ সাহিত্য

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য মূলতঃ ত্রিধারায় প্রবাহিত ছিল। গীতি কাব্য, আখ্যান কাব্য ও অনুবাদ কাব্য। গীতি কাব্যের ধারায় রয়েছে চর্যাপদ, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, বাউল গীতি ; আখ্যান কাব্যের ধারায় রয়েছে মঙ্গলকাব্য এবং অনুবাদ কাব্য হল রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত। অনুবাদ সাহিত্যেও গল্প বা আখ্যান আছে। কিন্তু যেহেতু এই কাব্যকাহিনী সংস্কৃত কাব্য থেকে বাংলায় অনূদিত হয়েছে সেইজন্য অনুবাদ কাব্য বলে সেগুলোকে অভিহিত করা হয়েছে।

সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমৃদ্ধ সাহিত্যের ভাবানুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ সূত্রে সাহিত্য প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে, বলিষ্ঠ প্রকাশ-কৌশল আয়ত্ত করে, নিজের মেজাজ-মর্জির আনুকূল্যেই অনুবাদের ভিতর দিয়ে সমৃদ্ধ সাহিত্য কর্মের ভাব ও আঙ্গিক আত্মসাৎ করে নিজে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। এর ফলে নতুন ধ্যান, ধারণা, ভাবনার দ্বারা জীবনদৃষ্টির পরিমার্জনা যেমন হয় তেমনই শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে ভাব প্রকাশের সহায়তা করে। মোটের উপর বলা যেতে পারে অনুবাদ কর্ম আত্মোন্নতির অন্যতম উপায়। বাংলা সাহিত্যও অনুবাদের সূত্র ধরে পরিমার্জিত হয়েছিল দুই ভাবে, প্রথমতঃ সে ভারতধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করেছে। অনুবাদ কর্মের আদি উৎসে রয়েছে বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদক কবি কৃত্তিবাস, তারপর পেয়েছি বেদব্যাসের মহাভারতের অনুবাদক কবি কাশীরাম দাস। এছাড়াও আরও অনেকে আছেন। আমরা বর্তমানে শ্রেষ্ঠ কবিযুগলের কবিকৃতির আলোচনা করব।

রামায়ণ

॥ কবি কৃত্তিবাস ॥

কবি পরিচয় :

রামায়ণ কাব্যে কৃত্তিবাস যে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন তার থেকে জানা যায়, কবির পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করতেন।

নরসিংহের প্রপৌত্র বনমালী। কৃত্তিবাস বনমালীর পুত্র। কৃত্তিবাসের মায়ের নাম মালিনী। কবিরা ছয় ভাই। প্রত্যেক ভাই "গুণশালী"। বিদ্যাশিক্ষার পর কৃত্তিবাস গৌড়ের রাজদরবারে গিয়েছিলেন। গৌড় ছিল তখনকার বাঙালী সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। গৌড়েশ্বর ছিলেন শিল্পানুরাগী গুণগ্রাহী ব্যক্তি। কৃত্তিবাস শ্লোক রচনা করে রাজাকে বন্দনা করেন। রাজা কৃত্তিবাসের কবিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ অর্থ পুরস্কৃত দিতে চাইলে কবি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বলেন—"কবিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ 'গৌরব'ই তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার, এর অতিরিক্ত বস্তু-পুরস্কার তুচ্ছ, ওতে তাঁর প্রয়োজন নেই।" এইবার কবির বক্তব্য উল্লেখ করি :

"কারো কিছু নাঞি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥"

"গৌরব মাত্র সার" তিনটি কথায় চিরকালের কবির মর্মবাণী ঝঙ্কৃত হয়েছে। আধুনিক কালের কবি রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" কবিতায় একই কথা কাব্যরূপ ধারণ করেছে। এর তুলনায় কাঞ্চন মূল্য তুচ্ছ—সৃষ্টির গৌরবে স্রষ্টার গরিমা।

কৃত্তিবাস তাঁর আত্ম বিবরণীতে বংশপরিচয়, রাজসভার বর্ণনা, জন্মকালের মাস, তিথি, বার উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেন নি কেবল জন্ম সন ও রাজার নাম। ফলে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। নানামতের জটিলতার মধ্যে না জড়িয়ে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩৯৯ খ্রীঃ। কৃত্তিবাস প্রাক্‌চৈতন্য কবি এবং রাজা গণেশের আমলে কাব্য-রচনা করেছেন।

কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণীর একটি বৈশিষ্ট্য চোখে না পড়ে পারে না। যে কালে কবিরা নিজেদের নাম স্পষ্ট করে উল্লেখ করতেন না, কৃত্তিবাস সেই কালে নিজের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন, কেবল সাধারণ ঐতিহ্যের বশবর্তী হয়ে পৃষ্ঠপোষক রাজার নামোল্লেখ করেন নি এবং সঠিক কাল নির্দেশ করেন নি। তবুও যেটুকুন উল্লেখ তিনি করেছেন তার থেকে এইটুকু বুঝতে পারি, কবি আত্মসচেতন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এবং এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের যোগে তাঁর কাব্য নিছক অনুবাদ না হয়ে—হয়েছে মৌলিক সৃষ্টি, বাঙালীর মানস ধাতুর অনুসারিতায় হয়েছে জনচিত্ত জয়ী।

কাব্য পরিচয় :

রামায়ণ ভারতবর্ষের আদি মহাকাব্য। বাল্মীকি এই মহাকাব্যের রচয়িতা। রামকথা সারা দেশের আনাচে-কানাচে, লোককথায়, আখ্যানে-উপাখ্যানে ছড়িয়ে

ছিল। কিন্তু এই কাহিনীগুলোর মধ্যে ভাব-সাযুজ্য ছিল না। বাল্মীকি এই বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলোকে সংহত করে মহাকাব্যের রূপ দিয়েছেন। রামায়ণে সমগ্র জাতির হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করা যায়। বাল্মীকির রামায়ণ সেই কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কবিকে প্রেরণা দিয়ে আসছে। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে "শ্রীরামপাঁচালী" কাব্য রচনা করেছেন। "শ্রীরাম-পাঁচালী" কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে এখন পরিচিতি। কৃত্তিবাসের রচনার অবিকৃত রূপ কি ছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারণ আজ আর সম্ভব নয়। কারণ কৃত্তিবাসের জনপ্রিয়তার ফলে কাব্যে বহুল প্রক্ষেপ ঘটেছে। কাব্যের প্রক্ষেপের দায়িত্ব যেমন গায়েনদের তেমনই লিপিকারদের। কাব্যকথা গান করবার সময় এবং নকল করবার সময়ে যে যার ইচ্ছেমতো পদ সংযোজন করেছেন, ভাষা, শব্দ অদল-বদল করেছেন।

কৃত্তিবাসের নামে যে রামায়ণ আজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছিয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি যে কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের ভাবানুবাদ বা আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। তিনি রামায়ণ কাহিনীকে বাংলাদেশের জলবায়ু ও বাঙালীর জীবনছন্দের অনুকূলে সাজিয়ে নিয়েছেন। ফলে লোকজীবনের সঙ্গে এমন একটা সহজ যোগ ঘটেছে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এক অর্থে বাঙালীর মহাকাব্য হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায় বাল্মীকি রামায়ণের মহাকাব্যিক বিশালতা, উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনি, গৌরব সমুন্নতি, চরিত্র চিত্রণে ভালোমন্দের সমবায়ে ভাস্কর্য, বলিষ্ঠতা কৃত্তিবাসের রামায়ণে নেই। বাল্মীকির রামচন্দ্র নরশ্রেষ্ঠ, বীর্যবান পুরুষ; রাবণ বলদর্পী, কামোন্মত্ত শক্তিমান পুরুষ। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভক্তবৎসল অবতার, প্রেমের ঠাকুর; রাবণ প্রচ্ছন্ন ভক্ত; সুগ্রীব-হনুমান শাখামৃগ হয়েও রামভক্ত; সীতা সর্বংসহা বাঙালী বধূ। ভক্তিরসের প্লাবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ অভিষিক্ত। বাঙালীর ভক্তিবাদ এবং শক্তিবাদ কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রকৃতি নির্ধারণ করে তার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করেছে। বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনাকে কৃত্তিবাস বড়ো করে দেখিয়েছেন, এই বিশেষ অর্থে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীর পারিবারিক জীবনের মহাকাব্য।

কৃত্তিবাসের পরেও বিভিন্ন কবি রামায়ণ রচনা করেছেন। তাঁদের রামায়ণে বাল্মীকির অনুসৃতি নামেমাত্র। এঁরা লোকশ্রুতি এবং অধ্যাত্ম রামায়ণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ নিজ মানস-প্রবণতা ও রুচি অনুযায়ী কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিত্যানন্দ আচার্যের "অদ্ভুত রামায়ণ"।

নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য নামে পরিচিত। দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রামায়ণ রচনা করেন। ইনি "মহিলা কৃত্তিবাস" নামে খ্যাত। ময়মনসিংহে তাঁর কাব্যের বিশেষ প্রচার এখনও রয়েছে। যবদ্বীপের রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। অদ্ভুতাচার্য এবং চন্দ্রাবতী উভয়েই ষোড়শ শতকের শেষে বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। একজন উত্তরবঙ্গের অপরজন ময়মনসিংহের অধিবাসী। রামানন্দ ঘোষ, রঘুনন্দন, হরেন্দ্রনারায়ণ, জগৎরাম ও তাঁর পুত্র রামপ্রসাদ রামায়ণ রচনা করেছেন। প্রতি কবির রামায়ণ কাহিনীতে বৈচিত্র্য রয়েছে, একের সঙ্গে অপরের কাহিনীর ঐক্য নেই। রামায়ণকারদের মধ্যে কৃত্তিবাসের কাব্যের সাহিত্যিক উৎকর্ষ অবিসংবাদিত এবং তাঁর প্রচার ও প্রভাব সর্বাধিক। অন্যান্য যাঁদের নাম করেছি তারা ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয়।

মহাভারত

মহাভারত ভারতবর্ষের দ্বিতীয় মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের রচয়িতা বেদব্যাস। বিষয় বৈচিত্র্যে, কলেবরে, বৃহত্তর সমাজ চিত্রে, জীবনের পরিপূরক বিভিন্ন নীতির মননশীল গূঢ় বিশ্লেষণে, দুর্জয় প্রাণশক্তিতে, প্রকাশের বলিষ্ঠতায় মহাভারতে সমগ্র ভারতচিত্র মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। মহাভারতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফল লাভের কথা কীর্তিত হয়েছে। এই মহাকাব্যের রসচর্চা বাংলাদেশে পাল রাজাদের আমল থেকে চলে আসছে। পালবংশের শেষ সম্রাট মদনপালদেবের পাটরাণী চিত্রমতির মহাভারত শ্রবণের কথা ডঃ সুকুমার সেন আমাদের জানিয়েছেন। অবশ্য তিনি সংস্কৃতেই কাব্য শ্রবণ করেছিলেন। মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সুরু হয়েছে ষোড়শ শতাব্দী থেকে। পাঠান সম্রাটদের লোকমুখে মহাভারত কাহিনী শুনে মহাভারতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল। তাদের উৎসাহ এবং আনুকূল্যে মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। মহাভারতের অনুবাদ করেছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, রামচন্দ্র খান, কবি অনিরুদ্ধ, কাশীরাম দাস, দ্বৈপায়ন দাস, নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি কবিবৃন্দ। এঁদের মধ্যে কাশীরাম দাস শ্রেষ্ঠ অনুবাদক।

মহাভারত এবং তুর্কী শাসক ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী কবি যুগল ঃ

বাংলার সম্রাট তখন হুসেন শাহ্। হুসেন শাহের সংস্কৃতি-প্রীতি ও বিদ্যোৎসাহিতা ইতিহাস খ্যাত। তাঁর অনুচরেরাও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে পরাগল খাঁ ও তার পুত্র ছুটি খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। হুসেন শাহের 'লস্কর' পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। তিনি মহাভারতের কাহিনী শুনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে একদিনে শুনে শেষ করা যায় এমনভাবে মহাভারত রচনা করতে বলেন। তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে মহাভারত রচনা করতে বলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচনা করলেন "পরাগলী মহাভারত" এবং শ্রীকর নন্দী "জৈমিনী মহাভারত" অবলম্বনে অশ্বমেধ পর্ব বিস্তৃতভাবে রচনা করলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত পরাগল খাঁর নির্দেশে লিখিত বলে "পরাগলী মহাভারত" বলেছি, কিন্তু এই কাব্যের কবিকৃত নাম "পাণ্ডব বিজয় পাঞ্চালিকা" সংক্ষেপে "পাণ্ডব বিজয়"।

মহাভারত যদিও ধর্মশাস্ত্র বলে কথিত, পরাগল এবং ছুটি খাঁও ছিলেন ধর্মপ্রাণ, তবুও ধর্মবোধ থেকে তাঁরা মহাভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কেননা, মহাভারত রাজবৃত্তের ইতিকথা। মহাভারতে রাজনৈতিক সংঘর্ষের তীব্রতা, রাজ্যজয়, কূটনীতি, রণকৌশল, ব্যূহনির্মাণ ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। ফলশ্রুতিতে বলা হয়েছে—"জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।" পাঠান শাসকেরা ছিলেন জিগীষু। মহাভারতে পরস্পর বিবদমান রাষ্ট্রচিত্রের সঙ্গে তাঁদের আমলের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার মিল ছিল। বিশেষ করে যখন দেখি মহাভারতে জ্ঞাতি বিরোধ চরমে উঠে সমগ্র ভারতবর্ষকে তাতে জড়িয়ে প্রীতিস্নিগ্ধ গৃহজীবনকে বিধ্বস্ত করেছে, এর ভিতরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাজপরিবারের বীর্যগাথা, রাজ্য ভাঙাগড়ার ইতিহাস। এই যুযুৎসার সঙ্গে পাঠান শাসকেরা নিজেদের জীবন-সামীপ্য অনুভব করেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ অশ্বমেধ পর্বে দেখা যায় ভারতের পূর্বাঞ্চল জয় করতে এসে গাণ্ডীবধন্বার গাণ্ডীব বারংবার হস্তচ্যুত হয়েছে অথচ পাঠান শাসকের বিজয়বাহিনীর দৃপ্ত পদক্ষেপের কাছে এই অঞ্চল সহজেই নতি স্বীকার করেছে। এই জন্যেও তাঁরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করতেন। তাই "দিনেকে" শ্রোতব্য 'পাণ্ডব বিজয়' কাহিনী আস্বাদনের মাধ্যমে পরাগল খাঁ এবং অশ্বমেধ পর্বের অস্ত্র ঝনাৎকারের

ভিতর দিয়ে ছুটি খাঁ মহাভারতের উত্তেজনামুখর মুহূর্তগুলোকে সংহতভাবে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দী মহাভারত অনুবাদ করে পৃষ্ঠপোষকদ্বয়ের রসাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেছেন।

॥ **কাশীরাম দাস** ॥

কবি পরিচয় :

কাশীরাম দাস মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক। কাশীরাম দাসের অনুবাদের সূত্রে মহাভারত রাজসভার গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালীর জীবন-সান্নিধ্য লাভ করেছে। এইখানে কাশীরামের কৃতিত্ব। কাশীরামের পিতার নাম কমলাকান্ত। কাশীরামেরা তিন ভাই—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম ও গদাধর। এঁরা তিনজনেই অল্পাধিক কবি-প্রতিভার অধিকারী। এঁদের বাসস্থান ছিল বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গী গ্রামে। জাতিতে এঁরা কায়স্থ, উপাধি 'দেব'। 'দাস' উপাধি তিন ভাই ব্যবহার করেছেন। ধর্মমতে এঁরা বৈষ্ণব ছিলেন। কাশীরাম স্পষ্টই বলেছেন, কৃষ্ণভক্তির বশে তিনি 'ভারত-পাঁচালী' রচনা করেছেন। কাশীরামের 'ভারত-পাঁচালী' এখন মহাভারত নামে খ্যাত। কাশীরাম সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৬০২—৩ খ্রীঃ বা ১৬০৪ -৫ খ্রীঃ) কাব্য রচনা করেছেন।

কাব্য পরিচয় :

কাশীদাসী মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে সমাপ্ত। কিন্তু অষ্টাদশ পর্ব কাশীদাসের রচনা কি-না তা নিয়ে সংশয় আছে। কাশীদাসের জনপ্রিয়তার ফলে তাঁর কাব্যে বহুল প্রক্ষেপ ঘটেছে। তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পূর্বাপর বহু কবির হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর কাব্যের আসল চেহারা চাপা পড়ে গেছে। তবে কবির নিজের উক্তি এবং কাব্যের পর্বভেদে উৎকর্ষভেদের বিচারে মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে কাশীদাস আদি পর্ব থেকে বিরাট পর্ব—এই চারটি পর্ব নিজে রচনা করেছেন। এই চারটি পর্বের ভাষার পরিচ্ছন্নতা, ক্লাসিক সংযম, অলঙ্করণ পরবর্তী পর্বগুলোর চাইতে উন্নত এবং ঐ চারটি পর্বের Style-এর সঙ্গে পরবর্তী পর্বগুলোর Style-এর প্রভেদ এত স্পষ্ট যে অনুমান করতে বাধা নেই যে, পরবর্তী পর্বগুলো অপরের রচনা। এই কারণে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—"অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব হইতেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কবির রচনাপ্রবাহ মিলিত হইয়া কাশীরামের নামিত 'ভারত-পাঁচালী'তে পরিণত

হইয়াছিল। কাশীরামের কাব্য বলিতে আমরা কাশীরাম-গোষ্ঠীর এই সংহিতাই বুঝি।"

কাশীরাম বেদব্যাস এবং জৈমিনী মহাভারত থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে কাব্য রচনা করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে অনুবাদে মূলের প্রতি আনুগত্য থাকলেও তিনি মহাভারতের চরিত্রাবলীকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। বৈষ্ণবীয় ভাব-ধারায় অভিষিক্ত হয়ে চরিত্রাবলী আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, মূল মহাকাব্যের বীর্যগাথা প্রেমগাথায় রূপান্তরিত হয়েছে। মহাভারতে বাঙালিত্বের আরোপ কাব্যটিকে রাজবৃত্তের সঙ্কীর্ণতা ভেঙে আপামর জনসাধারণের জীবন-বেদীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রামায়ণ বনাম মহাভারত ঃ

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম উভয়েই মূল মহাকাব্যযুগলের বিষয়বস্তুকে জাতি ও যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অনুবাদ করেছেন। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র ভক্তিব্যাকুল বাঙালীর কাছে ঈশ্বরের ভাব বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। মূল রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রাবলীর বলিষ্ঠতা এইখানে নেই। কপি সমাজ ও রাক্ষস সমাজ মূলতঃ রামভক্ত, কেউ প্রত্যক্ষ, কেউ প্রচ্ছন্নভাবে রামচন্দ্রকে ভক্তি নিবেদন করেছেন। রাবণের দুষ্প্রধর্ষ বলিষ্ঠতা পর্যন্ত এইখানে ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত হয়ে কোমল হয়ে পড়েছে। রণক্ষেত্রের তাণ্ডব-ঝঙ্কার খোল-করতালের ভাবোন্মাদনার তলে চাপা পড়ে গেছে। যুদ্ধ বর্ণনায় উন্নততর কৌশল যদিও রাক্ষস-সমাজের তরফে দেখা যায় কিন্তু প্রতিপক্ষের গাছ-পাথর নিক্ষেপ, আঁচড়-কামড় কিছুটা বেমানান বলেই মনে হয়। কাহিনী বিন্যাসে জটিলতা নেই, একমুখীন রস পরিণতিতে কাহিনী চরিতার্থতা লাভ করেছে। এইটে করুণ রস। কাব্যের উৎপত্তি যেমন বিরহ-ব্যথাক্লিষ্ট করুণ বিলাপে; আগাগোড়া কাব্য তেমনই রামচন্দ্রের হৃদয়দ্রাবী করুণ ক্রন্দনে পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। আমাদের পারিবারিক জীবনের ছোট-খাট সুখ-দুঃখকে বড় করে দেখিয়েছেন কবি কৃত্তিবাস।

পক্ষান্তরে মহাভারত বহিরঙ্গচারী বিরাট জীবনের কাব্য। এখানে ধর্ম-পরায়ণতা এবং মানবিক বৃত্তিসমূহের জটিল সংমিশ্রণে বস্তুনিষ্ঠতা অভিব্যক্ত। মহাভারতে রাজনীতি, ধর্ম, সমাজনীতি, অর্থনীতি এমনভাবে জটিল বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে একক অপর থেকে পৃথক করা যায় না। এখানকার সব কার্যকলাপ মানবীয় বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে মহাভারতের আবেদন বহুদূর সম্প্রসারিত। বিদেশী শাসকদের মহাভারতের প্রতি বিশেষ অনুরাগ তার

প্রমাণ। মহাভারতে পরিবারের স্থান গৌণ—রাষ্ট্রই প্রধান। মহাভারতে ভক্তি, নীতি সবই আছে কিন্তু এই সবকে ছাপিয়ে আছে প্রচণ্ড জীবন পিপাসা। নির্বেদে কাব্যের শেষ পরিণতি। কিন্তু তা একমুখীন নয়। জীবনের বিচিত্র সংঘাত জটিলতা, ক্রুর হিংসা, ক্ষমা, মহত্ত্ব, নীচতা ইত্যাদির জটিল অনুবর্তনের ভিতর দিয়ে, নানামুখী রসাবর্তনের ভিতর দিয়ে কাব্য শেষ পরিণতিতে সিদ্ধিলাভ করেছে। ফলে মহাভারত বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি রূপে সার্বভৌমিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আধুনিক জটিল জীবনে মহাভারতের আবেদন যতটা গভীর রামায়ণের ততটা নয়। কারণ আধুনিক জটিল মনন সমৃদ্ধ জীবনবিন্যাস মহাভারতের জীবনধারার সঙ্গে সঙ্গতিবিধায়ক।

কৃত্তিবাস বনাম কাশীরাম:

কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মধ্যে কাল ব্যবধান দুশো বছরের। এই দীর্ঘকালে জীবনধারার বহুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। কাশীরামের কালে এসে জীবন বিন্যাসের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, জীবন বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে। মূলতঃ জীবনধারার এই পরিবর্তন মূল মহাকাব্যেও দেখা যায়। ফলে কৃত্তিবাসের কালের ভক্তিভাবের অসপত্ন আধিপত্য সপ্তদশ শতাব্দীতে খণ্ডিত হয়েছে। এইজন্য একমুখীন রসের উদ্দীপনে কৃত্তিবাসের কবিত্বের প্রকাশ ঘটেছে, অপরপক্ষে বিচিত্র রসের উদ্দীপনে কাশীরাম অদ্বিতীয়। রচনারীতিতেও দেখা যাবে কৃত্তিবাস প্রথাবদ্ধতা ভাঙতে পারেন নি, কাশীরাম প্রথাবদ্ধতার ভিতরেও মৌলকতার চমক সৃষ্টি করেছেন। কৃত্তিবাসে ধর্মের সর্বগ্রাসী প্রভাব কাশীরামে সংকুচিত হয়েও ধর্মশাসিত জীবনানুরাগকে ব্যঞ্জিত করেছে। এই পার্থক্য বাঙালীর অগ্রগতির স্মারক চিহ্ন বলে গৃহীত হতে পারে।

মোটের উপর এই কথা বলা যেতে পারে যে, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম বাঙালীর জীবনদৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এই নিয়ন্ত্রিত জীবন-দৃষ্টি আজ পর্যন্ত কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও প্রচ্ছন্নভাবে বাঙালীকে পরিচালিত করে চলেছে। এইখানে এই কবিযুগলের কালাতীত মহিমা।

ভাগবত

বেদ-বেদান্তে ধর্মের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব, অনুভূতির কথা বিধৃত হয়েছে তা বৃহত্তর লোকজীবনের অনধিগম্য। ধর্মতত্ত্ব ও অনুভূতিকে লোকজীবনে ছড়িয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে লোকজীবনের অনুসারিতায় তাকে ঝঙ্কৃত করেছেন রামায়ণকার-মহাভারতকার-পুরাণকারেরা। পুরাণ একাধারে কাব্য, ইতিহাস ও দর্শন। বাংলাদেশে পুরাণ চর্চা খ্রীঃ চতুর্থ শতকের আগে থেকে চলে আসছে। বাংলাদেশের সমাজজীবন পুরাণাশ্রয়ী। বাঙালীর জীবনকে পুরাণ নানাভাবে পরিপুষ্ট করেছে। অবশ্য এই পরিপুষ্টির উপাদান সংগৃহীত হয়েছে পুরাণ গ্রন্থের অনুবাদ সূত্রে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে ভাগবত পুরাণের কথা। এইটেও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে, বাঙালীর জীবনে পৌরাণিক চেতনার প্রভাব হুবহু সংস্কৃত পুরাণজাত নয়—সংস্কৃত পুরাণকে বাঙালী নিজ লোককথার সঙ্গে সমীকরণ করে, নিজস্ব জীবনরুচির অনুকূলে গ্রহণ করেছে। বৈষ্ণব ধর্মের সর্বব্যাপী প্রসারের কালে, বিশেষ করে চৈতন্য-লীলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী ভাগবতের কৃষ্ণ-লীলার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, লীলাতত্ত্বের সমর্থন খুঁজে পেয়েছে, কৃষ্ণপ্রেম-লীলার মধ্যে চৈতন্য-লীলার প্রত্যক্ষ রূপের ভাবরূপ অনুভব করেছে। বৈষ্ণব ধর্মে রাধাবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অথচ ভাগবতে কোথাও রাধা নামের উল্লেখ নেই। ভাগবতে কৃষ্ণৈক-প্রাণা অনাম্নী গোপীর উল্লেখ আছে। বাংলার লোক-কথায় রাধার উল্লেখ বহু প্রাচীনকাল থেকে (গাথা সপ্তশতী) আছে। ঐ লৌকিক রাধা ভাগবত উল্লিখিত অনাম্নী গোপীর সাথে এক হয়ে গেছেন। চৈতন্য-প্রভাবের ফলে তাঁর পৌরাণিক মর্যাদায় উন্নয়ন ঘটে এবং সার্বজনীন প্রতিষ্ঠাও ঘটে। বৈষ্ণব-সাধক মনে করেন রাধাপ্রেমের স্বরূপ প্রকাশের উদ্দেশ্যে চৈতন্যের আবির্ভাব এবং তাঁর অলৌকিক লীলার তাৎপর্য ঐখানে। কাজেই চৈতন্য-লীলায় পৌরাণিক মহিমার এবং লোকচেতনা-সংস্কৃতির সমন্বয়ী-করণ এবং বাঙালী-সংস্কৃতির রূপান্তর চৈতন্য ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভাগবতের অনুবাদ তারই সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। ভাগবতের অনুবাদের ফলে কৃষ্ণ-লীলার ব্যাপক পরিচয়ের সূত্র ধরে পদাবলীর রসাস্বাদন যেমন পরিমার্জিত হয়েছে, পৌরাণিক চেতনার বিস্তার ঘটেছে, তেমনই বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, বৈষ্ণব ধর্ম ভাববিহ্বলতার তত্ত্ব-সমর্থন খুঁজে পেয়েছে। ভাগবত অনুবাদের সার্থকতা এইখানে।

॥ ভাগবতের অনুবাদকবৃন্দ ॥

মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণ বিজয় :

মালাধর বসু ভাগবতের প্রথম অনুবাদক। তাঁর কাব্যের নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"। কাব্য রচনাকাল ১৪৮০ খ্রীঃ। ইনি প্রাক্‌চৈতন্য কবি। ভাগবতের ১০ম এবং ১১শ স্কন্ধ অবলম্বন করে তার ভাবানুবাদ করেছেন। তিনি কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই সঙ্গে কৃষ্ণের মধুর রূপের প্রকাশও ঘটেছে। রাধা-ভাবে ভাবিত হয়ে লিখিত পদের সন্ধানও তাঁর কাব্যে রয়েছে। রাধা-ভাবে ভাবিত পদের সঙ্গে চৈতন্য অনুভূতির সামীপ্যর ফলে এবং মহাপ্রভুর আস্বাদনীয় হয়ে মালাধরের কাব্য বৈষ্ণবদের কাছে বিশিষ্ট তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মতো তিনিও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রত্যুদ্গমনের শঙ্খধ্বনি করেছেন। কেবল তফাত এই যে, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসে যা লিরিক নির্যাস, মালাধরের কাব্যে তাই কাহিনী-কাব্যে পাত্রান্তরিত হয়েছে এবং তাত্ত্বিক সমর্থনপুষ্ট হয়েছে। তবে বতমানে মালাধরের গ্রন্থ যেভাবে আমাদের হাতে এসেছে তাতে মনে হয় গ্রন্থে বহুল প্রক্ষেপ ঘটেছে।

মালাধরের পরবর্তীকালের অনুবাদকেরা সকলেই চৈতন্যোত্তর কালের কবি। এঁদের মধ্যে অনেকেই চৈতন্য-লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন। চৈতন্য-লীলার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা ভাগবতের কৃষ্ণ-লীলা আস্বাদন করেছেন। আমাদের মনে হয় বাস্তবে গৌরাঙ্গের ভাবতন্ময় দিব্য-লীলা-রস আস্বাদনের পর ভাগবতে বিবৃত কৃষ্ণ-লীলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব তাঁরা করেন নি এবং না করাটাই স্বাভাবিক, কারণ ভাবরূপ বাস্তবে কায়া ধারণ করেছিল। বরঞ্চ তাঁরা ভাগবতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন লীলার তাত্ত্বিক সমর্থন খুঁজে পাওয়ার জন্য। ফলে তাঁদের অনুবাদে রাধাবাদের প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ভাগবত থেকে তার অধ্যাত্ম-তত্ত্বের সমর্থনে মূল কাব্যের তত্ত্বকথাকে ভাষান্তরিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ফলে ভাষার শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে, দুরূহ মনন, তত্ত্বকে ধারণ করবার যোগ্যতায় ভাষার সমৃদ্ধি ঘটেছে।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য এবং মাধুর্যের যুগপৎ সমন্বয় ঘটেছে। অনুবাদ কাব্যেও শ্রীকৃষ্ণের দ্বৈত-সত্তার পরিচয় আছে, তবুও গুরুত্ব বেশি পড়েছে মাধুর্যের উপরে। অনুবাদ করবার সময় কবিরা স্বাধীন কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন।

চৈতন্যোত্তর কালের ভাগবত অনুবাদ করেছেন রঘুনাথ ভাগবতাচার্য। তাঁর কাব্য হল "কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী"। শ্রীচৈতন্য তাঁর ভাগবত পাঠ শুনে তাকে 'ভাগবতাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করেন। দ্বিজ মাধবের "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল", দুঃখী শ্যামাদাসের "গোবিন্দমঙ্গল" ইত্যাদি কবিদের ভাগবত অনুবাদ বাংলা কাব্যকে পরিপুষ্ট করেছে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য, ভাগবত-কথা রামায়ণ-মহাভারতের মতো জাতির অস্থিমজ্জাগত জীবন-সংস্কারে পরিণতি লাভ করে নি। কারণ বোধকরি এই যে, রসসৃষ্টি হিসেবে বৈষ্ণব পদাবলী ভাগবতকে কোণঠাসা করেছে, দ্বিতীয়তঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কান্তাপ্রেম সহজ স্বীকৃতি পায় নি। তাই বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষীয়মান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাগবত-কথাও দূরে সরে গেছে।

● পঞ্চম অধ্যায় ●

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও বাংলা সাহিত্য

চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি শ্রীহট্ট। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীহট্টে ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের জন্য জোর-জুলুম সুরু হলে চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট ছেড়ে নবদ্বীপে চলে আসেন। নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয়। চৈতন্যদেব হলেন জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর দ্বিতীয় পুত্র। চৈতন্যের পিতৃদত্ত পোষাকী নাম বিশ্বম্ভর। বাল্যকালে তাঁকে সকলে নিমাই বলে ডাকত। দীক্ষান্তে কেশব ভারতী তাঁর নামকরণ করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বর্তমানে তিনি শ্রীচৈতন্য নামে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত। জগন্নাথের বড় ছেলে বিশ্বরূপ লেখাপড়া শিখে তত্ত্বজ্ঞ হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্য জগন্নাথ চৈতন্যদেবকে লেখাপড়া শেখাতে চান নি, পাছে তিনি বিশ্বরূপের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। শেষ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে এবং লেখাপড়া শিখবার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে বাধ্য হয়ে গঙ্গাদাস ভট্টাচার্যের টোলে ভর্তি করে দিলেন। চৈতন্যদেব দুরন্ত ছিলেন ঠিকই, তাঁর দৌরাত্ম্যের জন্য শচীদেবীকে প্রতিদিন নালিশ শুনতে হত ঠিকই, কিন্তু তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী। এত দুরন্তপনা সত্ত্বেও অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি ইত্যাদিতে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। তাঁর পাঠ্যাবস্থাতে পিতা লোকান্তরিত হলেন। চৈতন্যদেব এইবার টোল খুলে অধ্যাপনা সুরু করলেন। অল্পকালের মধ্যে নিমাই পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাস্ত করবার পর তাঁর যশ তুঙ্গ স্পর্শ করল। কিন্তু তাঁর ভিতরে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল বৈরাগ্য-প্রবণতা। তাঁর রচিত ন্যায়-শাস্ত্রের টীকা রঘুনাথ শিরোমণি রচিত টীকার চাইতে ভালো হওয়াতে রঘুনাথ ব্যথিত হয়েছিলেন। বন্ধুবৎসল চৈতন্য বন্ধুর যশ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য নিজের টীকা গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "মানুষ সব কিছু ত্যাগ করতে পারে,—ত্যাগ করতে পারে না যশাকাঙ্ক্ষা। এ বড় কঠিন কাজ।" চৈতন্যদেবের কাছে ঐ ত্যাগ সহজাত। তাঁর ভাবী-জীবনের বৈরাগ্যের ইঙ্গিত এখানে রয়েছে। টোলে অধ্যাপনা করবার কালে ষোল-সতের বছর

বয়সে তিনি বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর প্রতি আকৃষ্ট হন। লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবী মারা গেলেন। ফলে চৈতন্যদেব মর্মাহত হলেন। কিন্তু দুঃখ-শোক তাঁর কৌতুক-প্রিয়তাকে ক্ষুন্ন করতে পারে নি। কিছুকাল পরে চৈতন্যদেব রাজপণ্ডিত সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করেন। এরপর গয়াতে পিতৃতর্পণ করতে গিয়ে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাৎকার তাঁর জীবনের মোড় পরিবর্তন ঘটালো। ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। এর আগে নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল এবং সেই সময় তাঁর মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়েছিল। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে তিনি ঈশ্বরপুরীর কাছে গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন। এইবার চৈতন্যর পণ্ডিতী-জীবনে ছেদ পড়ল। তিনি নবদ্বীপে ফিরে এলেন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা মাথায় উঠল, কৃষ্ণপ্রেম বিভোর চৈতন্য নামগানে ডুবে থাকলেন। এর কিছুকাল পর কেশব ভারত র কাছে সন্ন্যাসে দীক্ষা নিলেন। কেশব ভারতী তাঁর নতুন নামকরণ করলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"।

শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাসে দীক্ষা নিয়েছেন ১৫১০ খ্রীঃ, চব্বিশ বছর বয়সে। এইবার সুরু হল তাঁর যতি-জীবন। সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পর চৈতন্য পুরীতে বাস করতেন। পুরীতে অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমকে তর্ক-বিতর্কের পর ভক্তি-ধর্মে দীক্ষিত করেন। পরিব্রাজকরূপে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে, সর্বত্র হরিনাম প্রচার করে, বহু "পাষণ্ডী"কে উদ্ধার করেন। এরমধ্যে সম্ভবতঃ ১৫১৩ খ্রীঃ শচীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং হুসেন শাহের কর্মচারী দবির খাস ও সাকর মল্লিককে প্রেম-ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁদের নামকরণ করেন রূপ ও সনাতন। ১৫১৫ খ্রীঃ চৈতন্যদেব নীলাচলে চলে আসেন এবং বাকি জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। এই সময়কাল ব্যবহারিক দিক থেকে ঘটনাবহুল নয়। দিব্য-ভাবের প্রকাশে, প্রেম-ভক্তির চরমতম অভিব্যক্তিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় তিনি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদ আস্বাদনে তৃপ্তি লাভ করতেন। রাধাপ্রেমের ভাবরূপকে বাস্তবায়িত করে ১৫৩৩ খ্রীঃ শ্রীচৈতন্য দেহরক্ষা করেন। চৈতন্য-দেবের তিরোধান বিষয়ে বিভিন্ন কিম্বদন্তীর চালু আছে। কারও মতে তিনি জগন্নাথের দেহে লীন হয়ে গিয়েছিলেন, কারও মতে কৃষ্ণভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। পুরীতে এমন জনশ্রুতিও আছে যে, সেখানকার ঈর্ষাতুর পাণ্ডারা চৈতন্যকে মন্দিরের মধ্যে হত্যা করে সেখানেই সমাহিত করে রটিয়ে

দেয় যে তিনি জগন্নাথের দেহে লীন হয়ে গেছেন। এইটে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না, কারণ পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যভক্ত ছিলেন, বহু সম্ভ্রান্ত ওড়িয়াও তাঁর ভক্ত ছিলেন। এহেন অবস্থায় পাণ্ডারা তাঁকে হত্যা করতে সাহস পেয়েছিল বলে মনে হয় না। জয়ানন্দ 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে বলেছেন, "পথে হরি-সংকীর্তন করবার সময় ইঁটের কুচি লেগে তাঁর পা কেটে গিয়েছিল এবং তাই বিষাক্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়াছে।" এইটে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এইটে স্বীকার করলে চৈতন্যের অবতারত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না আবার স্বাভাবিকত্বেরও ব্যত্যয় ঘটে না।

সমাজ ও সাহিত্যে চৈতন্য প্রভাব ঃ

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভারতবর্ষের পক্ষে যুগান্তকারী ঘটনা। শ্রীচৈতন্যের যতি-জীবন, প্রেমদৃষ্টি জাতির মর্মমূল ধরে নাড়া দিয়েছিল। ফলে সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে ভাববিপ্লব ঘটেছিল। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে মধ্যযুগীয় চৈতন্য রেনেসাঁসের রেখায় রেখায় মিল নেই বলে অনেকে চৈতন্য রেনেসাঁসকে স্বীকৃতি দিতে চান না। স্বীকৃতি না দেওয়াটা যতখানি কণ্ঠশক্তি নিয়ন্ত্রিত ততটা যুক্তি-নিষ্ঠ নয়। ইতিহাসের গতি সব দেশে একই ধারার অনুবর্তন করে না। দেশ ও সমাজভেদে, জীবন-দৃষ্টিভেদে রূপভেদ সৃষ্টি হয়। গতির মৌলিক তাত্ত্বিক ঐক্য থাকলেও রূপভেদের বিশিষ্টতায় তা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে। আমাদের দেশ সমাজ-নির্ভর এবং এই সমাজ ধর্ম-নির্ভর। কাজেই রেনেসাঁস ঐ মৌলিক ভিত্তিভূমির উপর হয়েছে। এবং ঐ বিশিষ্ট পটভূমিকায় রেনেসাঁসের চরিত্র বিচার করতে হবে।

উপর্যুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে তুর্কী আক্রমণোত্তর কালে নিজের ধর্ম, সমাজ, আচার রক্ষার জন্য হিন্দু তার চারপাশের বিধি-বিধানকে আরও মজবুত করেছিল এবং ঐ বিধি-বিধানকে লঙ্ঘনের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছিল। হিন্দুধর্মে ঋতর চেয়ে রীতির প্রাধান্যের ফলে সঙ্কীর্ণতা এসে গিয়েছিল। স্বভাবতঃই অন্ত্যজ সম্প্রদায় উপেক্ষিত হয়েছিল। পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের আপেক্ষিক উদারতা, ধর্মান্তরিত হলে কিছুটা নিরাপত্তাবোধ, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ লাভ ইত্যাদির জন্য ইসলামের ধর্মীয় বিজয় সহজসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এহেন সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব এবং প্রেমধর্মের কূলপ্লাবনী শক্তি হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণ বেষ্টনীকে ভেঙে ফেলে দিল। আদ্বিজ-চণ্ডাল আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় সমান মূল্য পেল। মানুষের অন্তর্গূঢ়

দৈবীসত্তার নিরিখে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, হিন্দু-মুসলমান, রাজা-প্রজার সমমূল্যায়নের ফলে হিন্দুধর্ম জাতিগত ভাবে ইসলাম বিজয়ের গ্রাস থেকে রক্ষা পেল। চৈতন্যদেবের প্রভাবে এবং রূপ, সনাতন, রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ইত্যাদির আবির্ভাবে জাতিগত ভাবে বাঙালী নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। চৈতন্যদেবের ভারতভ্রমণের সূত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে সারা ভারতের ভাবগত যোগ গড়ে উঠল। বাঙালী সাম্প্রদায়িক চেতনার বলয়রেখা বিদীর্ণ করে দ্বিজত্ব লাভ করল। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলে রাখা ভাল, সেইটি হল এই যে, আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় মানুষের পরমমূল্য নির্ধারিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই মানব-স্বীকৃতি আধুনিক Humanism নয়। কারণ আধুনিক কালের মতো রক্তমাংসের বিক্ষোভে বিক্ষুব্ধ, পাপে-পুণ্যে আন্দোলিত, সবলতা-দুর্বলতা মাখা ইন্দ্রিয়বোধ সাপেক্ষ ব্যক্তি মানুষ তখনও স্বীকৃতি পায় নি। বরঞ্চ সূক্ষ্মবোধ সাপেক্ষ মানবীয় সত্তার প্রতি তথা তার অন্তর্নিহিত ভগবত্তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হয়েছিল। একে বলা যেতে পারে Divinism বা দেববাদ নির্ভর মানবতাবোধ। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দেববাদ থেকে দেববাদ-নির্ভর মানবতাবোধ পেরিয়ে পরিচ্ছিন্ন আধুনিক মানবতাবোধে তার উত্তরণ ঘটেছে।

চৈতন্যদেবের দিব্য জীবনের অনুপ্রেরণায় আমাদের মনন, দর্শন, ধ্যানের, ধর্মবোধের উর্ধায়ণ যেমন ঘটেছিল তেমনই বাস্তব-চেতনা ও ইতিহাসবোধ উদ্দীপ্ত হয়েছিল। প্রথমটির স্বাক্ষর পড়েছে বৈষ্ণব দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে। চৈতন্যদেব যে ভাবের জোয়ার এনেছিলেন তাকে ধরে রাখবার জন্য প্রয়োজন ছিল বাঁধ দেওয়ার। বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামী দর্শনশাস্ত্র রচনা করে ঐ ভাবকে দার্শনিক প্রত্যয়ের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করেছেন। কাম ও প্রেমের সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করে প্রেমের যথার্থ স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কাছে চৈতন্যদেব বহিরঙ্গে রাধা, অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। রাধা-প্রেমের গভীরতা, নিষ্কলুষতা জনচিত্তগোচর করবার জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব আপন জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে প্রেমভক্তিরসে বাংলাদেশের আকাশ বাতাসকে আর্দ্র করে তুলেছিলেন, তারই প্রেরণা কবি-কণ্ঠে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিল, বৈষ্ণব পদাবলী তার নিদর্শন। মানুষের সঙ্গে দেবতার ব্যবধান ঘুচে গেল, দেব-মানবের সম্পর্কের ভিতরকার দীনভাব মুছে গেল, প্রিয় এবং দেবতা একাত্মিক মিলনে ধরা দিল। রাধাভাবের কোমলতার ছাপ পড়ল শক্তিময়ী দেবতার উপর, ফলে দেবী চণ্ড মূর্তি ছেড়ে বরদা মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। নৈতিক

মানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের রুচি পরিবর্তন দেখা গেল, রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক পদের ক্লিন্নতা কেটে গিয়ে অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত হয়ে নবতর তাৎপর্য-মণ্ডিত হয়ে উঠল। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার মানবিকতা ধর্মীয় গণ্ডি ভেঙে শাশ্বত প্রেম-সাধনার প্রতীক হিসাবে মুসলমান কবিকণ্ঠে সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করল। বৈষ্ণব কাব্যের সর্বগ্রাসী প্রভাব আধুনিক কালে কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক কবিদের ভাবের দিক থেকে অনুপ্রাণিত করেছে, তেমনই 'মরমে'র কথা প্রকাশের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও বা প্রচ্ছন্ন ভাবে অনুস্যূত হয়ে আছে।

বাস্তববোধ ও ইতিহাস-চেতনার স্বাক্ষর রয়েছে চৈতন্যজীবনী কাব্য রচনার প্রয়াসের মধ্যে। এতদুদ্দেশ্যে জীবনীকারদের তথ্যানুসন্ধান ঐতিহাসিকবোধের পরিচায়ক, তেমনই ভৌম-চেতনার পরিচায়ক চৈতন্যদেবের তীর্থ পরিক্রমার ভৌগোলিক diary সংগ্রহের প্রচেষ্টার মধ্যে। কিন্তু গ্রন্থ রচনার কালে ভক্তি-বিহ্বলতা, বস্তুনিষ্ঠা ও ইতিহাসবোধকে আচ্ছন্ন করায় বস্তুচেতনা মাঝপথে খণ্ডিত হয়েছে। এইজন্য অনেকেই এইটিকে বস্তুচেতনা বলে স্বীকার করবেন না। কিন্তু মনে রাখা দরকার বাঙালী চরিত্রে ভাবের প্রাধান্য বেশি। মধ্যযুগ কেন, আধুনিক যুগে এসেও আমরা য়ুরোপীয় অর্থে বস্তুনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারি নি।

মোটের উপর বলা যেতে পারে যে চৈতন্য আবির্ভাব সামগ্রিক ভাবে বাঙালীর জীবন দৃষ্টিকে উদ্দীপ্ত করেছিল, বাঙালীকে নবজন্ম দান করেছিল। তার সার্বিক প্রভাব আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত। কাজেই চৈতন্য আবির্ভাব মধ্যযুগের রেনেসাঁস বলে অভিহিত হতে পারে।

চৈতন্যজীবনী কাব্য

জীবনচরিত বা জীবনীকাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। প্রাচীন যুগেই জীবনচরিত রচনার রেওয়াজ ছিল। এই প্রসঙ্গে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত নামে দ্ব্যর্থবোধক কাব্য স্মরণীয়। তবে এই সকল রচনা অত্যর্থদুষ্ট। জীবনীকার রাজচ্ছত্রছায়াতলে বসে রাজার গুণগান করেছেন, রাজার মনোরঞ্জনের জন্য বা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদনের জন্য রাজকীর্তিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছেন। চৈতন্যজীবনী কাব্য তাই অভূতপূর্ব হলেও অচিন্ত্যপূর্ব নয়। চৈতন্যজীবনীও

আধুনিক অর্থে জীবনচরিত নয়। কারণ এইগুলো নির্মোহ দৃষ্টিতে জীবনের বাস্তব ঘটনার এবং তার তাৎপর্য নির্ণয় প্রয়াসের বিবৃতি নয়। বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাবলীর বর্ণনাও নয়। চৈতন্যজীবনীকারেরা ভাবদৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যকে দেখেছেন। চৈতন্যদেব তাঁদের কাছে অবতার স্বরূপ ছিলেন। তাঁরা তাঁকে ভক্তের দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, তাঁর অধ্যাত্মজীবন তাঁদের কাছে অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। তাই চৈতন্যজীবনীকারেরা জীবনীকাব্য রচনার নামান্তরে ভক্তহৃদয়ের উপচার নিবেদন করেছেন। কাজেই চৈতন্যজীবনী কাব্যে স্বাভাবিক ভাবেই অলৌকিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এরজন্য খুঁতখুঁত করে লাভ নেই—বরঞ্চ জীবনচরিত না বলে সন্তচরিত হিসেবে এই কাব্যগ্রন্থগুলোর আস্বাদন বিধেয়। আধুনিক বস্তু-কারবারী যুগে এসেও এই ধরণের রচনার ধারা শুকিয়ে যায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনগাথা বা ত্রৈলঙ্গ স্বামী, কাঠিয়াবাবা, বামাক্ষ্যাপা ইত্যাদি সাধকদের জীবনগাথা স্মরণ করা যেতে পারে। পার্থক্য রয়েছে কেবল আঙ্গিকে। চৈতন্যজীবনী কাব্য কাব্যছন্দকে শিরোধার্য করেছে, আধুনিক কালে তা গদ্যে বিবৃত হয়েছে, তা-ও ক্ষেত্র বিশেষে গদ্য কাব্যের প্রতিস্পর্ধী হয়েছে।

চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) সংস্কৃতে রচিত। সংস্কৃতে রচিত স্মরণীয় গ্রন্থগুলো হল মুরারি গুপ্তের কড়চা, প্রবোধানন্দ সরস্বতীর "চৈতন্যচন্দ্রামৃত", স্বরূপ দামোদরের কড়চা, কবি কর্ণপূর পরমানন্দ সেনের "চৈতন্যচরিতামৃত" কাব্য এবং "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটক। (খ) বাংলায় রচিত। বাংলায় রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হল বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত", লোচন দাসের "চৈতন্যমঙ্গল", জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্যচরিতামৃত"। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বাংলায় রচিত জীবনী-কাব্যগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

॥ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ॥

কবি পরিচয় :

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার চৈতন্যভাগবতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যবিচার থেকে স্থির করেছেন যে ১৫১৮ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি বৃন্দাবন দাসের জন্ম। বৃন্দাবন দাসের মাতার নাম নারায়ণী। বৃন্দাবন দাস তাঁর পিতৃপরিচয় গোপন করেছেন। বৃন্দাবন নারায়ণীর বৈধব্যকালের সন্তান। কাজেই তাঁর জন্মের

বৈধতা নিয়ে এতাবৎ কাল পর্যন্ত বহু জল্পনা-কল্পনা চলে আসছে। তবে নিত্যানন্দ দাসের 'প্রেমবিলাস' কাব্যে বৃন্দাবনের পিতৃপরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাতে বলা হয়েছে, কুমারহট্টের বৈকুণ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাল্যকালে নারায়ণীর বিয়ে হয়েছিল এবং নারায়ণী যখন অন্তর্বত্নী তখন বৈকুণ্ঠনাথ লোকান্তরিত হন। এইটে স্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে। বৈষ্ণব সমাজে এইটে প্রামাণিক বলে গৃহীত হয় নি। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে বৃন্দাবন দাসের জন্ম রহস্যাবৃত। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ দাসের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন এবং বৈষ্ণব সমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করেছেন।

কাব্য পরিচয় ঃ

বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্যভাগবত' বাংলায় রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্য-গুলোর মধ্যে আদি গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস ১৫৪১—৪২ খ্রীঃ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থের কবিকৃত নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। পরবর্তীকালে মাতা নারায়ণীর নির্দেশেই অথবা বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশেই হোক গ্রন্থের নাম পরিবর্তিত করে নামকরণ করা হয়েছে 'চৈতন্যভাগবত'। নাম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বৃন্দাবন দাস ভাগবতের ছাঁচে চৈতন্যলীলা ঢালাই করেছেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁর সমসাময়িক কবি লোচন দাস 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে কাব্যরচনা করেছিলেন। তাই নামের ঐক্য খণ্ডন করবার জন্য কবিকৃত মূল নামের পরিবর্তন করা হয়েছে। সে যাই হোক, বৃন্দাবনের রচিত গ্রন্থের নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল' পরে নাম পাল্টে করা হয়েছে 'চৈতন্যভাগবত'।

'চৈতন্যভাগবত' আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের জন্ম থেকে গয়ায় পিতৃকৃত্য পর্যন্ত, মধ্যখণ্ডে গয়া প্রত্যাবর্তন থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত, অন্ত্যখণ্ডে সন্ন্যাসোত্তর কালের দিব্যোন্মাদ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আদিখণ্ডে চৈতন্যের শৈশব-বাল্যের দুরন্তপনা, পড়ুয়া জীবন, অধ্যাপনা, বিবাহ ইত্যাদি যথেষ্ট তথ্যনিষ্ঠা এবং কাব্যকুশলতার সহায়তায় কাব্যচ্ছন্দে উৎসারিত হয়েছে। অন্ত্যখণ্ড অত্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবকে অবতার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, চৈতন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। তাই চৈতন্যের প্রেমিক এবং রুদ্রমূর্তির যুগ্মরূপ তাঁর কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। চৈতন্যভাগবতে তৎকালীন সমাজের ধর্মকর্ম, আচারনীতি, রাজশক্তির ধর্মান্ধতা, স্মৃতি, ন্যায়ের চর্চা ইত্যাদির সামগ্রিক এবং বিশ্বস্ত চিত্রলেখা পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হল বৃন্দাবন দাস কাব্যের উপাদান কোথা থেকে পেলেন? চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার উপাদান তিনি অদ্বৈত আচার্যের কাছ থেকে, চৈতন্য-পার্ষদ নিত্যানন্দের কাছ থেকে এবং মাতা নারায়ণীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে থাকবেন। এছাড়া মুরারি গুপ্তের কড়চা বা "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থ থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন। চৈতন্যদেবের জীবনবিন্যাস মুরারি গুপ্তের কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে 'চৈতন্যভাগবত' প্রসাদ গুণাঢ্য ও মানব রসসিক্ত। কোনও তাত্ত্বিকতা না থাকায় গ্রন্থটি সুখপাঠ্য হয়েছে। আঙ্গিকের বিচারে ভাগবতের পালাক্রম অনুসৃত হয়েছে। এখন বৃন্দাবন দাসের রচনার নমুনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"না যাইহ না যাইহ বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছয়ে সবে তোর মুখ চাইয়া॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু।
তুমি গেলে প্রাণ মুই সর্বথা ছাড়িমু॥"

[শচীমাতার বিলাপ]

॥ লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' ॥

কবি পরিচয় :

লোচন দাসের পিতার নাম কমলাকর, মাতার নাম সদানন্দী। তাঁদের বাসস্থান ছিল কোগ্রামে। জাতিতে এঁরা বৈদ্য। লোচন বংশের একমাত্র সন্তান। ফলে একটু বেশি আদর পেয়েছিলেন। লোচনের জন্ম সম্ভবতঃ ১৫২৩ খ্রীঃ। তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন নরহরি সরকারের কাছে। নরহরি সরকার 'গৌরনাগরবাদের' প্রবর্তক। লোচন দাস কাব্য রচনা করেছেন ১৫৫০—৬৬ খ্রীঃ মধ্যে কোনও সময়।

কাব্য পরিচয় :

'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্য চারিটি খণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড। মূলতঃ কাব্যটি গেঁয়ো। তাই রচনাধারা অনেকটা মঙ্গলকাব্যের

মতো এবং রাগরাগিনীরও উল্লেখ আছে। সূত্রখণ্ডে বিভিন্ন দেবদেবী এবং গুরুবন্দনা রয়েছে। কৃষ্ণ চৈতন্যরূপ ধরে অবতীর্ণ হয়েছেন রাধাপ্রেমকে সুব্যক্ত এবং ধর্ম-স্থাপনের জন্য—এই বিশ্বাসমতে কবি কাহিনী বিন্যাস করেছেন। ভাগবতের কৃষ্ণলীলার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি চৈতন্যলীলা ব্যাখ্যা করতে বসে দেখিয়েছেন চৈতন্যদেব সখাদের বিবস্ত্র করছেন। এই বর্ণনার ঐতিহাসিকত্ব যেমন নেই তেমনই রুচির নয়। তাছাড়া নাগরবাদের প্রভাবের ফলে তাঁর কাব্যে আদি রসের কামোত্তেজক বর্ণনা কাব্যের সুরকে আহত করেছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বরাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে আসঙ্গলিপ্সার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা চৈতন্যচরিত্রের মাহাত্ম্য এবং সংহতিকে যেমন ক্ষুণ্ণ করেছে তেমনই তা রুচিদুষ্ট।

লোচন দাসের কাব্যের সদর্থক দিকও আছে। সেইটি হল তাঁর লিখনভঙ্গীর সরলতা, চৈতন্যের রূপবর্ণনায়, শচীমাতা এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ বিলাপে তাঁর কবিশক্তির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। লোচন দাসের রচনা একটু উল্লেখ করা গেল :

"অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরাদেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙাড়িছে গো
এক কৈল শুধুই সুনেহা॥
পুরুষ প্রকৃতিভাবে কান্দিয়া বিকল গো
নারী বা কেমনে মন বান্ধে।"

* * * * (গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা)

॥ জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ॥

কবি পরিচয় :

জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনী। তাঁদের বাস ছিল বর্ধমানের আমাইপুরা গ্রামে। জয়ানন্দের জন্ম আনুমানিক ১৫২৩ খ্রীঃ। জয়ানন্দের আসল নাম গুইয়া। চৈতন্যদেব তাঁর নাম পাল্টে নামকরণ করেছিলেন জয়ানন্দ। তাঁর কাব্য রচিত হয়েছিল আনুমানিক ১৫৬০ খ্রীঃ। তখন কবির বয়স হয়েছিল সাতচল্লিশ বছর।

কাব্য পরিচয় :

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' নয়টি খণ্ডে বিভক্ত। তাঁর কাব্যকথার সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম ও তত্ত্বের সঙ্গতি নেই। তাই বৈষ্ণব সমাজে এই কাব্যের সমাদরও নেই। তাঁর রচনার বিশিষ্টতা হল এই যে তিনি কাব্যে আত্মাশক্তির স্তব করেছেন। এবং মুসলমান কাজী হিন্দুদের উপর জুলুম করতেন বলে কালীর দ্বারা নিগৃহীত হয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর স্বাভাবিক বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া তখন হাবসী দুঃশাসনের চাপের ফলে সমাজে, রাষ্ট্রে যে প্রচণ্ড অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল তার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা তাঁর কাব্যের অন্যতম সম্পদ। কলির আবির্ভাবে অজন্মা, শূদ্রের ব্রাহ্মণ সেবায় অসম্মতি, শাসন শৈথিল্য, হিন্দুদের ধর্মান্তরীকরণ ইত্যাদির স্বচ্ছন্দ বর্ণনার জন্য 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য স্বীকার করতে হবে। লোচনের কাব্যের সঙ্গে তাঁর কাব্যের পার্থক্য লক্ষ্য করবার মতো। লোচন দাস চৈতন্যের সন্ন্যাসের পূর্বরাত্রের বিলাস-সম্ভোগের চিত্র এঁকেছেন, জয়ানন্দ সেখানে চৈতন্যকে জাগতিক প্রলোভনের উর্ধে স্থাপন করেছেন।

জয়ানন্দের কাব্যটিও গেঁয়ো। তবে কাব্য হিসেবে খুব উঁচুদরের নয়, যদিও মাঝে মধ্যে কবিত্বের স্ফূরণ রসাবেশের সৃষ্টি করেছে। গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণ উপলক্ষে মস্তক-মুণ্ডন বর্ণনা, বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। জয়ানন্দের রচনার নমুনা উদ্ধার করে দিলাম :

"বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী জত কৈলা নিবেদন।
দৃকপাত না করে প্রভু না করে শ্রবণ॥
শ্রবণযুগলে প্রভু দিঞা দুই হাথ।
জয়ানন্দ বলে প্রভু হা নাথ হা নাথ॥"

[বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ]

॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ॥

কবি পরিচয় :

কৃষ্ণদাস কবিরাজের জন্মকাল সঠিক করে বলা মুস্কিল। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে তাঁর জন্ম ১৫১৭ খ্রীঃ আবার ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেছেন তাঁর জন্ম ১৫২৭ খ্রীঃ। কবির বাসস্থান ছিল নৈহাটির নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা এবং ভাইয়ের নাম শ্যামদাস।

কবিরাজ গোস্বামীর বাড়িতে নামসঙ্কীর্তন হত। তিনি নিত্যানন্দ এবং শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে রঘুনাথ দাসের কাছে দীক্ষা নেন এবং রূপ-সনাতনের কাছে বৈষ্ণব শাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। পরে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের আদেশে তিনি 'শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত' কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যরচনাকাল অনুমানিক ১৫৯২ খ্রীঃ কিছু পরে, তখন কবি "জরাতুর"।

কাব্য পরিচয়ঃ

অন্যান্য চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলোতে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নি। অথচ অন্ত্যলীলার পর্যায়টি বৈষ্ণবদের কাছে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নির্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধ বয়সে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ অবস্থার ভাবসত্য এই গ্রন্থের উপজীব্য। চৈতন্যদেব তাঁর জীবনাচরণ দিয়ে প্রেমধর্মে যে কূলপ্লাবনী বেগ সঞ্চার করেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ মননশীলতার তটবন্ধনীতে ধারণ করেছেন। ষড়গোস্বামী ব্যাখ্যাত বৈষ্ণব দর্শন তাঁর কাব্যে সাবলীল ছন্দে বিধৃত হয়েছে। চৈতন্যতত্ত্বকে গভীর মনীষা ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সহায়তায় সাধারণ-বোধ্য করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাম ও প্রেমের পার্থক্য নির্দেশে, কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ-বেদনার স্বরূপ প্রকাশে, অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে কবিরাজ গোস্বামী গূঢ় অনুভূতি এবং মনস্বিতার যে স্বাক্ষর রেখেছেন তা কেবল মধ্যযুগের নয়—আধুনিক যুগের পক্ষেও বিস্ময়ের বস্তু। বিস্ময়বোধ আমাদের আরও বেশি অভিভূত করে যখন দেখি বাংলা পয়ারের শিথিল অঙ্গবিন্যাসের মধ্যে এবং অচিরজাত বাংলা ভাষাকে স্বচ্ছন্দে দুরূহতত্ত্বের প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষা ও পয়ার ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় "চৈতন্যচরিতামৃত" কাব্য থেকে। অথচ দুরূহতত্ত্ব প্রতিপাদন করলেও কাব্যরসের ব্যত্যয় বিশেষ ঘটে নি। তাঁর কাব্যে পারিভাষিক কঠিন শব্দের ব্যবহার বিষয়বস্তুর প্রয়োজনেই এসে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা কাব্যপ্রবাহে উপলব্যাহত উচ্ছ্রায়ণের সৃষ্টি করে নি। মনে হয় হিমালয় কন্দর থেকে নিঃসৃত জলধারার তোড়ের মুখে ভারী পাথরের মতো কবির গূঢ় উপলব্ধির বেগবান প্রবাহের মুখে কঠিন পারিভাষিক শব্দগুলো ভেসে গেছে। অথচ এতটুকু পরিমিতিবোধের ব্যত্যয় ঘটে নি। তাঁর বাক্‌রীতি স্বল্পাক্ষর, গাঢ়বন্ধ-ক্লাসিকের পর্যায়ভুক্ত। তাঁর বহু উক্তি বাংলা

সাহিত্যে 'সূক্তি'র আকারে চলে আসছে। তাই বলা যেতে পারে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কেবলমাত্র মধ্যযুগের অবিস্মরণীয় সাহিত্যকৃতি নয়—সর্বকালের বরণীয় সৃষ্টি। বাঙালী মনীষার গৌরবময় নিদর্শন।

এখন কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

"কামপ্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম॥

* *

অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্বর॥"

● ষষ্ঠ অধ্যায় ●

পদাবলী সাহিত্য—বৈষ্ণব পদাবলী

ঐতিহাসিক উৎস ও বিবর্তন :

ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে ভক্ত-সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। উপনিষদে আদি-রসাত্মক ভক্তির আভাস রয়েছে। বিষ্ণুকেন্দ্রিক আদি-রসাত্মক ভক্তির প্রসার বৈদিক যুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক যুগেই শাণ্ডিল্য সূত্রে এবং ভক্তি সূত্রে আদি রসাত্মক বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক বিচার করা হয়েছে। খ্রীঃ চতুর্থ শতক থেকেই বাংলাদেশে কৃষ্ণ, বিষ্ণু, বাসুদেবের উল্লেখ বিভিন্ন লিপিতে দেখা যায়। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক থেকেই রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। যদিও ভাগবতে বা প্রাচীন কোনও পুরাণে রাধার উল্লেখ নেই, রাধার উদ্ভব কি ভাবে হল তা-ও সংশয়াচ্ছন্ন, তবুও অনুমান করতে বাধা নেই যে রাধা লোক-চেতনা সমুদ্ভূতা, পরবর্তীকালে ভাগবতে উল্লিখিতা কৃষ্ণের কৃপাপুষ্টা অনাম্নী গোপী রাধা নামের সঙ্গে অভিন্না হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক, একথা বলতে পারি, বিশেষ একটি লোকগোষ্ঠীর গভীর প্রেমবোধ থেকেই রাধার জন্ম হয়েছিল। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী বাংলাদেশে প্রাকৃত-গাথায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিল। রাজা লক্ষণ সেনের আমলে কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেছিলেন। প্রাকৃত-গাথায় অভিব্যক্ত রাধাকৃষ্ণ লীলার অমার্জিত এবং বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে জয়দেব শালীন এবং সংহত রূপ দিয়েছেন। তবুও একথা অবশ্য স্বীকার্য যে জয়দেবের কাব্যকৃতিতে লৌকিক প্রেমেরই প্রকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রেমমার্গে 'গীতগোবিন্দ' যে নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টির গৌরবে আজ স্বীকৃতি লাভ করেছে সেইটি পরবর্তীকালে আরোপিত এবং তা ঘটেছে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় চৈতন্যদেবের ঐ কাব্যপদ আস্বাদনের সূত্রে। পাশাপাশি এইটেও লক্ষ্য করবার মতো যে, খ্রীঃ চতুর্দশ শতকে মাধবেন্দ্রপুরী বাংলাদেশে ভাগবত ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর ঐ প্রচারণার ফলে এই দেশে ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলা এবং ভক্তিমার্গীয় বৈষ্ণব আদর্শ জনসমাজে ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। পরে চৈতন্য-দেবের আবির্ভাব এবং জীবনাচরণে রাধাপ্রেমের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি দান,

বৃন্দাবনের ষড়-গোস্বামীর আবির্ভাব এবং প্রেমধর্মের সমর্থনে দর্শন প্রণয়ন বৈষ্ণব ধর্মকে জনমানসে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এইটে মনে রাখতে হবে, প্রাক্‌চৈতন্য এবং পরচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে তত্ত্বগত পার্থক্য রয়েছে এবং ঐ পার্থক্যসূত্রে কাব্যভাবনার পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। প্রাক্‌চৈতন্য পদকারেরা মূলতঃ কবি, পরচৈতন্য পদকারেরাও কবি। কবিদের 'ভক্ত' অভিধা পরচৈতন্যকালের ভক্তিদৃষ্টির নিয়ন্ত্রণে আরোপিত।

বৈষ্ণবকাব্যের দার্শনিকতা :

"বৈষ্ণব ধর্ম লইয়াই বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব ধর্মকে বাদ দিয়া এ সাহিত্যের আলোচনা চলে না।" বৈষ্ণব ধর্ম, বিষেশতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্বটুকু না জানলে বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ রসাস্বাদন কিছুটা বাধিত হয়। আমরা এই কথা অবশ্য স্বীকার করি যে পদাবলীর ধর্ম, দর্শন নিরপেক্ষ মানবিক আবেদন আছে যার জোরে বৈষ্ণব পদাবলী দেশ-কাল-পাত্র বিনির্মুক্ত সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কেবলমাত্র প্রেম-কাব্য বলে। তবুও বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন তত্ত্বের সঙ্গতিসূত্রে যে বিশেষ মানস পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা যে অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত হয়ে ওঠে তার ফলে কাব্যানন্দ 'ভক্তিরসে' রূপান্তরিত হয়ে যায়, কাব্যের tune এক থাকলেও tone পাল্টে যায়। তাই আমরা সংক্ষেপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আলোচনা করে নেব।

বৈষ্ণব মতে কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। আর সবই প্রকৃতি বা নারী। পরমপুরুষ আদিতে ছিলেন এক, নিশ্চল, সমাধিস্থ। তাঁর ইচ্ছে হল আত্মোপলব্ধি করবেন। এই আত্মোপলব্ধির উপায় হল লীলা। লীলা তো আর একে হয় না —লীলাসঙ্গিনীর দরকার হয়। কাজেই কৃষ্ণ তাঁর আনন্দাংশের দ্বারা সৃষ্টি করলেন শ্রীরাধাকে। রাধা হলেন তাঁর হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। জগৎ রূপে স্রষ্টার আনন্দাংশের প্রকাশ; তার প্রতীকায়িত রূপকে রাধা বলা যেতে পারে। কাজেই জীব ও জগৎ তাঁর নিত্যলীলার আয়োজন করে চলেছে। পরমপুরুষের সঙ্গে জীব ও জগৎ অভিন্নও বটে আবার ভিন্নও বটে। যেহেতু জীব ও জগৎ তাঁর হ্লাদিনী অংশের সৃষ্টি সেইজন্য অভেদ অথবা বলা যেতে পারে অব্যক্ত অবস্থায় কৃষ্ণের ভিতরে লীন হয়ে ছিল সেইজন্য অভেদ, আবার ব্যক্ত অবস্থায় তাঁর থেকে বিশ্লিষ্ট এবং তার প্রত্যক্ষগম্য অস্তিত্ব আছে সেইজন্য ভেদ-গুণ-বিশিষ্ট। ব্যক্ত এবং অব্যক্তের নিত্য মিলন-বিরহের লীলা চলেছে, একে ভাষান্তরে বলা হয় পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। একেই গৌড়ীয় দর্শনে বলে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব। এই লীলারস আস্বাদন বৈষ্ণবদের উপজীব্য। তত্ত্বে

যা নিরালম্ব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লীলায় তাই কাব্য হয়ে উঠেছে। বাস্তব জগতের নরনারীর প্রেম-লীলার আধারে কবিরা পুরুষ ও প্রকৃতির লীলাকে, পরস্পরের প্রতি সানুরাগ আকর্ষণ-বিকর্ষণ, মান-অভিমান, বিরহ-মিলন, ভাব-সম্মিলনের পালাক্রমে রসোজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছেন, পরকীয়া প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রেমের ঐকান্তিকতাকে আরও গভীরভাবে প্রকাশ করেছেন। পরকীয়া প্রেম কি? স্থুল অর্থে বিবাহিতা নারীর পরপুরুষে আসক্তি এবং আসক্তির তাগাদায় আত্মীয়, স্বজন, স্বামী সকলকে ত্যাগ করে সামাজিক বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়াকে পরকীয়া প্রেম বলে। বৈষ্ণব কাব্যেও দেখা যাবে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধা আয়ানের স্ত্রী, তিনি যশোদানন্দন কৃষ্ণের প্রেমে পাগল হয়ে ঘর ছেড়ে পথে নেমেছেন। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে জীব ও জগৎ পরমপুরুষের সঙ্গে অভিন্ন, অর্থাৎ রাধা ও কৃষ্ণ অভিন্ন। কাজেই তাঁর স্বকীয়া। কিন্তু রাধা জীব হিসেবে জগতের সংস্পর্শে এসে আপন স্বরূপ ভুলে আছেন। লৌকিক দৃষ্টিতে রাধা জগতের স্বকীয়া এবং কৃষ্ণের পরকীয়া। জীবের ভিতরে যখন ভুলে থাকা আপন সত্তার প্রকাশ ঘটে তখন সে জগতের বন্ধন কেটে স্বরূপে ফিরে যেতে চায়। তখন ঘর-দোর, আত্মীয়-পরিজন, স্বামী-স্ত্রী, সমাজ সব ছেড়ে পরমপুরুষের অভিসারে বেরিয়ে পড়ে। এই অভিসার বৈষ্ণবের পরকীয়া প্রেমতত্ত্ব। মানব-মানবীর প্রেমলীলার আধারে কবিরা ঐ তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ঐ তত্ত্ব না জানলেও কাব্যরস আস্বাদনে বাধা থাকে না, তবে সাধারণ রতির জায়গায় কৃষ্ণকে বসালে স্বাদের পরিবর্তন হয়, অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত হয়ে প্রেমের ঐশীরূপ নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠে।

এখন আমরা আবার মূল কথায় ফিরে আসি, বৈষ্ণব ভেদকে স্বীকার করেছে লৌকিক দৃষ্টিতে, তত্ত্বের দৃষ্টিতে আসলে তা অভেদ। রাধাকৃষ্ণ অবিনাবদ্ধভাবে বিরাজ করছেন। রাধাকৃষ্ণের অবিনাবদ্ধভাবে অবস্থান বা পারিভাষিক কথায় "সামরস্যে" অবস্থান বৈষ্ণবের ব্রহ্মতত্ত্ব। সে অনন্ত, অব্যক্ত। আনন্দাংশের সৃষ্টি হলেন রাধা এবং লীলার আস্বাদনের জন্যই পরমপুরুষ নিজেকে বিভক্ত করেছেন। এইটে হল প্রেমের বিভাগ—নিজের আনন্দাংশকে বিশ্লিষ্ট করে উপভোগ করবার জন্যই ভেদ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে পারি—"তাহাতে (বৈষ্ণব ধর্মে) ভগবানের সহিত জগতের যে দ্বৈতবিভাগ স্বীকার করে, তাহা প্রেমের বিভাগ,—আনন্দের বিভাগ;......... তাঁহার শক্তি সৃষ্টির মধ্যে নিজেতে নিজে আনন্দিত হইতেছে।......... বৈষ্ণব ধর্মে এই ভেদকে নিত্যমিলনের নিত্য উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।"

পদাবলী পরিচয় :

বৈষ্ণব পদাবলীকে দুইটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে ; প্রথমতঃ প্রাক্‌চৈতন্য, দ্বিতীয়তঃ পরচৈতন্য। প্রাক্‌চৈতন্য যুগের কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। পরচৈতন্য যুগের কবিদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় কবি হলেন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস। আমরা ধারাবাহিকভাবে উল্লিখিত কবিদের কাব্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেব।

জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ধর্মীয় অনুশাসনের বেষ্টনী ভেঙে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রচিত শৃঙ্গার রসাত্মক কাব্যধারার সঙ্গে যুক্ত করে তার মধ্যে যেমন লৌকিক রসসঞ্চার করলেন তেমনই ভবিষ্যৎ প্রসারের পথও খুলে দিলেন। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা গৌণ—মুখ্য হল সৌন্দর্য-সৃষ্টি। এই সৌন্দর্যসৃষ্টি জয়দেব করেছেন অপ্রাকৃত প্রেমের মধ্যে প্রাকৃত হৃদয়াবেগ সঞ্চার করে। তিনি প্রথম ভাগবতের অনামী গোপীশ্রেষ্ঠাকে রাধা নামে শাশ্বত প্রেমের প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠা করে অলঙ্কার-শাস্ত্র-বিধি সম্মত নায়িকার রূপ-গুণ আরোপ করে পূর্বরাগ, মান, সম্ভোগ, বিরহাদির স্তর পরম্পরায় অভিব্যক্ত করেছেন। পরবর্তীকালের কবিকুল সেই ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন।

'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃতে রচিত হলেও তার ভাষা, ছন্দ, বাক্‌রীতি, কবিভাবনার সঙ্গে বাংলা কাব্যসাহিত্যের যোগ অত্যন্ত গভীর। ভক্ত ও ভগবানের প্রেম সম্পর্কের যে কল্পনা জয়দেব করেছেন পরবর্তী বৈষ্ণব কবিরা তাকেই শিরোধার্য করেছেন। এছাড়াও লক্ষ্য করবার বিষয় হল, জয়দেব প্রথম রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা প্রসঙ্গে পদাবলী ("মধুর কোমল কান্ত পদাবলীম্") কথাটি ব্যবহার করেছেন। যদিও পদসমুচ্চয় অর্থে পদাবলী কথাটির ব্যবহার অভিধানে পাওয়া যায়, অলঙ্কার-শাস্ত্রেও পাওয়া যায়। কিন্তু জয়দেব বিশিষ্ট অর্থে পদাবলী কথাটি ব্যবহার করবার পর থেকে বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে যোগরূঢ় অর্থে কথাটি ব্যবহার করে আসছেন। ফলে বৈষ্ণব গান বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিত হয়েছে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনায় উৎস স্থলে জয়দেবকে স্মরণ করতেই হবে। এখানে জয়দেবের বহুশ্রুত একটি পদ উদ্ধার করলাম :

"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

বিদ্যাপতির পদাবলী ও ব্রজবুলি :

বিদ্যাপতির প্রতিভা সর্বতোমুখী। বিদ্যাপতি স্মৃতি, মীমাংসা, ব্যবহার-শাস্ত্র, পূজাপদ্ধতি, তীর্থ-মাহাত্ম্য ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির মুখ্য পরিচয় রাধাকৃষ্ণের লীলাত্মক পদ রচনায়। যদিও বিদ্যাপতি হরগৌরী, কালী এবং গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্তন করে পদ রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সৃজনী প্রতিভার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনায়। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি তাঁকে বৈষ্ণব পদাবলীর বিশিষ্টতার সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির পদ পাঠ করতে করতে ভাববিহ্বল হয়ে পড়তেন। ফলে বিদ্যাপতির পদাবলী বিশিষ্ট মর্যাদা লাভ করেছে। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলায় স্থূল প্রাকৃত জীবনের প্রসঙ্গ যুক্ত করে তার মধ্যে মানবিক রস সৃষ্টি করেছেন। এবং তাঁর পরিকল্পিত 'নৌকাখণ্ড' এবং 'দানখণ্ড'-এর মধ্যে অভিসারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রেখে গেছেন। বিদ্যাপতি প্রাকৃত জীবনরসকে মার্জিত রুচির বাতাবরণে আরও বেশি রমণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ছিলেন। রাজসভার বিদগ্ধ রুচি এবং রাজসিক ভোগপ্রতপ্ততা তাঁর কাব্যে মানবিক আবেদন সৃষ্টি করেছে। বিদ্যাপতি নায়ক-নায়িকার মিলনোৎকণ্ঠাকে সরাসরিভাবে আবেগমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে যে মিলনোৎকণ্ঠা রূপমুগ্ধতার বশবর্তী ছিল তাই ক্রমে ভক্তি ও ভাবমুগ্ধতার দিব্য প্রেম চেতনায় রূপান্তরিত হয়েছে। কবি এই রূপান্তরণ স্তর পরম্পরায় উদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর কাব্যের বিরহ এবং ভাব-সম্মিলনে অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনার যে স্ফুরণ ঘটেছে তার মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের ভাবী পরিণতির পূর্বাভাস সূচিত হয়েছে। অথচ বিদ্যাপতি ভক্ত-কবি নন। তিনি কবি-সংস্কার বশেই বুঝেছিলেন যে, পার্থিব প্রেমের অপার্থিব পরিণতি লাভ ঘটতে পারে। প্রেমের প্রার্থমিক উদ্দীপনের মূলে থাকে রূপমুগ্ধতা, আসঙ্গলিপ্সা, ক্রমে তা অধিকারবোধে রূপান্তরিত হয়ে মান-অভিমানের লুকোচুরি খেলার ভিতর দিয়ে জৈবাসক্তির উর্ধে ভাববিন্দুতে পরিণতি লাভ করে। এইখানে প্রেমের নম্রতা, রসের পরিচয়; এইখানে প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়, নিজেকে নিঃশেষে দান করে। কিন্তু এর পূর্বভাগে আছে দুরূহ সাধনা। বিদ্যাপতির কাব্যে পূর্বরাগ, মিলন, মান, অভিসার, বিরহ, ভাব-সম্মিলন প্রভৃতি

পালাক্রমে প্রেমের ঐ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য বিদ্যাপতি নিজে পালাক্রমে পদগুলো সাজান নি, তিনি বিভিন্ন পালার পদ রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে আলঙ্কারিক সূত্র অনুসরণ করে পদগুলোকে পালাক্রমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে প্রেমের বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তা এবং তার রহস্যময় প্রকৃতি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মোটের উপর বলা যেতে পারে বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনায় লৌকিক-সরণী ধরে চলতে চলতে তাকে অলৌকিক জগতে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। রূপের ভিতরে রূপাতীতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। প্রেমের সঙ্গে ভক্তির, ইন্দ্রিয়পরতার ভিতরে অতীন্দ্রিয়ের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে বাংলা কাব্যের নতুন পথ নির্দেশ করেছেন।

আমরা এইবার বিদ্যাপতির পদ উদ্ধার করব, তার থেকে তাঁর কবি-প্রকৃতির স্বরূপ বোঝা যাবে :

"শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয় কচ কবহু বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উঘারি॥"

[বয়ঃসন্ধির পদ]

উল্লিখিত পদে কবি রাধার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করেছেন। কৈশোর যাই যাই করেও যাচ্ছে না, যৌবনের আভাস সূচিত হয়েছে। এই দুয়ের ভিতরে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। রাধার দেহচেতনা জেগেছে, তার ভিতরে আছে নবযৌবনাগমের লজ্জা, বিস্ময়, চঞ্চলতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব। বিদ্যাপতি রাধার এই রূপ দেখে বিভোর হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আত্মহারা হন নি। তন্ময় দৃষ্টিতে রূপসুধা আকণ্ঠ পান করেছেন এবং পাঠককেও পান করিয়েছেন। বিদ্যাপতির এই বস্তু-বিভোরতা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির মধ্যে দুর্লভ। বিষয়ের সঙ্গে আর্টিষ্টের এই ব্যবধান বিদ্যাপতির প্রতিভার মৌলিকত্ব বলে গৃহীত হতে পারে।

এইবারে অনুরাগের একটি পদ উদ্ধার করি :

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানিএ
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।

সোহি মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥
কত মধুযামিনী রভসে গমায়ল
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয়া জুড়ল না গেল ॥"

[অনুরাগ]

এই পদে প্রেমের অতল রহস্য, আনন্দ-বেদনার জড়াজড়ি-মেশামেশি, সৌন্দর্য উপভোগে অপরিতৃপ্তি, গভীর হৃদয়াবেগ, প্রেমের অপার্থিব ব্যঞ্জনা, বিশাল ব্যাপ্তি পদটিকে শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতার মর্যাদা দান করেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কারণে বিদ্যাপতির কল্পনাকে Cosmic Imagination বলে অভিহিত করেছেন। এইরূপ কবি-কল্পনা অন্যান্য বৈষ্ণব কবির ভিতরে নেই। এইখানে বিদ্যাপতির স্বাতন্ত্র্য। এখানেও আর্টিষ্টের সঙ্গে বিষয়ের ব্যবধান আছে। অর্থাৎ রাধার হৃদয়ভাব সর্বোচ্চস্তরেও তা রাধারই হৃদয়ভাব হয়ে ফুটেছে—কবির নয়।

ব্রজবুলি :

উদ্ধৃত পদগুলো পাঠ করলেই বোঝা যাচ্ছে যে তা বাংলা বুলি নয়। যে ভাষায় পদগুলো রচিত তাকে বলা হয় ব্রজবুলি। এক সময় মনে করা হত ব্রজবুলি মথুরা-বৃন্দাবন বা ব্রজের ভাষা। ব্রজভাষা অর্থে ব্রজবুলিকে বোঝাত। সাধারণ ধারণা ছিল রাধাকৃষ্ণ এবং তাঁদের সখা-সখীরা ঐ ভাষায় কথা বলত। পরবর্তীকালে ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে দেখা গেছে যে উপরিকথিত ধারণা ভুল। আসলে ব্রজভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশের (শৌরসেনী) বংশধর। এই ভাষা মথুরা-বৃন্দাবনের জনসাধারণের মুখের ভাষা। ঐ অঞ্চলে বলা হয় 'ব্রজভাখা'। এই ভাষা এখনও পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। ব্রজবুলির উৎপত্তির মূলে রয়েছে লৌকিক অবহট্‌ঠ। ব্রজবুলি কৃত্রিম ভাষা। প্রাচীন মৈথিলী ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের যে সব ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায় তাতে মৈথিলীর সঙ্গে বাংলা শব্দের সংমিশ্রণ দেখা যায়। ব্রজবুলিতে ব্যাকরণ রীতির দিক থেকেও মিথিলার ভাষারীতির হুবহু অনুসৃতি নেই। রাধাকৃষ্ণ-লীলা বিষয়ক এবং চৈতন্য-লীলা বিষয়ক পদ রচনার বাইরে ব্রজবুলির ব্যবহার

নেই। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহের পদাবলীতে ব্রজবুলির ব্যবহার করেছেন। ব্রজবুলি পদের ধ্বনি-ঝঙ্কার ও লালিত্য সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে থাকবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি, বিদ্যাপতির পদে মৈথিলী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সংমিশ্রণ ঘটে ব্রজবুলি পদের সৃষ্টি হয়েছে। এইটে কি ভাবে ঘটেছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। গ্রীয়ার্সন দেখাতে চেয়েছেন যে, বিদ্যাপতি মূলতঃ খাঁটি মৈথিলী ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। মিথিলা ও বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রে বাঙালী ছাত্ররা মিথিলায় ন্যায়-মীমাংসা পড়তে যেতেন। তাঁরা বিদ্যাপতির পদ কণ্ঠস্থ করে আসতেন। কিন্তু মৈথিলী ভাষা তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত। তাই তাতে বাংলা ভাষা ও শব্দ প্রকরণের সংমিশ্রণ দ্বারা রূপান্তর ঘটান। ঐ রূপান্তরিত ভাষাকে ব্রজবুলি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছেন, বাংলাদেশের কীর্তনীয়া সম্প্রদায় মহাজন পদ-সংগ্রহের কালে বাঙালীর মেজাজ-মর্জির দিকে নজর রেখে মৈথিলী পদকে ভেঙে-চুরে বাংলার অনুগামী করেছেন। সম্ভবতঃ কর্কশতা দূর করে পদে লালিত্য সঞ্চারের জন্যে এই কাজটি করেছেন। এইভাবে ব্রজবুলি পদের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই কথা স্বীকার করা যেতে পারে, বিদ্যাপতির মূল পদ আঞ্চলিকতার প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে ব্রজবুলির সৃষ্টি করেছে। এই প্রসঙ্গে আসাম ও উড়িষ্যার নাম করা যেতে পারে। আসামের শঙ্করদেব, মাধবদেব ও উড়িষ্যার চম্পতি রায় ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছেন।

পদাবলীর চণ্ডীদাস :

চণ্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম কবি। চণ্ডীদাস প্রাক্-চৈতন্য যুগের কবি। তাঁর জন্মস্থান নান্নুর না ছাতনা তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহে 'বড়ু', 'দ্বিজ', 'দীন' ইত্যাদি বিভিন্ন ভণিতা পাওয়া যায়। ফলে তর্ক উঠেছে এই যে, একই ব্যক্তি বিভিন্ন ভণিতায় পদ রচনা করেছেন, না একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্যদেব কোন্ চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করে পরিতৃপ্তি লাভ করতেন? পদের আভ্যন্তরীণ বিচারে এবং চৈতন্যদেবের সাত্ত্বিক রুচির বিচারে আমাদের মনে হয় একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। চৈতন্যদেব যে চণ্ডীদাসের পদ কীর্তন শুনে দিব্যোন্মাদ অবস্থায় শান্তি লাভ করতেন তিনি 'বড়ু', 'দ্বিজ',

'দীন' চণ্ডীদাস নন। ইনি অন্যব্যক্তি। এঁকে আমরা পদাবলীর চণ্ডীদাস বলে অভিহিত করছি। এইক্ষেত্রে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এই চণ্ডীদাসের কাব্যস্বরূপ 'বৈষ্ণবতা' নয়—'ভাবগভীরতা'। 'বৈষ্ণবতা' বলতে আমরা চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব পদাবলী আস্বাদনের আলঙ্কারিক রস সংস্কারকে বোঝাচ্ছি। এই রসপ্রক্রম বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে নেই, তেমনই নেই পদাবলী চণ্ডীদাসের 'ভাবগভীরতা'। আবার দীন চণ্ডীদাসের পদে আলঙ্কারিক প্রক্রমের কৃত্রিম অনুসরণ আছে, এঁর আবির্ভাব কাল ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি। দ্বিজ চণ্ডীদাস হয় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, না হয় অল্প পরবর্তী। কাজেই পদাবলীর চণ্ডীদাস কোনও পৃথক কবি বলে গৃহীত হতে পারেন। অবশ্য একথা ঠিক যে পদাবলীর রূপ-সজ্জা পরবর্তীকালের ব্যাপার এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস সকলের পদ পালানুক্রমে সাজানো হয়েছে। তাতে কবির নিজস্ব উপস্থাপনার পদ্ধতি লুপ্ত হয়ে গেছে। এহেন অবস্থায় চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদের ভাবগভীরতার উপর নির্ভর করে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে বুঝে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এতেও পদবিচারে মতানৈক্য ঘটবে তা বলাই বাহুল্য—কিন্তু তাতে একাধিক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব সম্পর্কে এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসের পৃথক অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়" –সকলের প্রাণের কথা সেই কবিতায় প্রকাশ পায়, সকলের প্রাণের আতিথ্যে সেই কবিতা কালজয়ী হয়ে যায়। এহেন কবিতায় কবি যা বলেন তার চাইতে অনেকখানি থাকে না বলা, এই অকথিত অংশ পাঠককে কল্পনা করে নিতে হয়। চণ্ডীদাস এই শ্রেণীর কবি। তিনি হৃদয়ের গভীর অনুভূতিকে সহজ ভাষায়, নিরাভরণ ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উপলব্ধির গভীরতা, প্রকাশের আন্তরিকতায় তাঁর কথা অনন্যসাধারণ কাব্য হয়ে উঠেছে। প্রাণের অবিমিশ্র আনন্দ-বেদনাকে চণ্ডীদাস সহজ কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কাব্য-সৃষ্টিতে তাঁর দুঃখের কথাতেই বিশেষ অধিকার। মিলনের ভিতরেও বিচ্ছেদের ভয়ে দুঃখের সুর তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। ঐ দুঃখবোধ আছে বলেই প্রেমে সুখ বোধ হয়—দুঃখ সহ্য করবার গৌরবেই প্রেমের গৌরব। এই দুঃখকে যারা না জেনেছে তারা জীবনের একটি মহৎ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই হ'ল চণ্ডীদাসের মনোভাব। এই জন্য দুঃখের প্রতি তাঁর বিরাগ নেই।

বিদ্যাপতিও দুঃখের কথা লিখেছেন—কিন্তু তাতে দুঃখের ঐশ্বর্য রূপ ফুটেছে, তার কাব্যমূল্য অসাধারণ। চণ্ডীদাসের দুঃখ আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকেই আমাদের রসাবিষ্ট করেছে। এবারে উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য পরিষ্কার করা যাক ;—বিদ্যাপতি বিরহের পদে লিখেছেন :

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর— জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥"

এই পদে বুক-নিঙড়ানো বেদনা নেই—বেদনা প্রকাশের ভাষা এইটা নয়। বরঞ্চ দুঃখের রসাবেশ আছে। রাধিকা যদি দুঃখে গভীরভাবে অভিভূতই হ'তেন তাহলে কি ঝেঁপে আসা বর্ষার রূপ, ময়ূরের পেখম তুলে নাচ, দাদুরীর ডাক ইত্যাদির সৌন্দর্য অনুভব করতে পারতেন? কখনই না। তাই বলেছি বিদ্যাপতিতে দুঃখের ঐশ্বর্য আছে। পক্ষান্তরে চণ্ডীদাস লিখেছেন :

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥"

এই পদে দুঃখের গভীরতা আপন স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। মনে হয় চণ্ডীদাস নিজেই রাধিকা হয়ে গেছেন। আপন ব্যথিত হৃদয়কে স্বল্প-কথায় প্রকাশ করেছেন। তিনি যা বলেছেন তার চাইতে না-বলা কথা রয়েছে অনেকখানি। সেইটে নিভৃতে অনুভব করতে হয়—এ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তিযোগ্য নয়—শেষ দুই কলি মনের মধ্যে গুঞ্জন করতে থাকে—যত গুঞ্জন করতে থাকে ততই ভাবগভীর হয়ে উঠে। এইজন্যে বলেছি দুঃখের কথায় চণ্ডীদাসের বিশেষ অধিকার। এইজন্যে বলেছি দুঃখের গৌরবে প্রেমের গৌরব।

এই সূত্রে আবার বলে রাখি, বিদ্যাপতি রাধার হৃদয়ভাবকে রাধার দিক থেকে দেখেছেন, আর চণ্ডীদাস নিজের হৃদয়ভাবকে রাধার জবানীতে প্রকাশ করেছেন।

কবিধর্মের দিক থেকে চণ্ডীদাস আত্মলীন এবং মরমী। তাঁর পদে পূর্বরাগ থেকে শেষ পর্যন্ত বেদনার সূক্ষ্ম রেশ অনুভব করা যায়। ফলে বৈরাগীর একতারার মতো উদাসী প্রাণের তৃষ্ণা ঝঙ্কৃত হয়েছে। আত্মনিবেদনের ভিতরেও ব্যথাতুর হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। স্বর্গীয় প্রেমলাবণ্যের ছোঁয়া এক অতীন্দ্রিয় জগতের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর প্রেমসাধনা দেহকে কেন্দ্র করে দেহাতীত হয়ে গেছে। এই প্রেম-প্রকাশের ক্ষেত্রে কবি কোনও আলঙ্কারিক প্রথা-সিদ্ধ উপায় গ্রহণ করেন নি—কবি স্বভাব বহির্ভূত বলেই তা করেন নি। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন,—"এখানে শব্দের ঐশ্বর্য অপেক্ষা শব্দের অল্পতাই ইঙ্গিতে বেশী কার্যকরী হয়। প্রকৃত প্রেমিক বড় স্বল্পভাষী, এখানে উচ্চভাবের শোভা অবগতির জন্যই যেন ভাষার শোভা তনু ত্যাগ করে এবং বাহ্যসৌন্দর্যের বাহুল্য না থাকিলেও মন্ত্রপূত কোটি হৃদয়ের অন্তঃপুর উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।" এই কারণে বলা যেতে পারে যে মণ্ডন কলার বিচারে চণ্ডীদাসের অনেক পদের ত্রুটি ধরা পড়বে, কিন্তু সব ত্রুটি আন্তরিকতার গুণে চাপা পড়ে গেছে। বাঙালীর প্রাণের মর্মকোরকটি তাঁর কাব্যে প্রস্ফুটিত হয়ে শাশ্বত প্রেমগাথা রূপে সাহিত্যিক মূল্যে কালোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এইবার চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করে দিই :

"সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া
এমতি করিল কে ?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে।"

অন্য কোনও রমণী শ্যাম সোহাগিনী হয়ে উঠেছে ফলে রাধার আক্ষেপের শেষ নেই। এই দুঃখ কত গভীর, তা বোঝাতে গিয়ে কবি অন্য কোনও উপমা খুঁজে পেলেন না, রাধাই রাধার উপমা হয়ে উঠেছেন। শেষ পঙক্তিতে কবি যা বলেছেন তার মধ্যে না-বলা কথা আছে অনেকখানি। এই না-বলা অংশ পাঠকের চিত্তে সহস্রবার ধ্বনিত হয়ে রাধার বেদনাকে স্পষ্ট করে তোলে। আমাদের

মনে প্রশ্ন জাগে, ঐ ব্যথা বেদনা কি কেবল রাধার ? তা মনে হয় না। কারণ কবি যদি তাকে রাধার হৃদয়ভাব রূপে দেখতেন তাহলে অন্য উপমা এসে যেত। —কিন্তু তা হয় নি। কবি নিজেই রাধা হয়ে উঠছেন। বিষয়ের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে পড়েছেন—রাধার হৃদয়ভাবের অনুধ্যানে কবি এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছেন যে তাঁর ব্যক্তি-সংস্কার লুপ্ত হয়ে গেছে ; ফলে রাধার হৃদয়ভাব কবির ভাব হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই ভাবুকতার জন্য চণ্ডীদাসের কাব্যের আবেদন চিরন্তনতা লাভ করেছে। রূপদক্ষ কবিরূপে তিনি বিদ্যাপতি বা গোবিন্দদাসের সমকক্ষ নন। এইজন্য প্রারম্ভে বলেছি চণ্ডীদাসের কাব্যমূল্য ভাবগভীরতার জন্য—তাঁর পদে অরূপের রূপাভাস। অর্থাৎ অরূপ তাঁর কাব্যে রূপের কায়া ধারণ করে নি—রূপাবয়ব ধারণের ইঙ্গিত দিয়ে সরে পড়েছে। ঐ ইঙ্গিতের সূত্রে বাকীটুকু কল্পনা করে নিতে হয়। তাই বলা যেতে পারে কাব্য-তত্ত্বজ্ঞের চাইতে মরমীর কাছে তাঁর কাব্যের আবেদন বেশি।

চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তাবৃন্দ ঃ

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, তাঁর প্রেমব্যাকুল, যতি জীবনচর্যা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে প্রত্যক্ষভাবে অধ্যাত্ম-তাৎপর্য-মণ্ডিত করছে। চৈতন্যপারিষদেরা তাঁকে অবতার বলে মনে করতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, মর্ত্যে রাধাপ্রেমকে প্রকাশ করবার জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেবকে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ বলে মনে করতেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কাব্যে যে প্রেম ভাবরূপে ছন্দবদ্ধ ছিল তাই এবার বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করল। এই বাস্তবরূপ আবার নতুন করে কাব্যপ্রেরণার উৎস হয়ে দেখা দিল। নরহরি সরকার, বাসুদেব, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বংশীবদন, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি ভক্তেরা গৌরাঙ্গলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। এঁরা চৈতন্যলীলাকে পদাবলীর রূপে গ্রথিত করেছেন। চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা, কৈশোরের দুরন্তপনা, সন্ন্যাসগ্রহণ, শচীবিলাপ ইত্যাদির উপর পদ রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগবতীয় কৃষ্ণলীলার ছাঁচে গৌরলীলা বর্ণনা করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তা রুচিসম্মত হয় নি—চটুল ঢামালী ছন্দে গৌরনাগর ভাবের বর্ণনা চৈতন্যদেবের বাস্তব এবং ভাবজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিবিধায়ক হয় নি। নরোত্তম দাসের প্রার্থনার পদ ভাবগভীরতায় এবং প্রকাশ সৌষ্ঠবে সার্থক সৃষ্টি বলে গণ্য হতে পারে। সামগ্রিকভাবে এঁদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য উঁচুদরের নয়। সম্ভবতঃ কারণ এই যে, যে দূরত্ব থাকলে বাস্তব তথ্য সত্যের ভাববিন্দুতে রূপান্তরিত

হতে পারে এঁরা সেই দূরত্ব লাভ করতে পারেন নি। এই কারণে কাব্যোৎকর্ষে তাঁদের রচনায় কিছুটা ঘাটতি রয়ে গেছে। অবশ্য এই মন্তব্য করছি পরবর্তী পদ-সাহিত্যের শৈল্পিক সমুৎকর্ষের দিকে নজর রেখে। তবুও এই কথা অনস্বীকার্য যে, তাঁদের সজীব অভিজ্ঞতা, প্রকাশের অনাড়ম্বর ভঙ্গী, স্পষ্টতা পদগুলোকে হৃদয়গ্রাহী করেছে।

চৈতন্যোত্তর পদাবলী :

আমরা পূর্বেই বলেছি, চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের যুগ্মঅবতার বলে বৈষ্ণব সমাজে গৃহীত হয়েছেন। সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব চৈতন্যদেবের অন্তর্জীবনের ইতিহাস বলে বৈষ্ণব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। চৈতন্যদেবের প্রেমব্যাকুলতার মধ্যে তাঁরা শ্রীরাধার প্রেমার্ত রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে মহাপ্রভুর লীলামাধুরীর মধ্যবর্তিতায় তাঁরা রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-মাধুর্য আস্বাদন করতেন। কাজেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদকীর্তনের সময় সূচনাতেই যে ভাবের পদকীর্তন করা হত অনুরূপ ভাব চৈতন্যদেবের মধ্যে কি ভাবে প্রস্ফুটিত হত তৎসম্পর্কে পদকীর্তন করতেন। এই জাতীয় পদকে বলা হয় 'গৌরচন্দ্রিকা'। গৌরচন্দ্রিকা চৈতন্যোত্তর পদাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—গোবিন্দদাস রাধার পূর্বরাগ বর্ণনা সূচনায় অনুরূপ রসপর্যায়ে গৌরাঙ্গের কথা দিয়ে সুরু করলেন :

"নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।
কি পেখলুঁ নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব হেম— কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীর উজোর॥"

বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে 'গৌরচন্দ্রিকা' পদের বিশেষ গুরুত্ব আছে। গৌরচন্দ্রিকা বাদে রাধাকৃষ্ণর পদকীর্তনে ধর্মহানি হয় বলে শ্রোতারা মনে করেন। ধর্মহানি হ'ক বা না হ'ক এই কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, গৌরাঙ্গলীলার পটভূমিকায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিশেষ অধ্যাত্ম-তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ভক্তি-বিহ্বল পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। তাতে কাব্যের tune-এর পরিবর্তন হয়।

চৈতন্যোত্তর পদাবলীর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বাৎসল্য রস সৃষ্টিতে। চৈতন্যদেবের বাল্যলীলার সূত্র ধরে কৃষ্ণের বাল্যলীলার তাৎপর্য অনুভব এবং বালক কৃষ্ণ এবং যশোদার সম্পর্কের সূত্রে রচিত পদগুলো বাৎসল্য রসের আধার হয়ে আছে। বাৎসল্য রসের পদ প্রাক্‌চৈতন্য যুগে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে বলরাম দাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেই হবে।

জ্ঞানদাসের পদাবলী :

জ্ঞানদাস চৈতন্যোত্তর যুগের স্মরণীয় কবি। কবির ব্যক্তিগত পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে কাঁদড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বংশে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে কারও মতে ১৫৩০।৩১ খ্রীষ্টাব্দে জ্ঞানদাসের জন্ম। তিনি খেতুরী উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছিলেন। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস এবং বলরামদাসের সমকালীন কবি।

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলে খ্যাত। কিন্তু এইটাই সবটুকু নয়—জ্ঞানদাস নিজস্ব কবি বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। চণ্ডীদাসের মতো মন্ময়তা, গভীর ভাবানুভূতি জ্ঞানদাসের ছিল, তবুও চণ্ডীদাস শেষ পর্যন্ত মিষ্টিক, জ্ঞানদাস রোমাণ্টিক। জ্ঞানদাসের রোমাণ্টিকতা তাঁকে তাবৎ বৈষ্ণব পদকর্তাদের থেকে পৃথক করে দিয়েছে। তাঁর রচনায় তাই দেখা যায় অকারণ উচ্ছ্বাসে একই কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন। যেমন ধরা যাক, রাধা কদম্বতলে কৃষ্ণকে দেখে এসেছেন, দেখেই তাঁর মন মজেছে, তিনি বলছেন :

"আলো মুঞি জানো না সই জানো না
জানো না গো জানো না।"

এই কথাটি আকারণ উচ্ছ্বাসে মনের ভিতরে গুন্‌গুন্ করতে থাকে। তারপরেই :

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তরে বিদরে হিয়া না জানি কি করে প্রাণ॥"

রূপ দেখে পাগল হওয়া প্রাণ কি এক রহস্যময় অনির্দেশ্য আনন্দ-বেদনায় দুলতে থাকে, যাকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যায় না অথচ আভাসে ইঙ্গিতে ঐ রহস্যকে প্রকাশ করবার আকুলতা ঐ পঙক্তি কয়টি রচনার মূল প্রেরণা হয়ে আছে।

এই রকমের প্রেরণায় রোমান্টিক কাব্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে। একই প্রেরণায় জ্ঞানদাস বাঁশিকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বংশীধ্বনির ফল কি হয়েছে তা তিনি বলেন নি—বাঁশির সুর কতদিনের স্মৃতিকে সন্তর্পণে স্পর্শ করে একটু আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ তুলে উধাও হয়ে যায়, আর মন উজ্জীবিত স্মৃতিকে গোপনে, নিভৃতে নানাভাবে আস্বাদন করতে থাকে। রোমান্টিক কবি কাব্যের ভাবাঙ্গ সৃজনের কালেও প্রথাগত পন্থা অস্বীকার করে থাকেন। জ্ঞানদাস কৃষ্ণের রূপ বর্ণনায় লিখেছেন,—

"রজতের পাত্রে কেবা কালিন্দী পূজিয়াছে
জবাকুসুম তাহে দিয়া।"

জবাফুলের উপমা তাঁর মৌলিক কল্পনা—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বহির্ভূত বিষয়কে কৃষ্ণের রূপবর্ণনার কাজে লাগিয়েছেন। রোমান্টিক না হলে এ সম্ভব হ'ত না।

জ্ঞানদাসের পদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য মাধুর্য। এই মাধুর্য তাঁর পদের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আত্মনিবেদন, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি পদ মাধুর্যের গুণে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন উত্তেজনাহীন কোমল সুরে। আত্মনিবেদন করেছেন তখনও শ্যাম সোহাগিনী হওয়ার গৌরব ছাড়তে পারেন নি। সোহাগ বড় মধুর জিনিস। এইজন্যেই কথাটি উল্লেখ করলাম। এই মাধুর্য সঞ্চারের জন্য তিনি ভাষাতেও নারীসুলভ কোমলতার সঞ্চার করেছেন। এই কমনীয়তা ফুটে উঠেছে সোহনী, মোহণী, চিতপুতলী, টালনি, বলনি ইত্যাদি শব্দের অজস্র ব্যবহারে। এমন কি 'শ্যাম' 'শ্যামায়' রূপান্তরিত হয়েছেন। এই মাধুর্য জ্ঞানদাসের চিত্তের সম্পদ। এইবারে জ্ঞানদাসের কিছু পদ উদ্ধার করে দিই :

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পুতলি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

সীমাহীন, তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষার গীতিক্রন্দন এই চার ছত্রে ফুটে উঠেছে, অথচ উত্তেজনার প্রাবল্য নেই। এ যেন প্রাণের নিভৃত ক্রন্দন। যদিও বা মিলন ঘটে তথাপি তাতে স্থায়িত্ব কোথায় ?

রাধা স্বপ্ন দেখেছেন :

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।

পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥”

কবিগুরু উদ্ধৃত পদের রোমাণ্টিকতায় আকৃষ্ট হয়েছেন। এই স্বপ্নের ভাবসত্যকে তিনি বরণমাল্য দিয়েছেন। আরও বিস্ময়কর পদ হল :

“একলি মন্দিরে শুতলি সুন্দরী
কোরহি শ্যামর চান্দ।
তবহুঁ তাকর পরশ না ভেল
এ বড়ি মরমক ধন্দ ॥”

দেহ মন্থনের এত বড় সুযোগ কবি গ্রহণ করলেন না। কেন? কোনও বৈষ্ণবীয় তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। রোমাণ্টিক প্রেমের ভাবাচ্ছন্নতায় প্রেমিক-যুগল বিভোর হয়ে ছিলেন। দেহ বাস্তবের রূঢ়তায় স্বপ্নকে ভেঙে দিতে চান নি এবং এর মধ্যে একটি মাধুর্য আছে। এইজন্যে প্রথমেই জ্ঞানদাসের কবি-স্বরূপকে রোমাণ্টিক বলে অভিহিত করেছি। সীমিত পরিসরে বক্তব্যের প্রতিপাদনে প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের মনে হয় এই বিষয়ে আর সন্দেহের অবসর নেই। আবার আঙ্গিক কৌশলে চণ্ডীদাস উদাসীন, প্রাণের ভাষা মুখে ফুটিয়েই তিনি ক্ষান্ত। জ্ঞানদাস ভাবকে রূপকল্পের ভিতর ধরে দিতে চান। তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম কারুকার্য আমাদের মনোহরণ করে। এই কারণে শঙ্করীপ্রসাদ বসু রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে বলেছেন,—“আপনার মধ্যে একটা প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্য পাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চোখে এবং সর্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া আছে।” এইভাবে জ্ঞানদাস লাবণ্যকে “ইন্দ্রাণী”র রূপের মতো অনায়াসে ভাষায়, ছন্দে, রূপকল্পে বেঁধে দিয়েছেন।

গোবিন্দদাসের পদাবলী :

গোবিন্দদাস কবিরাজ চৈতন্যোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের আনুমানিক ১৪৫৯ শকে শ্রীখণ্ডে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতার নাম সুনন্দা। “সংগীত দামোদর” গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর তাঁর মাতামহ, সংস্কৃত কবি রামচন্দ্র তাঁর অগ্রজ। প্রথম জীবনে গোবিন্দদাস ছিলেন শাক্তপন্থী। পরে স্বপ্নাদেশে তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। খেতুরীর উৎসবে গোবিন্দদাস

উপস্থিত ছিলেন। ১৫৩৫ শকে তাঁর মৃত্যু হয়। এই হল গোবিন্দদাসের ব্যক্তি পরিচয়।

গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়। এই অভিধা স্বীকার করেও বলব যে বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম। বিদ্যাপতি মূলতঃ কবি। গোবিন্দদাস ভক্তকবি। ফলে রূপাসক্তি উভয়ের ভিতরে থাকা সত্ত্বেও গোবিন্দদাসে আত্মভোগ নেই—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি সাধনেই সেই রূপের সাধনা। রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি একাত্ম হন না—দূরত্ব রক্ষা করে লীলামাধুরী ভোগ করেন। চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব দর্শনের শিক্ষা তাঁকে এই পথে নিয়ে গেছে। এই মূলচেতনার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে প্রাকৃত দেহ-কামনা বিদেহ ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং এরই উপযোগী করে তিনি বাকনির্মিতি করেছেন। উপমা-অলঙ্কার তিনি প্রাচীন শিল্পলোক থেকে আহরণ করে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যলোকে পাঠককে উত্তীর্ণ করে দিতে চেয়েছেন। তবে এটা নিছক অনুকরণ নয়,—প্রাচীন শিল্পলোকের উপমা-অলঙ্কারকে আত্মসাৎ করেই নিজের শিল্পজগৎ নির্মাণ করেছেন।

গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অভিসারের পদ রচনায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। রাধা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে পৌঁছবার জন্য কঠিন সাধনা করেছেন। ঐ পথকে জয় করে তবে লক্ষ্যে পৌঁছতে হয়। পথ হল উপায় বা সাধনা আর সাধ্য হল অপ্রাকৃত ভাব বৃন্দাবন। পথসংগ্রামের ভিতর দিয়ে দুর্জয় প্রাণাবেগ, আত্ম-বিশ্বাস, অতন্দ্র-সাধনা অভিব্যক্ত হয়েছে। এই অভিব্যক্তিতে কোনও জড়তা নেই, কৃত্রিমতা নেই—আছে এক অত্যাশ্চর্য শিল্পলোক রচনা। কথায়, শব্দমন্ত্রে, ছন্দে, ধ্বনিতে, সৌন্দর্যে এই পদগুলো আমাদের মন-প্রাণকে অসীমের অভিমুখীন করে তোলে। দুই একটি উদাহরণ নেওয়া যাক :

"কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি-বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ— গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥"

কোমল ও কঠিন বর্ণ সংঘাতের ভিতর দিয়ে কবি পথের দুরধিগম্যতা এবং রাধার নিঃসঙ্গ অসহায়তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং কোমলাঙ্গী রাধার দুর্বার

আকাঙ্ক্ষা ও সাধনার একনিষ্ঠতাকে ব্যঞ্জিত করেছেন। বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের পার্থক্য এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার মতো। বিদ্যাপতির রাধা অভিসার করেছেন, তিনি মানবী, খরদীপ্তিময়ী, গোবিন্দদাসের রাধার মতো সাধিকা নন—কৃষ্ণপ্রেমে অন্ধ নন,—রাধাতত্ত্বের মানবীরূপ। অভিসার নিয়ে গোবিন্দদাস বহু পদ রচনা করেছেন। এই সব পদের ভাব-বৈচিত্র্য, মাধুর্য, সৌন্দর্য বিদ্যাপতিকে ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যাপতির বহু পদ আছে যার ভাব-গৌরব থাকলেও স্বর-ঝঙ্কার নিটোল নয়—পক্ষান্তরে স্বরতরঙ্গ সৃষ্টিতে গোবিন্দ-দাসের কৃতিত্ব অসাধারণ।

ভাষা ও ছন্দের উপর গোবিন্দদাসের সহজাত অধিকারের সঙ্গে মিশেছে নাটকীয়-বৃত্তি। তাই রাধাকৃষ্ণের মিলন লগ্নের শারীর-স্পন্দন পর্যন্ত ভাষায় ছন্দে ধরে দিয়েছেন অথচ কোথাও কলঙ্কের দাগ পড়ে নি। যেমন :

"কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলিকে সমাগমে কাঁপ॥"

বিরহের কবিতায় বৈষ্ণব কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। এই পর্যায়ের পদ রচনায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস অদ্বিতীয়। তাঁদের তুলনায় গোবিন্দদাসের সাফল্য কম। বিরহের পদের অনুচিত অলঙ্কৃতি তাঁর কাব্যত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। গভীরতম বেদনার বাণী সহজ ও অনাড়ম্বর হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিরহের প্রকাশে নিপুণ বাক্‌বিন্যাস থাকলে বেদনার সত্যতায় সন্দেহ জাগে। এই ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। অথবা (এই অসাফল্যের মূলে হয়ত কবিচিত্তের সায় ছিল না)—কেবল প্রথা পালন করেছেন মাত্র। কারণ যাই হোক, বিরহের পদে গোবিন্দদাসের দুর্বলতা স্বীকার না করে উপায় নেই।

পদাবলী সাহিত্যের লুপ্তি ও সংকলন গ্রন্থের প্রকাশ :

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সৃষ্টির উৎসে টান পড়ে, বিস্ময় সরে যায় জীবনের কেন্দ্র থেকে। এই সময় সৃষ্টি-শক্তি হয়ে যায় বন্ধ্যা। সৃষ্টি প্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষ্য করি পুরাতনের অনুকরণ,—পুরাতন সৃষ্টির কাঠামোর উপরে দাগা বুলোনো। থাকে না সেখানে প্রাণের স্ফূর্তি। ১৭শ শতকের মধ্যভাগ থেকে উষরতার যুগ এল পদাবলী-সাহিত্যে। প্রেমের অপরোক্ষ অনুভূতি আর ছিল না। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন

মানুষকে করে তুলেছিল কিছুটা বস্তুনিষ্ঠ—অন্তরের সহজ আনন্দানুভূতি হয়ে পড়েছিল সংশয়াচ্ছন্ন। কাজেই সৎসৃষ্টি আর সম্ভব ছিল না। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলা মানুষের জীবনের সঙ্গে সহজ যোগ হারিয়ে ফেলেছিল। তাই এই সময় যা রচিত হল তাতে দেখি কলাকৌশলের ছাপ স্পষ্ট। এই সব রচনা রসিকচিত্ত জয় করতে পারে না। অবশ্য এই কালে বৈষ্ণবপদ বিভিন্ন ব্যক্তি সংকলন করেছেন। জাতি আপন চিৎপ্রকর্ষকে সংকলন গ্রন্থে ধরে রেখেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :—(১) বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর "ক্ষণদাগীত চিন্তামণি"। এতে ৪৫ জন কবির প্রায় ৩০০শ পদ সংকলিত হয়েছে। সংকলনে বিশ্বনাথের নিজের ৪০টি পদ আছে। সংকলন কাল ১৭০০ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৭০৪ খ্রীঃ। (২) নরহরি চক্রবর্তীর "পদ-সংকলন গ্রন্থ"। তিনি "গীতচন্দ্রোদয়" ও "গৌরচরিত্র-চিন্তামণি" নামে দুটি গ্রন্থে পদ সংগ্রহ করেছেন। (৩) রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃত সমুদ্র"। ১৭২৫ খ্রীঃ কাছাকাছি পদ সংকলিত হয়েছে। এর পদ সংখ্যা ৭৪৬টি। (৪) বৈষ্ণবদাসের (গোকুলানন্দ সেন) "পদ-কল্পতরু"। এতে ১৪০ জন কবির ৩০০০ মতো পদ সংকলিত হয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় সংকলন গ্রন্থ। এই সংকলন গ্রন্থগুলো বাঙালীর সাহিত্যকৃতিকে রক্ষা করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলী ও গীতিকবিতা :

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—"বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।" গীতি কবিতায় সামান্য পরিসরে তীব্র সংহত এবং নিটোল ভাবে কবি ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সকলের করে প্রকাশ করেন। কবির নিজস্ব দৃষ্টিতে অভিষিক্ত হয়ে বস্তুর স্বীকৃত সাধারণ প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে থাকে। কবি এখানে এমন শব্দ চয়ন করেন যা সহজেই উচ্চার্য এবং তার মধ্যে সঙ্গীতের রেশ থাকে। কবির নিজের ভাল-লাগা মন্দ-লাগাটাই বড় কথা।

বৈষ্ণব কবিতায় গীতি কবিতার সব কয়টি লক্ষণ আছে। সেই দিক থেকে বৈষ্ণব পদাবলী সার্থক গীতি-কাব্য বলে গৃহীত হতে পারে। তবে একটি বস্তুর অনুপস্থিতি আধুনিক গীতি কবিতার সঙ্গে তার পার্থক্যের সীমারেখাটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এইটি হল কবির ব্যক্তিচিত্তের প্রকাশ তীব্র নয়। কবিরা গোষ্ঠীচেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁরা যা কিছু বলেছেন সব রাধা-কৃষ্ণের মুখাপেক্ষিতায়। তাঁদের নিজস্ব ভাল-লাগা মন্দ-লাগার কথা অনেকাংশে চাপা পড়ে গেছে। পাঠক এবং কবির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের উপস্থিতি উভয়ের

যোগের প্রত্যক্ষতাকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। এই সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বৈষ্ণব কাব্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতি কাব্য রূপে গৃহীত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে "সখি কি পুছসি অনুভব মোয়", "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু", "মন্দির বাহির কঠিন কপাট", "বঁধুয়া কি আর কহিব আমি", "যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি", "আঙ্কল প্রেম পহিল নাহি জানলুঁ" ইত্যাদি পদগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পদগুলো গীতিপ্রাণতায়, রোম্যান্টিকতায়, গূঢ় অনুভূতির প্রকাশে এবং প্রকাশ সৌষ্ঠবে বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে গৃহীত হতে পারে।

বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্যাবেদন ও শিল্পরীতি :

সমালোচক হাডসন সাহিত্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন :—"We care for literature primarily on account of its deep and lasting significance. A great book grows directly out of life." বৈষ্ণব পদাবলীর সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ বৈষ্ণব কবিরা অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-লীলার কথা বলতে গিয়ে প্রাকৃত জীবনকে উপেক্ষা করেন নি। লৌকিক জগতের নরনারীর প্রেম-লীলার আধারে তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা বর্ণনা করেছেন। প্রেমের বিচিত্র প্রকাশে, পরিবেশ সৃষ্টিতে লৌকিক জগৎ বারবার ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছে। প্রেমের পরস্পর সানুরাগ আকর্ষণ, ছদ্ম অবহেলা, অভিসার, মান, বিরহ, ভাব-সম্মিলন ইত্যাদির রসোজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ণব কাব্যে। পরকীয়া প্রেমের আধারে এই প্রেমের স্বরূপ আরও দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। যেহেতু মানবচিত্তের স্থায়িভাব বিভাবাদির সংযোগে রসত্ব লাভ করেছে, সেইজন্য তার মানবিক আবেদন ও কাব্য-মূল্য এত গভীরভাবে আমাদের অভিভূত করে।

প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়ে দেহচেতনারই প্রাধান্য। কামের থেকেই প্রেমের জন্ম। কামের অগ্নিশুদ্ধ রূপই হল প্রেম। বৈষ্ণব কবিরা সেই কথা জানেন। কবিরা এখান থেকেই যাত্রা সুরু করেছেন। ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে তা দেহ-চেতনাকে ছাড়িয়ে গেছে—মানসভোগের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এই পথ পরিক্রমায় কবিরা দেহ-মন ঘটিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেছেন। মাটিকে তাঁরা কোথাও গোপন করেন নি—আবার বাড়াবাড়িও করেন নি, ইঙ্গিত মাত্রে ছেড়ে দিয়েছেন,—সৌন্দর্যের মধুচক্র রচনা করেছেন। তাঁরা রাধাকৃষ্ণকে পরিচিত পৃথিবীর পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছেন অপ্রাকৃত

বৃন্দাবনে। বর্ষার ভ্রুকুটি ভয়াল পিচ্ছিল পথ, শারদ-পূর্ণিমার কৌমুদী-প্লাবন, বসন্তের রক্তরাগ-রঞ্জিত পথ, শাশুড়ী-ননদের তাড়না-গঞ্জনা, সমাজের ধিক্কার ইত্যাদি পরিচিত পৃথিবী বৈষ্ণব পদাবলীতে কাব্য-রূপ ধারণ করেছে। পৃথিবীর যে রূপটাকে আমরা প্রতিদিন দেখি, যে ঋতুচক্রের আবর্তন অজ্ঞাতে আমাদের মধ্যে নানান ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে চলেছে তাকে আমরা সব সময় বুঝতে পারি না। কারণ, হয় আমাদের চিত্তবৃত্তি তৎসম্পর্কে অসাড় হয়ে থাকে নয় ত অতি পরিচয়ের অবজ্ঞায় তাকে উপেক্ষা করে চলি। বৈষ্ণব কবিরা সেই উপেক্ষার আবরণ আমাদের চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন, আমাদের অসাড় চিত্তবৃত্তিকে সজাগ করে দিয়েছেন। পরিচিত পৃথিবী এবং মানুষের ভিতরে কত রূপ, রস সঞ্চিত হয়ে আছে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আমরা সেই রূপ দেখে, রস আস্বাদন করে নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করেছি। এর জন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই—কেবল কাব্যবোধটুকু থাকলেই যথেষ্ট। এইখানে বৈষ্ণব কাব্যের সার্বভৌম আবেদন—বৈষ্ণব পদাবলীর কাব্য হিসাবে সার্থকতা। এই অর্থে বৈষ্ণব পদাবলী "Criticism of life"—তা আমাদের জীবনের সঙ্গে এত বেশি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে রক্তকণিকার ভিতরে দোলা দিয়েছে যে প্রাকৃত জীবনে প্রেমঘটিত ব্যাপার দেখলেই পদাবলীর পঙক্তি উদ্ধার করে হয় সমর্থন করি, নয় ত তির্যক কটাক্ষ করি। বৈষ্ণব পদাবলীর সার্বভৌম আবেদনের ফল হিসেবে এইটা গণ্য হতে পারে।

এবারে বৈষ্ণব কবিতার শিল্পরূপের বিচার করা যেতে পারে। বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের কবি অভিজ্ঞতাকে কি ভাবে শিল্পায়িত করেছেন এবং তা কতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে সেইটে হল শিল্পের বিচার। কবিতার বিচারে নিছক ভাবটাই শেষ কথা নয়—দেখতে হবে ভাবের রূপসৃষ্টি হল কি না। কবিতা হল শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদির প্রাণিক সংযোগে সৃষ্ট বাক্-প্রতিমা,—অভিজ্ঞতার প্রাত-রূপায়ণ। এই দৃষ্টিকোণের বিচারে বৈষ্ণব কবিতার উৎকর্ষ কিছু কম নয়। দু'চারটে দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বিদ্যাপতি রাধার রূপ বর্ণনা করে লিখেছেন—"মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু।" কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চমকানি। মুহূর্তে আবির্ভূত—নিষ্ক্রান্তির সংকেতে সচকিত। নিমেষের মধ্যে চোখ ঝলসে দেয়। গৌরকান্তি রাধা নীলাম্বরী শাড়ি পরেই বেরিয়েছিলেন, নইলে মেঘ ও বিদ্যুতের প্রসঙ্গ এল কেন? কৃষ্ণ নিমেষমাত্র তাঁকে দেখেছেন। আর নিমেষেই রূপ পাঁজর

ফেটে বসেছে—"হৃদয়ে শেল দেই গেল।" রূপতৃষ্ণার জ্বালায় স্পর্শ যেন পাই। দর্শনেন্দ্রিয় এবং ত্বগেন্দ্রিয়ের কাছে যুগপৎ আবেদন রেখেছে। প্রতিমাটি গড়ে উঠেছে ঐ দুইটি ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপর ভর করে। কিন্তু আলাদা আলাদা খোপে বিভক্ত নয় ঐ অভিজ্ঞতা। এক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা আপন আবেগে রূপান্তরিত হল আরেক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায়। মূলতঃ ব্যঞ্জিত হল রূপতৃষ্ণার আবেগ।

আরও লক্ষণীয়, কবি কৃষ্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে রাধার রূপ দেখছেন এবং কৃষ্ণের চিত্তের উপর তার প্রতিক্রিয়া ব্যঞ্জিত করেছেন। কবির দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুনিষ্ঠ। আর মূল ধর্মে কবিতাটি বস্তুনিষ্ঠ হয়েও হয়েছে গীতোচ্ছল।

বিদ্যাপতি রাধার মাথুর বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর— জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।"

এই কবিতায় বিরহ-বেদনার রাজসিকরূপ দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের আশ্রয়ে রূপায়িত হয়েছে। ঘনঘোর বর্ষা, সূচীভেদ্য অন্ধকার, বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা নৃত্যশীল রূপ, ময়ূরের পেখম তুলে নাচ, যেন চোখে দেখি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বজ্রপাতের শব্দ, দাদুরী, ডাহুকীর মিলনানন্দের কলরবের ধ্বনি-সংবেদনা। আর রাধার মদনার্ত যন্ত্রণা যেন স্পর্শ করি। সব মিলে বেদনার ঐশ্বর্যরূপকে ব্যঞ্জিত করেছে। দুঃখ যে কত রাজসিক মূর্তি ধরতে পারে তার প্রমাণ এই কবিতাটি। এই কবিতাটির গোড়ায় আছে বেদনার ঐশ্বর্যরূপের ভাবনা, তাই সাবয়ব হয়েছে অমন বাক্-প্রতিমায়। এই কবিতা

আবৃত্তি করে সকলকে শোনাবার যোগ্য। ছন্দের মধ্যে গরগর ধ্বনি যেন নাভিকুণ্ড থেকে উৎসারিত। শব্দযোজনা অত্যাশ্চর্য। শব্দ তার সামান্য অর্থকে ছাড়িয়ে আচমকা দ্যুতি সৃষ্টি করে। যেমন, 'ছাতিয়া' কথাটির আভিধানিক অর্থ হল বুক, বুকের মাপ (কথায় বলে ৪০ ইঞ্চি বুকের ছাতি)। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে অন্য শব্দের সাহচর্যে, কবিতার ভাবাবহে অর্থ দাঁড়ালো বেদনার ভারে হৃদয় ভেঙ্গে যাওয়া। শব্দের মধ্যে এই রকম গুণসঞ্চার মহৎ কবিতেই সম্ভব। দাদুরীর ডাক আদৌ স্ব-প্রকৃতিতে শ্রুতিমধুর নয়। কিন্তু কবিতার বিশেষ প্যাটার্নের মধ্যে স্থাপিত হয়ে কি অসামান্য দ্যুতি লাভ করেছে। আসল কথাটা হল এই যে কোনো শব্দ স্বভাব ধর্মে কাব্যও নয় অকাব্যও নয়। শব্দ কেবল অর্থকে প্রকাশ করে। শব্দ কাব্যত্ব লাভ করে প্রয়োগের গুণে, অন্য পাঁচটা শব্দের সাহচর্যে, বিশেষ ভাবাবহের উপযুক্ত অংশীদার হয়ে, ধ্বনি-সৃষ্টির যোগ্যতায়। কবিতা-বিচারে ঐ বিশেষ করণ-কৌশল অবহিত হলে শিল্পসুখ সম্ভোগ হয় স্বচ্ছন্দ।

এবার জ্ঞানদাসের একটি কবিতা নেওয়া যাক। কবিতাটি নিরাভরণ, মণ্ডনকলায় সমৃদ্ধ নয়। কবি বক্তব্যের নিজস্ব শুদ্ধ শক্তির উপরে নির্ভর করেছেন। কবিতাটি বর্ণনাধর্মী। কবিতাটি হল এই :

"সখি সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক রাজ॥
আঙিনা আওল সেহ।
হাম চললু গেহ॥
ও ধরু আঁচর ওর।
ফুয়ল কবরী মোর॥
ঢীট নাগর চোর।
পাওল হেমকটোর॥
ধরিতে ধরল তায়।
তোড়ল [illegible] যায়॥
চকোর চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥"

রাধিকা চলেছেন, পিছু পিছু একটু দাঁড়াবার জন্যে অনুনয়-বিনয় করতে করতে কৃষ্ণও চলেছেন। শেষে আঁচল ধরে টান। রাধার খোঁপা এলিয়ে গেল, রাধা খোঁপা সামলাতে ব্যস্ত, আর সেই ফাঁকে কৃষ্ণ একেবারে হাত দিলেন

'হেমকটোরে', তাতে অঙ্কিত হল কামনার নখরাঘাত। লুব্ধতার স্তর বিন্যাসী চিত্র। কবি ঋজু ভাষায় নিরলঙ্কৃতভাবে সব বর্ণনা করেছেন। কোথাও বর্ণনার ঐশ্বর্য নেই। সব মিলে ব্যঞ্জিত হয়েছে কামনার আবেগ, তার ভিতরে সঞ্চারিত মাধুর্য গুণ। 'চললু', 'ধরু', 'ফুয়ল' ইত্যাদি ক্রিয়া পদের ব্যবহার মাধুর্য গুণের সঞ্চার করেছে। এগুলো নিছক ব্যাকরণের সংজ্ঞা নয়—আবেগ সঞ্চারী শব্দ। আবার 'তোড়ল' শব্দটি কৃষ্ণের কামনার জ্বালাকে এবং নখরাঘাতজনিত রাধার দৈহিক জ্বালাকে প্রকাশ করেছে। বৈপরীত্যের ভিতর দিয়ে নাতিউচ্ছল ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধাকে ব্যঞ্জিত করেছে। ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধার প্রখর জ্বালার ধার কবি মেরে দিয়েছেন পূর্বে উল্লিখিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে এবং শেষ দুই পংক্তিতে। শেষের দুই পংক্তিতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ঐ নখরাঘাত কাঙ্ক্ষিত, সেইজন্য মধুরও বটে ; নইলে কৃষ্ণের প্রসঙ্গে চাঁদের উপমা আসত না। আসত না 'ঢীট' বিশেষণের অমন মধুর ব্যবহার। ব্যবহৃত হত না 'রসিক রাজ' কথাটি। অতএব একটি সুঠাম বাক্‌প্রতিমার প্রচ্ছদে ব্যঞ্জিত হয়েছে কবির আবেগ। একেই বলে ভাবের রূপসৃষ্টি।

প্রেমে সুখ আছে মনে করে রাধা কৃষ্ণের অনুরাগিণী হয়েছিলেন। কিন্তু এখন দেখছেন প্রেমে সুখের চেয়ে দুঃখ বেশি, বেদনা অতলান্ত। এই দুঃখ বহনেও কোন আপত্তি ছিল না যদি কৃষ্ণকে চিরকালের জন্য পাওয়া যায়। কিন্তু তা তো হবার নয়। তাই :

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥"

এখানে লক্ষ্য করি অতীত ও বর্তমানের বৈপরীত্য দ্যোতিত হয়েছে। অতীতের সব সুখ আনন্দ আজ অবসিত, স্তিমিত। এক সময়ে প্রেম-গীতি নিয়ত গুঞ্জরিত হত কানে কানে, আজ তা [illegible]। বিগত দিনের গতি-শীলতা এবং এখনকার গতি-ক্ষান্তির অদ্ভুত সংশ্লেষ। আমরা যেন দেখতে পাই বহু সাধের-গড়া ঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, রাধিকা তার সামনে বিষণ্ণ চিত্তে নতমুখে বসে আছেন। অতীতের স্মৃতিচারণা গানের সুরে উৎসারিত হচ্ছে। ইন্দ্রিয়-গম্য রূপ ও অশরীরী ভাবনার সমবায়ে গড়ে উঠা বাক্‌-প্রতিমায় ব্যঞ্জিত হয়েছে রাধার অতলান্ত বেদনা।

গোবিন্দদাস লিখেছেন :

"কানু বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।
ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলিকে সমাগমে কাঁপ॥"

রাধিকা কৃষ্ণকে আড় চোখে দেখেছেন, আনন্দিত হয়েছেন। আনন্দের সঙ্গে এসে মিলেছে লজ্জা। আড় চোখে একটু দেখা, বহু দিনকার মিলনলগ্নের মুখোমুখি হওয়ার উল্লাসে শারীর শিহরণ প্রতিমায়িত হয়েছে। উচ্ছ্বাস এবং লজ্জা, বুঝি বা তার সঙ্গে বহু দিনকার মিলন-বাসনার সমাগত মুহূর্তে উল্লাসের ভারে দেহ-মন-প্রাণের স্পন্দন একটি ছত্রে প্রতিমায়িত হল—"কেলিকে সমাগমে কাঁপ।"

অথবা, গোবিন্দদাসকৃত চৈতন্যদেবের রূপ বর্ণনা দেখা যাক :

"নীরদ নয়নে নীরঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব॥
কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম— কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজোর॥
চঞ্চল চরণ কমলদল ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহনিশি রহত অগোর॥
অকিঞ্চন প্রেম— রতনফল বিতরণ
অখিল মনোরথ পুর।"

সুঠাম একটি বাক্-প্রতিমা। চৈতন্যদেবের রূপের প্রচ্ছদে "রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিত" তত্ত্ব জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একটু বিশ্লেষণ করা যাক। কৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল চৈতন্যের চোখ দুটি যেন সজল মেঘের মতো অবিরল ধারা বর্ষণ করছে—এইটে প্রেমাশ্রু। মেঘের ধারাবর্ষণে গাছের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, মুকুলোদ্গমে রোমাঞ্চিত হয়। তেমনি প্রেমের আবির্ভাবে চৈতন্যদেবের মধ্যে নবমঞ্জরীর মতো বিচিত্রভাব ফুটে উঠেছে। এককালে যিনি

দুর্বধ নিমাই পণ্ডিত ছিলেন, তিনি প্রেমের সর্বপ্লাবিতায় নবজীবনবোধে উত্তীর্ণ হলেন। বর্ষার আবির্ভাবে কদম ফুল যেমন রোমাঞ্চিত হয়, প্রেমের আবির্ভাবে চৈতন্যদেব তেমনই রোমাঞ্চিত। অশ্রু, পুলক, স্বেদ তাঁর দেহে কি অপরূপ লাবণ্যই না সঞ্চার করেছে। মেঘ যেমন জলভার নিঃসৃত করে অন্তঃশীল আবেগ মুক্ত হয়, প্রেমের আবেগ তেমনই তরলায়িত হয়ে ঝরে পড়ছে নয়ন-নীর আর 'স্বেদ-মকরন্দ' হয়ে। এইটে চোখে দেখি, এর আবেদন দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে। এর পরেই কবির তরঙ্গায়িত আবেগ আধার খুঁজেছে অন্য প্রতিমায়। গৌরকান্তি চৈতন্যদেব এবার উপমিত হলেন "অভিনব হেমকল্পতরু"র সঙ্গে। কথিত আছে স্বর্গে কল্পতরু আছে। এই বৃক্ষের কাছে যে যা চায় সে তা-ই পায়। অবশ্য স্বর্গে যাওয়ার পুণ্য অর্জন করা চাই, বৃক্ষের কাছে প্রার্থনা করা চাই। কিন্তু চৈতন্যদেব "অভিনব হেমকল্পতরু"। এখানে 'অভিনব' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করবার মতো। 'অভিনব' শব্দটি কবিতার অনন্য পরিবেশে আভিধানিক অর্থকে ছাড়িয়ে গেছে, অনর্পিত বস্তু অযাচিতভাবে যিনি আচণ্ডালে দান করেন তিনি 'অভিনব হেমকল্পতরু'—এমনটি পূর্বে কখনো দেখিনি। এখানে চৈতন্যদেবের অনন্যতা। আর এই কল্পতরু স্থাবর নয়—এর কাছে কিছু চাইবার জন্যে পুণ্যের জোরে কাউকে আসতে হয় না, নিজের গুণে অযাচিতভাবে আদ্বিজচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করে বেড়ায়। যে যুগে সংস্কারের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল জীবন, নানারকম ভেদবুদ্ধির আল দিয়ে খুপরী-কাটা ছিল জীবন, সেই যুগে চৈতন্যদেবের এই প্রেম বিতরণ অভিনব বৈ কি—মানুষের অন্তরের প্রেমপিপাসার চরিতার্থ যিনি করেছেন তাঁকে 'অভিনব কল্পতরু' ছাড়া আর কি বলব? 'অভিনব' কথাটা এখানে আচমকা দ্যুতি সৃষ্টি করেছে যা আভিধানিক অর্থে পাওয়া যাবে না।

এই কবিতায় চৈতন্যদেবের হেমকান্তি নৃত্যশীলরূপ, ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট গুঞ্জনকারী ভ্রমরদের মতো প্রেমাকৃষ্ট ভক্তসম্প্রদায়ের মহাপ্রভুর স্তবগান যেন চোখে দেখি, কানে শুনি, ঘ্রাণ গ্রহণ করি। মোটের উপর এই বাক্‌প্রতিমায় দৃশ্য, ধ্বনি, ঘ্রাণ, স্বাদ বিচিত্র ইন্দ্রিয়জ [illegible]তাকে কবি অখণ্ডবোধে বেঁধে দিয়েছেন। সব কিছু মিলে চৈতন্যদেবের ভাবোন্মত্ত, করুণাঘন মূর্তি এবং চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাক্‌প্রতিমায় ব্যঞ্জিত হয়েছে মহাপ্রভুর করুণা, উদারতা, প্রেমভক্তি।

আরও একটু লক্ষ্য করবার আছে। কবিতার প্রথম অংশে 'বিকশিত ভাবকদম্ব' পর্যন্ত চৈতন্যদেব একা, তার পরেকার অংশে দেখি বহুজন পরিবৃত

শ্রীচৈতন্যকে। ভাব পরিমণ্ডল অনেক বিস্তৃত। অপ্রমেয় প্রেমের ধারায় কতজন বাঞ্ছিত ফল পাওয়ার জন্যে একটু স্নান করে নিজেকে শুদ্ধ করবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন,—'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। প্রেমের ভেদবুদ্ধি লোপকারী কি অপরিসীম ক্ষমতা!

একেই বলে আর্ট। কাজেই বৈষ্ণব কাব্য আস্বাদন করবার জন্য বৈষ্ণব হওয়ার কোন দরকার নেই। কেবল Art form চিনতে পারলেই হল। তাহলেই দেখব রূপ চেতনা, প্রেম বোধ, মনস্তত্ত্বের শিল্পায়িত রূপ বৈষ্ণব পদাবলী।

বাংলা কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব :

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব বাঙালীর অস্থিমজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তাই বাংলা কাব্য কবিতার উপরে তার সুগভীর প্রভাব পড়েছে। বৈষ্ণবের রাধামূর্তি কল্পনার প্রভাবে মঙ্গলকাব্যের উগ্রচণ্ডা দেবদেবীরা অনেকটা শান্তমূর্তি ধারণ করেছেন, শাক্ত পদাবলীর নৃমুণ্ডমালিনী, নরকপালধারিণী, ঘোরবর্ণা কালিকামূর্তি কান্তিময়ী হয়ে উঠেছেন—বলা চলতে পারে মধুর রসাশ্রিতা হয়ে উঠেছেন। অবশ্য 'মধুর রস' কথাটি আমরা সাধারণ অর্থে ব্যবহার করছি—বৈষ্ণবের পারিভাষিক অর্থে নয়। বাংলা কাব্যের দুর্দিনের সময় স্বভাব কবিরা বৈষ্ণব কাব্যের কাঠামোটিকে আশ্রয় করেই কবিগান রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণব কাব্যে যে বস্তুকে শোভনভাবে বলা হয়েছে কবিগানে তাই খানিকটা রূঢ়তা নিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। বাংলা কাব্যের দুর্যোগের সময় কবিওয়ালারাই বৈষ্ণব কাব্যের ভাবনার উপর ভর করে ক্ষীণতোয়া বাংলা কাব্যের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখে আধুনিক গীতিকাব্যের ভাব-মোহনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন।

বাঙালীর জীবনে রাধাকৃষ্ণের ভাব-স্মৃতি এমন ওতপ্রোত যে আধুনিক যুগের উদ্গাতা মধুসূদনকে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য রচনার কালে রাধাকৃষ্ণ নামের ভাবানুষঙ্গের আড়ালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এছাড়াও তাঁর রচনাবলীর ভিতরে উপমা, অলঙ্কার চয়নে, ভাবের-উদ্দীপনে বৈষ্ণব কাব্যের ভাবস্মৃতি নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের দৃষ্টিভঙ্গীর আশমান-জমিন ফারাক্ রয়েছে। তবুও অরূপ-রসিক কবি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেয়েছেন বৈষ্ণব কাব্যের রূপকলাকে আত্মসাৎ করে। রবীন্দ্র কাব্যের ভাষা গোপনে পদাবলীর ভাষাকে অনুসরণ করেছে। আমরা বলতে চাইছি যে রবীন্দ্র কাব্য বৈষ্ণব কাব্য থেকে স্বরূপ ধর্মে পৃথক হলেও অনেকাংশে রূপের দিক থেকে এক হয়ে গেছে। একটু

ঘুরিয়ে বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের ভাষার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আস্বাদনের প্রাথমিক অনুশীলনের যথার্থ ক্ষেত্র বৈষ্ণব পদাবলী। বাঙালীর আত্মপ্রকাশের ভাষা হিসাবে বৈষ্ণব কাব্যের মূল্য এত বেশি। একে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

এছাড়া কবি করুণানিধান, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির কাব্যে বৈষ্ণব ভক্তের রসাতুর মনোভঙ্গীটি কোথাও সৌন্দর্য পিপাসায়, কোথাও বা দাস্যভাবে, কোথাও আত্মনিবেদনের বিনীত নম্রতায় আপন প্রভাব মুদ্রিত করে দিয়েছে। এমন বিদ্রোহী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বৈষ্ণবের অভিমান তত্ত্বটি আত্মসাৎ করে কাব্য রচনা করেছেন। প্রত্যাখ্যানের রূঢ়তা যে গভীর অনুরাগের ছদ্মবেশ সেইটি এই কবির কাব্যে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব ও রূপের প্রভাবের যে সামান্য আলোচনা করলাম তার উপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে বৈষ্ণব পদাবলীর অনতিক্রম্য প্রভাবের জন্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পদাবলী সাহিত্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

● ষষ্ঠ অধ্যায় ●

শাক্ত পদাবলী

শাক্ত পদাবলীর উৎস :

শক্তি দেবতার কল্পনা এবং আরাধনা বাংলা দেশের মাটির সম্পদ। আর্যদের আগমনের বহু পূর্ব থেকে বাংলা দেশের বিশেষ সাধন পদ্ধতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে মাতৃভাবের প্রাধান্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলার ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার, সমাজ-সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন মাতা। আমাদের বক্তব্যের প্রামাণ্য দলিল হল তন্ত্রশাস্ত্র। আজ অবশ্য তন্ত্রের অবিমিশ্র, আদিম রূপটি লুপ্ত হয়ে গেছে। আর্য আগমনের পরে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আর্যদের দর্শন-তত্ত্ব-ধর্মের সঙ্গে এই দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে তন্ত্রের "দর্শন বা তত্ত্ব বিরহিত" আদিম রূপটির পরিমার্জনা সাধিত হয়েছে। আর্যেরা তন্ত্রের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বিষয়কে গ্রহণ করে নিয়মবদ্ধ করেন। তন্ত্র-সাধনা এই ভাবে আর্যধর্মের স্বাঙ্গীভূত হয়ে পড়ে এবং শক্তিবাদ বেদ-পুরাণে যেমন, পরবর্তীকালে, গৃহীত হয়েছে তেমনই বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ধর্মের সাধন মার্গে নানা ভাবে অনুস্যূত হয়ে নানা শাখার সৃষ্টি করেছে। এর থেকে এইটা অন্তত: প্রমাণিত হয় তান্ত্রিক সাধনা বাঙালীর মজ্জাগত। এই সাধনার দ্বারা বাঙালী ভাবকে বস্তুরূপে আস্বাদন করতে চেয়েছে। তত্ত্বের সত্য নয়—জীবন সত্যরূপে ভাবকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছে। এই দিক থেকে তন্ত্রশাস্ত্র ফলিত বিজ্ঞান। এই বিষয়ের বিস্তৃত বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই—প্রয়োজনও নেই। বাঙালী চরিত্রের ধাতুগত প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়ে পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

উল্লিখিত সংমিশ্রণের ফলে সেই যুগেই শক্তিবাদের একটি নতুন ধারার প্রবর্তন হয়। একে বলা যেতে পারে "পৌরাণিক শক্তিবাদ"। পৌরাণিক শক্তিবাদের সাহিত্যিক অভিব্যক্তি মঙ্গলকাব্যগোষ্ঠী। এরই পাশাপাশি চলে এসেছে "তান্ত্রিক শক্তিবাদ"। এই দুইটি ধারার মধ্যে মৌল পার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় ধারাটি বাংলা দেশের অনন্যপর স্বাতন্ত্র্যে প্রোজ্জ্বল। শাক্ত পদাবলীর উৎস-মূলে রয়েছে দ্বিতীয় ধারাটি। রামপ্রসাদের কবি কর্মে শক্তি তন্ত্রাশ্রিত ধর্মচেতনার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে। এর পক্ষে আমাদের যুক্তি-প্রমাণ হল এই যে, তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তির অবরোহণ তত্ত্ব, সৃষ্টির মূল কারণ বলে বর্ণিত

হয়েছে এবং ক্রিয়াকাণ্ডে পুনরায় শুদ্ধ-শক্তির স্তরে আরোহণ উপায় বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল সাধন মার্গ, যার দ্বারা জীব মোক্ষ লাভ করে। এই সাধন মার্গে পঞ্চ-ম-কার সাধনা, অন্তর্যাগ, মুদ্রা-প্রদর্শন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। রামপ্রসাদ প্রথমে সিদ্ধসাধক পরে কবি। তাঁর কবি কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে উপাসনাতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। একে বলা যেতে পারে:—"Ritual is an art, the art of religion. Art is the outward material expression of ideas intellectually held and emotionally felt. Ritual art is concerned with the expression of those ideas and feelings which are specifically called religious. It is a mode by which religious truth is presented and made intelligible in material forms and symbols to the mind." ব্যাপারটা ধর্মীয় হলেও যেহেতু "emotionally felt" এবং "made intelligible in material forms and symbols to the mind."—সেইজন্য তা কাব্য হয়ে উঠেছে—"It appeals to all natures passionately sensible of that Beauty…।"

আমরা এখন পূর্ব সূত্র ধরে বলতে পারি যে শাক্ত সঙ্গীত বলে সেই কবিকর্ম গৃহীত হতে পারে যার প্রেরণামূলে রয়েছে শাক্ত দর্শন ও শাস্ত্রাচারের নৈষ্ঠিক উদ্বর্তন। শক্তি বিষয়ক উল্লেখ মাত্রেই শাক্ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এই সংগীতগুলোকে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্ত পদাবলী বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাই বলে এমন ধারণা করা যুক্তিযুক্ত হবে না যে শাক্ত পদাবলী বৈষ্ণব পদাবলীর একান্ত অনুস্মৃতি বা তার আংশিক ঐতিহ্যগত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। যদিও আমাদের এমন ধারণা জন্মে গেছে যে মঙ্গলকাব্যের বলদৃপ্ত, স্বৈরাচারী দেবী কালক্রমে বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে শাক্ত পদাবলীতে স্নেহময়ী জননীতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে রামপ্রসাদের গীতি-মূর্চ্ছনা ঝঙ্কৃত হয়েছে। রামপ্রসাদ সজ্ঞানে বৈষ্ণব গীতির রূপকল্প, ছন্দ এবং বৃন্দাবন লীলার অনুকরণে ভাগবতী লীলা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শাক্ত পদাবলীর উদ্ভবকাল এইরূপ ধারণার পরিপোষক নয়। শাক্ত পদাবলীর উদ্ভবকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। এই সময় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য জীবনীরস হারিয়ে ফেলেছিল। যার নিজের ভিতরে প্রাণশক্তি নিঃশেষিত সে অপরকে কি ভাবে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করবে? দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব পদাবলীর ঐশ্বর্যের যুগে পৌরাণিক শক্তিবাদ নির্ভর মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে এবং তার উপরে চৈতন্য

প্রেমধর্মের প্রভাবও পড়েছে। অথচ পাশাপাশি তান্ত্রিক শক্তিবাদের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু তার মর্মমূল ধরে নাড়া দিতে পারল না কেন? বরঞ্চ বলা যেতে পারে যে, তান্ত্রিক শাক্ত ধর্মের এক অংশ অভিব্যক্ত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে, আর এক অংশ অভিব্যক্ত হয়েছে শাক্ত-সঙ্গীতে। এই দুয়ের মধ্যে যোগ অনুমান করা যেতে পারে এইভাবে যে মঙ্গলকাব্যের চৌতিশায় পার্থিব কামনায় দেবীর যে স্তব-স্তুতি করা হয়েছে শাক্ত-সঙ্গীতে তাই পার্থিব কামনা-বিরহিত ভাবে মুক্তি কামনায় গীতি-মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কৃত হয়েছে। আমরা বলতে চাই একই বিষয়ের দুইটি স্বতন্ত্র ধারার প্রকাশ ঘটেছে দুই ধরণের কাব্যে। এই দুইটির মধ্যে সগোত্রতা থাকলেও চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে।

আমাদের কথার সারসংক্ষেপ হল এই যে শাক্ত পদাবলীর উৎসমূলে রয়েছে তান্ত্রিক শক্তিবাদ। সাধক কবি সাধনালব্ধ গভীর অনুভূতি প্রকাশের আলম্বন হিসাবে আত্মসাৎ করেছেন বৈষ্ণব পদাবলীর আঙ্গিক। সাধক কবির অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা তৎকালীন যুগজীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত হয়েছে।

শাক্ত পদাবলীর সামাজিক পটভূমি :

অষ্টাদশ শতাব্দী শাক্ত পদাবলীর উন্মেষ ও সমৃদ্ধির কাল। এই কাল পরিচয় নিলে দেখা যাবে যে ইতিহাস যুগান্তরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে প্রাদেশিক শাসন কর্তারা স্বাধীন হয়ে পড়েন। মুর্শিদ কুলি খাঁ এই সুযোগে বাংলা বিহার উড়িষ্যার স্বাধীন নবাব হয়ে বসলেন। দিল্লীকে নামমাত্র কর দিয়ে তিনি স্বাধীন ভাবে চলতেন। এই ধারা সিরাজদ্দৌলা পর্যন্ত চলে এসেছে। নবাবেরা সকলেই ছিলেন ব্যভিচারী এবং উচ্ছৃঙ্খল। নবাবেরা দিল্লীর কর জোগাবার জন্য এবং নিজেদের বিলাসিতার অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজা-জমিদারদের উপর অত্যাচার করতেন। তেমনই রাজা-জমিদারেরা প্রজাকে শোষণ করে নবাবের চাহিদা মেটাতেন। শোষণ ও বঞ্চনার ফলে দেশের সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হল অতি বৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ, বর্গীর হাঙ্গামা, বিদেশী বণিকদের শাঠ্য-ষড়যন্ত্র। বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের কূট বাণিজ্যিক বুদ্ধি, নির্মমতা এবং বর্গীর হাঙ্গামায় দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়েছিল। সাধারণ মানুষের হাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থও ছিল না। দেড় টাকায় এক মণ মোটা চাল পাওয়া যেত ঠিকই

কিন্তু ঐ দেড় টাকার সম্বল কারও ছিল না। বাঙলার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প সব তখন বিদেশী বণিকের করতলগত। সেকালে যাঁরা উচ্চবিত্ত ছিলেন তাঁরাও তখন নতুন গড়ে উঠা শহরের দিকে ছুটেছেন বণিকদের আর্থিক আনুকূল্যের লোভে। ফলে গ্রামীণ সমাজে যে ভাঙনের সৃষ্টি হল তা আজ পর্যন্ত জোড়া লাগে নি। গ্রামে-বাঁধা দেশের প্রাণরস ক্রমে শুকিয়ে গেল। গোষ্ঠী-জীবন ভেঙে পড়েছে, স্বার্থনিষ্ঠ অন্ধ ব্যক্তি-জীবনের সূত্রপাত ঘটেছে, অথচ সুপরিমার্জিত 'ব্যক্তিত্বে'র আবির্ভাব ঘটে নি। বাঙালীর জীবনধারা হাজা-মজা-খাতে কাত্রে কাত্রে পা টেনে টেনে চলেছে। যে গ্রামীণ সমাজ এতদিন বাংলা সাহিত্যের প্রাণের রসদ যুগিয়ে এসেছে সেই সমাজের ভাঙন সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দেখা দিয়েছিল, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিপর্যয় তখন থেকেই সুরু হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার পূর্ণতা সাধন এবং তারই সঙ্গে দেখা দিল ভবিষ্যতের সঙ্কেত। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বর্তমানের বিনষ্টির হাতে ধরে আসে ভবিষ্যতের অঙ্কুর। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

রাষ্ট্রের, সমাজের সামগ্রিক বিপর্যয়ের কালে বাঙালীর ভাব-জীবনের রূপান্তরণ ঘটেছিল। বাস্তব জীবনের দারিদ্র্য, মৃত্যু, কঠিন সমস্যা, রূঢ়তাকে বাস্তবিক-ভাবে কর্মের দ্বারা বশীভূত করতে না পেরে বাঙালী ভাব-জীবনে তাকে জয় করতে চেয়েছে। এইটে বাঙালীর চরিত্র ধর্ম। বাঙালী চরিত্রে যেমন দুর্বল, ভাবুকতায় ও মেধায় তেমনই শক্তিমান—যেমন কর্মকুণ্ঠ, তেমনই কল্পনাকুশল। বাঙালী যেমন স্বল্পসুখবিলাসী তেমনই আত্মপরায়ণ। বাস্তবের মোকাবিলায় যেমন দুর্বল, অবাস্তবের সাধনায় তেমনই আবেগে আত্মহারা। মজ্জাগত আলস্য এর কারণ। আজ পর্যন্ত এমন কোনও বাঙালীর নাম করা যাবে না যিনি কয়েক পুরুষের বাসযোগ্য দৃঢ় বসতবাটী নির্মাণ করেছেন। কিন্তু ভাবের জগতে বাঙালীর অপরাজেয়তা, মননে বাঙালীর নেতৃত্ব কে অস্বীকার করবে? কাজেই বাস্তব জীবনের সমস্যাকে চরিত্রবলে বশীভূত করতে না পেরে স্বাভাবিক চরিত্র ধর্মের প্রেরণায় জীবন ও জগৎকে ভাবমন্ত্রে শোধন করে ইন্দ্রিয়গুলোকে অতীন্দ্রিয় রসপানের যন্ত্র করে তুলেছে, কখনও বা বস্তুর [illegible] অপরোক্ষ করে আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করতে চেয়েছে। প্রথমটির প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্য, সেখানে আছে অতি সূক্ষ্ম আত্মবিগলিত ভোগ; দ্বিতীয়টির নজীর শক্তি-সাধনা, সেখানে আছে অপ্রমত্ত বিষয়-সেবা। এই দুই-ই ভোগ, তবে বাস্তবিক পরিদৃশ্যমান স্থূলভোগ নয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে ভোগবৃত্তি মানুষের মূল কারিকাবৃত্তি। এই বৃত্তিই মানুষকে বিশাল জগতের বিচিত্র কর্মসংঘাতের উত্তাল তরঙ্গমালায়

সঙ্গে সংযোজিত রেখেছে। এরই আঘাতে-প্রত্যাঘাতের দোটানার মধ্যে পড়ে আমাদের পাওয়া, না-পাওয়ার স্থূল দুঃখভোগ আমাদের করতে হয়। তাই এই ভোগবৃত্তিকে যদি এমন ভাবে শোধন করে নেওয়া যায়, প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত করা যায় যার ফলে ব্যবহারিক সুখ-দুঃখের অভিঘাত তুচ্ছ করা যাবে। এই মনোভঙ্গী, বিশেষ ধাতু-প্রকৃতি বাঙালী সাধককে জগৎ ও জীবনের মূল কারণ শক্তির আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কালী নামের কেল্লায় বসে সাধক কবি বাস্তবিক দুঃখ, দারিদ্র্যকে জয় করতে চেয়েছেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সাহিত্যিক ফসল শাক্ত পদাবলী।

এখানে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আলোচ্য শতাব্দীতে শাক্ত সাহিত্যের সূত্রপাত এবং সমৃদ্ধি কেন হল? বাস্তব জীবনের নৈরাজ্যকে ভাব-জীবনে জয় করবার বৈষ্ণবীয় পন্থা কেন বাঙালী বর্জন করল? বাঙালীর সামনে বৈষ্ণব সাধনার নজীর তো ছিলই। আমাদের মনে হয় যুগধর্মের আমোঘ নিয়মে মানুষের বাস্তববোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল, বৈষ্ণবের ভাব-বৃন্দাবনে চিরকালের কিশোর-কিশোরীর প্রেমলীলার ভিতরে সেদিনকার মানুষ যুগ-সমর্থন লাভ করে নি। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব সাধনায় পূর্বের বলিষ্ঠতা ছিল না, সহজিয়া সম্প্রদায়ের দেহ-সর্বস্বতা, কামুকতা, লাম্পট্য সর্বসাধারণের মনে নৈতিক বিমুখতা সৃষ্টি করেছিল। বিশুদ্ধ কান্তা-প্রেমের অসামাজিক পরিণাম জনচিত্তের অনুমোদন লাভ করে নি। তাই মানুষ এমন একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে চেয়েছে যেখানে প্রেম আছে কিন্তু ব্যভিচার নেই। মাতৃভাব প্রধান বাঙালী সমাজে পরকীয়া প্রেম অপরিচিত লোকের বার্তা বহন করে এনেছিল ঠিকই, ক্ষণিকের জন্য বাঙালীর চিত্তকে অভিভূত করেছিল ঠিকই, কিন্তু এই প্রভাব, উন্নত অধ্যাত্ম তত্ত্ব অচিরে দুর্বল ভাবালুতায় পরিণতি লাভ করায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, হাওয়া উল্টো দিকে বইতে লাগলো। বিশেষ কাল-লগ্নে প্রেয়সীকে স্থানচ্যুত করে মাতা জীবনের কেন্দ্রভূমিতে অধিষ্ঠিতা হলেন। মাতার এই প্রত্যক্ষ প্রভাব অধ্যাত্ম-জীবনে সম্প্রসারিত হল।

দ্বিতীয়তঃ তন্ত্র সাধনার গোপ্য প্রকৃতির জন্য তার দিব্যভাব সাধারণের কাছে অপরিচিত ছিল। পক্ষান্তরে সেদিনকার রাজা-রাজড়ারা শক্তি সাধনার অজুহাতে ব্যক্তিগত নগ্ন লালসা চরিতার্থ করতেন। ফলে তন্ত্র সাধনা সম্পর্কে সামাজিক চিত্তে ভয়াবহ বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। সমাজের অধঃপতন, মানুষের অসহায়তা, মাতৃ-আরাধনার বিকৃতি সিদ্ধ সাধকের তপোভঙ্গ ঘটালো। তন্ত্রশাস্ত্রের দিব্যভাবকে উন্মোচন করবার, মানুষকে আশ্বস্ত করবার প্রতিশ্রুতি

নিয়ে সাধক কবি অভীঃ মন্ত্র সঙ্গীতের শতধারায় উৎসারিত করে দিলেন। দুঃখ জয়ের অভিনব পন্থার নির্দেশ দিলেন। মাতৃ-মহাভাবের সাধনার কথা শোনালেন। কায়-মনঃ-বাক্যে মাতৃনির্ভরতা, সৃষ্টির আদি কারণকে ধ্যান দুঃখ জয়ের উপায়। দেহস্থ শক্তিকে সংকর্ষণ করে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ ঘটে। এই কথা তান্ত্রিক সাধকেরা শোনালেন।

তাই বলা যেতে পারে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রিক-সামাজিক পরিস্থিতি, দুঃখের অভিঘাত, সামাজিক চেতনা, সাধকের আত্মপৌম্য বোধে সকলের সঙ্গে ঐক্যবোধ এবং তজ্জনিত নিপীড়িত মানুষের দুঃখ নিরাকরণের আকৃতি শাক্ত পদাবলীর উৎসমুখ অবারিত করেছিল।

শক্তিতত্ত্ব ও শাক্ত পদাবলী :

শাক্ত পদাবলীর বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব মোটামুটিভাবে জেনে নেওয়া দরকার। কারণ শাক্ত পদাবলীর "ব্রহ্মময়ী মা" "মা কি ও কেমন" "ইচ্ছাময়ী মা" "করুণাময়ী মা" "জগজ্জননীর রূপ" শীর্ষক রচনাতে শক্তিতত্ত্বের এবং তন্ত্র সাধনার আভাস ব্যঞ্জিত হয়েছে ; এমন কি "আগমনী ও বিজয়া" অংশে একই তত্ত্বের লীলাত্মক দিকটি বর্ণিত হয়েছে। তাই বর্তমানে আমরা শক্তিতত্ত্বের মূল কথাটি সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব।

তন্ত্র মতে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আদি কারণ—শক্তি। শক্তি একাধারে বিশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ। সৃষ্টির মধ্যে শক্তির যে প্রকাশ সেইটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য —এইটে বিশ্বাত্মক ; আবার একই শক্তির ক্রিয়া যখন গুপ্তভাবে চলে এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য, কেবল সাধক পুরুষের-যোগগম্য তখন সেইটি বিশ্বোত্তীর্ণ। শিব ও শক্তি অবিনাবদ্ধ, একে ছেড়ে অপরের অস্তিত্ব নেই। শিব ও শক্তি যখন অবিনাবদ্ধভাবে যুক্ত থাকেন তখন তাকে বলা হয় সামরস্যে অবস্থান, এই সময় শক্তির ক্রিয়া গোপ[illegible]াজ করতে থাকে। এই বস্তু বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, সাধকের প্রজ্ঞায় তা আভাসিত হয় মাত্র। শক্তির এই নির্বিশেষ, নিরুপাধিক অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নি[illegible] অব[illegible] হল ব্রহ্ম, শাক্তের 'ব্রহ্মময়ী মা'। এই হল পরমচৈতন্যের অবস্থা, আনন্দঘন, নিস্পন্দ এবং নির্বিকার।

পরাশক্তি যখন স্থূল ভাবে ক্রিয়া করেন তখন হয় সৃষ্টি। শক্তির স্ফুরণে চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ পরমচৈতন্যের অস্তিত্ব স্থূল জগতে আভাসিত হয় শক্তির অবলম্বনে। তন্ত্র মতে ঐ শক্তি চিদ্রূপিণী। বিদ্যুতের স্পর্শে তার

যেমন বিদ্যুৎময় হয়ে উঠে তেমনই চৈতন্যের স্পর্শে শক্তিও চিদ্রূপিণী হয়ে উঠে। শক্তির স্ফুরণে সূক্ষ্ম থেকে অবরোহক্রমিক ভাবে স্থূল সৃষ্টি হয়ে থাকে। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন :—The forms of the Mother of the Universe are threefold. There is first the Supreme (পরা) form of which none know (বুদ্ধির অগম্য, শিব ও শক্তির যুগনদ্ধ রূপ, ব্রহ্মময়ী মা), next the subtle form as mantra or sound (নাদ-ধ্বনি) and thirdly her gross form in the visible Universe (জগৎ-রূপ) and in those embodied aspect or spiritual avataras in which She presents herself, for the benefit of the Sadhaka who can only worship her in such form. (জগজ্জননীর রূপ-কল্পনা)। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে একের সঙ্গে অপরের যোগ আছে। মন্ত্র এবং দেবতা অভিন্ন। একেরই রূপভেদ মাত্র। একই শক্তি ইচ্ছা এবং ক্রিয়া-শক্তির বশে কখনও ইচ্ছাময়ী, কখনও গুণময়ী, কখনও করুণাময়ী, তিনিই মোহগ্রস্ত রাখেন, তিনিই জ্ঞান দান করেন। নির্বিশেষ শক্তি বিশেষের মধ্যে দিয়ে নানাভাবে আভাসিত হন, তাই এঁকে বলেছে মহামায়া বা মহাশক্তি। মহামায়ার লীলাতত্ত্ব "ইচ্ছাময়ী মা" এবং "লীলাময়ী মা" শীর্ষক পদে ব্যক্ত হয়েছে।

তন্ত্রমতে বলা হয়েছে যা কিছু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে তাই আছে আমাদের দেহভাণ্ডে। আর মানুষ মুমুক্ষার বেদনা নিয়েই জন্মেছে। চরম মুক্তি মানুষ তখনই লাভ করে যখন তার চিত্তবৃত্তি মহাচৈতন্যে লুপ্ত হয়ে যায়। নিরন্তর পরিবর্তনের পথে ধাবমান সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে অপরিবর্তনীয়ের অভিমুখীন হয়, তার সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য সাধনা করে। এই সাধনার ক্রম আরোহ-ক্রমিক। পশুভাব থেকে ধীরে ধীরে সোপান পরম্পরায় দিব্যভাবে সাধক আরোহণ করেন। এই সাধনা সম্পর্কে সাধক বলেন আমাদের মেরুদণ্ডের মূলে আছে মূলাধার চক্র এবং মস্তকোর্ধ্বে আছে সহস্রার। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী রূপে শক্তির অবস্থান এবং সহস্রারে আছেন শিব। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামে পাঁচটি চক্র আছে। মূলাধার থেকে আজ্ঞা পর্যন্ত ছয়টি চক্রকে বলে 'ষটচক্র'। মূলাধারে অবস্থিত শক্তিকে জাগিয়ে পর্যায়ক্রমে ছয়টি চক্রের ভিতর দিয়ে এনে সর্বশেষে সহস্রারে শিবের সঙ্গে মিলন সাধনে পরমার্থ লাভ ঘটে।

এই তান্ত্রিক সাধনা সংসারী জীবের জন্য। কেউ সেখানে অপাঙক্তেয় নয়। যদিও অধিকার ভেদ স্বীকৃত। মানুষের স্বভাব, চরিত্র, প্রকৃতি অনুযায়ী

বেদাচার থেকে কৌলাচার পর্যন্ত সাতটি ভাগ করা হয়েছে। স্থূল মূর্তি পূজা, স্তব পাঠ, ন্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদির স্তর পরম্পরায় পশুভাব থেকে ধীরে ধীরে দিব্যভাবে সাধকের উর্ধ্বগতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত মহামুক্তি লাভ করে। 'ভক্তের আকৃতি' এবং 'মনোদীক্ষা' শীর্ষক পদে এই তত্ত্বের আভাস দেওয়া হয়েছে।

সাধক পুরুষের প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে সত্যের যে স্বরূপ ধরা দিয়েছে তা অমূর্ত। অমূর্ত সত্য সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে ধরা দেয় না, বা জ্ঞানে প্রতিভাত হলেও মানুষের হৃদয় তাতে পরিতৃপ্ত হয় না। বিরাট লোক সমাজকে ঐ সত্য উপলব্ধির অংশভাক্ করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল জীবনরসে অভিষিক্ত করে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের। শাক্ত পদাবলীর "আগমনী ও বিজয়া" শীর্ষক রচনা সম্পর্কে এই কথা খাটে। শিব ও শক্তির অচিন্ত্য তত্ত্বকে গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক রূপরসের সৌকুমার্যের মাধ্যমে শাক্ত কবিরা প্রকাশ করেছেন। আমরা দেখেছি শিব ও শক্তির পরস্পর নিরপেক্ষ সত্য নয়। উভয়ে এক পরম অদ্বয় সামরস্যের দুইটি দিক মাত্র। উভয়ে উভয়ের নিত্য পরিপূরক। শিব ছাড়া শক্তির অস্তিত্ব নেই—আবার শক্তি ছাড়া শিব শব হয়ে যান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব কথিত অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তির মতো যুগনদ্ধ। এই তত্ত্বকে আগমনী ও বিজয়ায় হরপার্বতীর জীবন চিত্রের জবানীতে লৌকিক রূপরসে কবিরা ব্যক্ত করেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—বৎসরান্তে মা-বাপ মেয়েকে কাছে আনতে চান, জামাই মেয়েকে একা ছাড়তে চান না, আবার মেয়ের ইচ্ছাও বর-সহ বাপের বাড়ী যাবেন। এককে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। এই তত্ত্বটিকে সংসারের গূঢ় তত্ত্ব! কবিরা আমাদের ঘরোয়া জীবনের বাতাবরণে আস্বাদন করেছেন। আমাদের ঘরোয়া জীবনের রঙে রঞ্জিত হয়ে পদাবলীর আলোচ্য অংশ হৃদয়সংবেদ্য হয়ে উঠেছে। তত্ত্ব-নিরপেক্ষ ভাবেও এর আস্বাদ সম্ভব। এইখানে বাঙালীর চরিত্রের ধাতুগত প্রকৃতির কথা আবার স্মরণ করতে বলি। বাঙালী কোনও তত্ত্বকে, সে যত উঁচুদরের হউক না কেন, স্বীকার করতে রাজী নয়, সব তত্ত্ব এখানে জীবনসত্যের অ[illegible]। চলমান জীবনের রূপরসের ভিতর দিয়ে তত্ত্বকে মূর্ত করে তুলতে চায়। ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথাতেই বলি, "অচলেরই আবার চল আছে, অটলেরই আবার টল আছে। অচল-অটলই নিত্য—আর চলে-টলে নিত্যের বুকে মধুর লীলা। যাঁহার নিত্য, তাঁহারই লীলা। অচল-অটল বড় উঁচু পর্দায় বাঁধা—সে হল ব্রহ্মজ্ঞান, সেখানে বেশিক্ষণ থাকা যায় না, তাই এক পর্দা নেমে আসতে হয়—সেখানে চলে-টলে সে হল ভক্তি—সেখানে রসের প্রবাহ।" নিত্যের বুকে যে মধুর লীলা তাতেই

বাঙালীর আনন্দ। তাই দুর্গোৎসবের চণ্ডীর ব্যাখ্যা জ্ঞানে জেনেও অন্তরে স্বীকার করতে পারে না—উমার পিতৃগৃহে আসা-যাওয়ার হাসি-কান্নার লৌকিক মাধুর্য মণ্ডিত করে দেখেছে। লৌকিক তিরস্করণীর মাধ্যমে জীবন ও জগতের পিছনে যে মহাশক্তির লীলা চলেছে তাকেই আভাসিত করেছে।

আমরা এইবার আলোচনার সমর্থনে উদ্ধৃতি দেব। শিব ও শক্তির যুগনদ্ধ অবস্থা ব্রহ্মময়ী রূপ, অচল, অটল—বুদ্ধির অগম্য, স্থূল ভাবে তিনি যখন ক্রিয় করেন তখন ছত্রিশ তত্ত্বের উদ্ভব এবং সৃষ্টি পরিদৃশ্যমান হয়:

"কে জানে মা তব তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব-প্রসবিনী,
মহতে ত্রিগুণ দিয়া নির্গুণা হলে আপনি।
তুমি চিৎ-অভিমুখী, কার্য হেতু চিৎ-বিমুখী,
চিদানন্দে পিছে রাখি, চিত্তানন্দে উন্মাদিনী॥
ত্যজ্য করি নির্বিকারে, মহৎ হতে অহঙ্কারে,
সৃষ্টি কর সবিকারে, বিকাররূপিণী॥
সেই হতে তিন শক্তি, তিন কার্যে এক যুক্তি,
তিনে এক হয়ে মুক্তি রসিকে দিও জননী॥"

[ব্রহ্মময়ী মা]

মহাশক্তির ইচ্ছায় ইচ্ছায়িত হয়ে চলেছে সংসার প্রবাহ। তিনি এই সংসারে কাউকে বেঁধে রাখছেন, কাউকে মুক্ত করে দিচ্ছেন, জীবকে তিনি বিষয় দিয়ে মোহগ্রস্ত করে রাখেন, জীবকে তিনিই আবার মুক্তি দেন:

"সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে 'করি আমি'।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি;
কারে দে[illegible] ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর অধোগামী॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি;
তুমি [illegible], তুমি [illegible] সংসারের সার তুমি॥"

[ইচ্ছাময়ী মা।]

ইচ্ছাময়ীর বিচিত্র ইচ্ছার কার্যিক প্রকাশ লীলা। লীলার রহস্য বাক্‌পথাতীত। মানুষের ভিতর দিয়ে তার অভিব্যক্তি, সাধকের বাসনা পূরণের জন্য নানা রূপ ধারণ করেন:

"অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপা গুণাত্মিকা নারায়ণী;
কভু ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কাল-কামিনী,

সাধকের বাসনা পুরাও হয়ে নানা রূপ ধারিণী।
কভু কমলের কমলে থাক পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।"

[লীলাময়ী মা]

সাধকের আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্যই যিনি পতি নিন্দায় দেহত্যাগ করে-ছিলেন তিনিই পতির বুকে পদস্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছেন ; এই সবই :

"এ সবই ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা॥"

* * * *

"কি রূপ কি গুণভঙ্গী, কি ভাব কিছুই যায় না বলা।
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥"

[লীলাময়ী মা]

তন্ত্র সাধনা উপলব্ধ সত্যকে জীবনে লাভ করবার কার্যকরী পন্থা। এর জন্য জীবনক্ষেত্রের বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, দেহ-ভাণ্ডে আমাদের সব কিছু আছে, কেবল দেহকে পরিশুদ্ধ করে নিলে চলবে :

"আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে, এইখানে পাবে ; খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন পরশমণি—যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ দুয়ারে॥
তীর্থ গমন, দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ো না রে,
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে॥"

অথবা

"ডুব দে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জ[illegible]
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চা[illegible] ডুবে [illegible]ন না পেলে,
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে [illegible] কুল-কু[illegible]লিনীর কূলে॥"

কিংবা

"মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে মন জান না।
সদা পদ্মবনে হংসীরূপে আনন্দ রসে মগনা॥
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা।
জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ী রূপ দেখ না॥"

[মনোদীক্ষা]

শাক্ত পদাবলীতে শক্তি-সাধনার সিদ্ধিফলটি কবিরা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এই রকমের সিদ্ধিলাভ সকল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। কেবলমাত্র তার জন্য মনকে তৈরী করে নিতে হবে। "সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে"—মনটাকে সেই ভাবের ভাবী করে তুলতে হবে, এর জন্য ঐকান্তিক ভক্তি, একান্ত মাতৃ-নির্ভরতা; অনন্তভাবে শরণাগত হওয়া দরকার; তাহলে মাতৃ-প্রসাদে পরম নির্ভয় হওয়া যায়। সংসারের মৃত্যুভয় টুটে যায়। "ভক্তের আকৃতি" শীর্ষক পদগুলোতে সন্তানের অহৈতুকী ভক্তির স্বর ধ্বনিত হয়েছে। যে ভক্তির ছোঁয়ায় জীবন ও জগৎ শ্যামাময় হয়ে উঠবে, ক্ষুদ্র অহং-এর মধ্যে বিশ্ব অহং প্রতিবিম্বিত হবে, সেই রকমের ভক্তির জন্য মর্মনিংড়ানো আর্তশ্বাস ভক্তের আকৃতির প্রাণ-বিন্দু। এর পটভূমিকায় রয়েছে সংসারে বদ্ধ জীবের জ্বালা যন্ত্রণার চিত্র। তাই তার আবেদন হয়েছে আরও তীব্র। মাতা ও সন্তানের ঘরোয়া পরিবেশের ভাবাবহে গানগুলো রচিত বলে তার মানবিক আবেদন হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে।

শাক্ত পদাবলীর কাব্যমূল্য :

সাধক কবিরা তাঁদের রচনায় সাধ্য-সাধনের কথা নানা উপমা-অলঙ্কারের সাহায্যে তৎকালীন বহমান জীবনধারার ভিতর থেকে উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ করে ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা সকলেই মূলতঃ সাধক—গৌণত কবি। আমাদের শাস্ত্রে যে অর্থে ঋষিকে কবি বলা হয়, তাঁরা সেই অর্থে কবি। যেহেতু নিছক তত্ত্বরসে বাঙালী কোনও দিন পরিতৃপ্ত হতে পারে না, সব তত্ত্বই এইখানে জীবনসত্যের অন্তর্ভুক্ত। শাক্ত পদাবলীও তার ব্যতিক্রম নয়। জীবন-প্রবাহের সঙ্গে বিজড়িত বলেই শাক্ত পদাবলী কাব্য হিসাবে আস্বাদন-যোগ্য হয়ে উঠেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-যন্ত্রণা, ক্রুরতা, বঞ্চনা স্থুল রূপেই এই পদাবলীতে রূপ ধারণ করেছে। পদের ফাঁকে ফাঁকে বাস্তব সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যায় :

> "দুঃখের কথা কই গো তারা, মনের কথা কই।
> কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী ॥
>
> * * * *
>
> কারও অঙ্গে শাল দো-শালা ভাতে চিনি দই।
> আবার কারও ভাগ্যে শাকে বালি ধানে ভরা খই ॥"

এ ছাড়াও দুঃখের ডিক্রিজারী, কলুর বলদ, তহবিল তছরূপ ইত্যাদি কথায়

ছড়াছড়ি গূঢ় তত্ত্বকে যেমন প্রকাশ করে সেই কালের মানুষের অসহায়তা, যন্ত্রণা এবং তার থেকে বিশ্বজননীর কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করবার ক্ষুব্ধতা; শান্ত-সুস্থ জীবনের জন্য আর্তিকে প্রকাশ করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, শাক্ত কবিরা বৈষ্ণব কবিদের মতো বাস্তব দুঃখবেদনাকে ভাবের দ্বারা চোলাই করে নিয়ে শৃঙ্গাররসে রূপান্তরিত করেন নি। বৈষ্ণব কবির মতো সব কিছুকে অপ্রাকৃত প্রেমের দ্বারা শোধন করে নিতে চান নি। তাঁরা জীবনের কাঁটা-বিছানো পথ দিয়ে হেঁটেছেন—তাতে পদতল যেমন ছিন্নভিন্ন হয়েছে তেমনই রক্তাক্ত হয়েছে পথও। ঐ রক্তের দাগটুকু আমাদের সহানুভূতি দাবি করেছে। আমাদের বক্তব্য হল এই যে, পথের কাঁকর তার বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের অনুভূতিকে বিদ্ধ করেও সীমাহীন লোকে তাকে মুক্তি দিয়েছে। এইখানে এর কাব্যত্ব। বাঙালী সমাজ ও পরিবার-জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, আনন্দ-বেদনা, ঈর্ষা-কলহ, যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় অনাবৃত ভাবে শাক্ত পদাবলীতে উপস্থিত হয়েও ভক্তি রসের ছোঁয়ায় দিব্যলোকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এই সূত্র ধরে আমরা বলতে চাই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে শাক্ত কবিরাই প্রথম ব্যাপকভাবে সাহিত্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কবি ওয়ার্ডস্বার্থ "Racy Speech of peasants"-কে কাব্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য ওকালতি করেছিলেন এবং নিজেও সেই চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হয়েছে, সেইটা তর্কের বিষয়। কিন্তু মনোভাবটি যে আধুনিক তাতে সংশয় নেই। শাক্ত পদাবলীতে ঐ অর্থে আধুনিকতার ইঙ্গিত যেমন রয়েছে তেমনি রূপ-কল্পের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও কবির জীবনাবেগের স্পর্শে কাব্য হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, পদাবলীর রূপক-উপমা দিব্য-ভাব প্রকাশের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হলেও তার ইন্দ্রিয়ধর্মিত্ব ক্ষুন্ন হয় নি। এইখানে শাক্ত পদাবলীর যথার্থ আধুনিকতা—শাক্ত কবিরা আধুনিক মনোভঙ্গীর আলোকে সনাতন সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন।

পূর্ববর্তী গীতি-কবিতার তুলনায় আরেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেও এই সিদ্ধান্ত অবশ্য করতে হবে যে শাক্ত পদাবলী আধুনিকতার পরিপোষণা করেছে। বৈষ্ণব কাব্য—গীতি কাব্যই বটে। কিন্তু সেখানে ব্যক্তিচিত্ত গোষ্ঠী-মনোভাবের ভিতরে আত্মগোপন করেছে। কবির মনের কথা রাধাকৃষ্ণের বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে শাক্ত পদাবলীতে কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সরাসরি প্রকাশ ঘটেছে। এই দিক থেকে শাক্ত পদাবলীর একটি বিশেষ মূল্য

রয়েছে। এই মূল্য যেমন কাব্যগত তেমনই ঐতিহাসিকও বটে। গীতি-কবিতায় আত্মভাবের উদ্বোধন ঘটে, কথা-ছন্দে-অলঙ্কারে রূপময় হয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করে। শাক্ত পদাবলীতে আত্মভাবের উদ্বোধন ঘটলেও কথার চাইতে সুরের প্রাধান্য বেশি। কথাগুলোকে সুরের মধ্যে না ফেললে তার মাধুর্য, সৌন্দর্য আস্বাদন করা যায় না—তাই কেবলমাত্র কবিতা হিসাবে পাঠ করতে গেলে একটু হোঁচট খেতে হয়। তবে এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, কিছু পদ সার্থক গীতি-কবিতা হয়ে উঠেছে। মোটের উপর বলতে পারি গীতি-কবিতার বর্ণময়, সুরময় উচ্ছ্বাস শাক্ত পদাবলীতে আপেক্ষিক অর্থে কম থাকলেও গীতি-কবিতার যে মৌলিক লক্ষণ আত্মভাবের উদ্বোধন, ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রত্যক্ষ প্রকাশ সেইটি শাক্ত পদাবলীতে প্রথম দেখা গেল।

বাঙালী পাঠকের কাছে শাক্তপদের একটি বিশিষ্ট আবেদন আছে তার দেশিকতা এবং লৌকিকতার জন্য। কথাটা একটু ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বৈষ্ণব কাব্যে এবং শাক্ত কাব্যে দুইটি মাতৃচরিত্র কবিরা এঁকেছেন। যশোদা এবং মেনকা। মাতৃচরিত্রাঙ্কনে বাৎসল্যের প্রকাশক্ষেত্রে উদ্দীপন বিভাবের পার্থক্য রয়েছে। শিশু কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কিত যশোদা এবং বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেন মেনকা। কৃষ্ণ ও উমার মধ্যে সন্তান হিসাবে সাধারণ ঐক্য রয়েছে। তবুও তফাৎ রয়েছে অনেকখানি। এই তফাতের মূলে আছে কৃষ্ণ এবং উমার বয়ঃধর্ম। শিশু এবং মাতার সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বজননী আবেদন রয়েছে। কাজেই বলা যেতে পারে ভারতীয় যশোদা য়ুরোপীয় ম্যাডোনায় বা য়ুরোপীয় ম্যাডোনা ভারতীয় যশোদায় প্রতিভাত হয়েছেন। পক্ষান্তরে মেনকা দেশিকতা এবং লৌকিকতার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন যদিও তাতে হৃদয়বত্তার আবেদন আছে। কেননা বয়স্থা, বিবাহিতা কন্যার পিত্রালয়ে আসা-যাওয়াকে কেন্দ্র করে কান্না-হাসির জোয়ার-ভাঁটা, কন্যাকে কাছে পাওয়ার জন্য মাতৃহৃদয়ের যে আকুলতা, পেয়েও বিচ্ছেদের জন্য হাহাকার একান্ত ভাবে বাংলাদেশের সম্পদ। বাঙালী যে ভাবে এই বস্তু আস্বাদন করে সেই ভাবে অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। হৃদয়-বত্তার আবেদনের জোরে অবাঙালীর কাছে শাক্ত পদাবলীর আবেদন থাকলেও আস্বাদন প্রকৃতির ভিতরে পার্থক্য থাকবে। বাঙালী সমাজ ও পরিবারের খুঁটি-নাটি বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচয়ের অভাবের জন্য শাক্ত পদাবলীর গভীরে অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব পদাবলীতে কীর্তিত পরকীয়া প্রেমের আবেদন সহজ-সংবেদ্য। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক একান্তভাবে বাঙালীর নিজস্ব হওয়াতে তার মাধুর্যের গভীর আবেদন রহস্য সকলকে আপ্লুত

করতে পারে না। এই কারণে বৈষ্ণব পদাবলী বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে গৌরবের সঙ্গে পেশ করবার বস্তু, কিন্তু শাক্ত পদাবলী তা নয়। বস্তুতঃ বিশ্ব-সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা বৈষ্ণব কাব্যের উল্লেখ করি কিন্তু শাক্ত কাব্যের করি না। এবং ঐ কারণে সুরুতেই বলেছি শাক্ত পদাবলী একান্তভাবে বাঙালীর সম্পদ। তাই বলব বৈষ্ণব কবিতা বাঙালীকে বিশ্বতোমুখী করেছে, শাক্ত কবিতা ঘরমুখী করেছে। একটি সমাজ-সংসারের বাইরে ভাব-স্বর্গ রচনা করেছে, অপরটি সংসারকে যথাস্থিত ভাবে গ্রহণ করে সেখানেই স্বর্গ সৃষ্টি করেছে। বিষয়বস্তুর পার্থক্যের দরুণ একটি হয়েছে বিশ্বমানবের সম্পদ অপরটি একান্তভাবে বাঙালীর সম্পদ। কোনও একটি প্রবন্ধে ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন—"In fact we can never understand any poet without some knowledge of the culture that produced him."—যে কোনও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে এই কথা প্রযোজ্য। শাক্ত-গীতি সম্পর্কে এই মন্তব্য আরও বিশিষ্টভাবে প্রযোজ্য। কারণ শাক্ত পদাবলীর রস গ্রহণের পক্ষে কেবলমাত্র আলঙ্কারিক কথিত সাহিত্য সংস্কার যথেষ্ট নয়—বিশিষ্ট মানসিক সংস্কার থাকা দরকার, যার অনুষঙ্গে যে বিশিষ্ট মানসিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠে তাতে পদাবলীর বিশিষ্ট সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়। এইজন্য সূত্রপাতে স্যার জন উড্রফের কথার উল্লেখ করে বলেছি—"It is a mode by which religious truth is presented and made intelligible in material forms and symbols to the mind." এবং "It appeals to all natures passionately sensible of that Beauty." এই কথায় ডঃ সুশীলকুমার দে অন্যভাবে বলেছেন,—"Its treatment of the facts of religious experience is not less appealing, but all the more artistic because it is so sincere and genuine, because it awakens a deep sense of conviction." পাঠকের ভিতরে ঐ "deep sense of conviction"-এর [illegible]ত্যকারের অস্তিত্ব আছে বলেই বাইরেকার উপলক্ষ্য তাকে উদ্রিক্ত [illegible] আস্বাদযোগ্য করে তোলে। আমরা বলতে চাই ঐ "conviction" বা[illegible]র ধা[illegible]ত সম্পদ। আবার প্রকাশের "sincerity" এবং "genuineness" আছে বলে সর্বপ্লাবী আবেদন সৃষ্টি করে কাব্য পদবাচ্য হয়েছে।

॥ কবি পরিচিতি ॥

রামপ্রসাদ সেন :

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন হালি সহরের কুমারহট্ট গ্রামে ১৭২০ খ্রীঃ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রামরাম সেন। রামরাম সেনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের বৈমাত্রেয় ভাই-এর নাম নিধিরাম। কবির সহোদরের নাম বিশ্বনাথ, সহোদরাদের নাম অম্বিকা ও ভবানী। রামপ্রসাদ গৃহী-সাধক ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র এবং দুই কন্যা ছিল। পুত্রদের নাম রামদুলাল ও রামমোহন, কন্যাদের নাম পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। রামপ্রসাদ তন্ত্র সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি রয়েছে। শোনা যায় শ্যামা মা কন্যারূপে কবিকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করেছিলেন। দেবী অন্নপূর্ণা কবির গান শোনবার জন্য কাশী ছেড়ে কবির চালায় এসেছিলেন। এই সব জনশ্রুতি বাঙালীর ভাবগত বিশ্বাসে আজ পরিণত হয়েছে। কবি কোনও জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করতেন। সেখানে হিসাবের খাতায় “আমায় দে মা তবিলদারী, আমি নিমক-হারাম নই মা শঙ্করী” গানটি লেখেন, তা ছাড়াও অন্যান্য বহু পদ তাতে লেখেন। জমিদারবাবুর কাছে ধরা পড়বার পর তিনি কবিকে জীবিকা থেকে মুক্তি দেন এবং মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেন। এই জমিদার কে তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, কারও মতে কলকাতার দুর্গাচরণ মিত্র। রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামে একজন জমিদার রামপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বলে কবির স্বীকৃতি রয়েছে। এছাড়াও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এঁদের সকলের দানে কবির অর্থাভাব ঘটে নি। জীবিকার তাড়নায় বিভ্রান্ত হতে হয় নি।

বাংলাদেশে বহু সিদ্ধ সাধকের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের সঙ্গে রামপ্রসাদের বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী সাধকেরা সাধনার পথ ও ফলকে “কুলবধূরিব” গোপন করেছেন অথবা পারিভাষিক শব্দের বেড়ায়, সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করে গোপন রেখেছেন। রামপ্রসাদ এসে সেই বেড়া ভাঙলেন, বাংলা ভাষায় সহজ, সরল ভাবে সাধনার প্রক্রিয়া, সিদ্ধিলাভের অলৌকিক আনন্দকে জনচিত্ত গোচর করলেন। সাধারণ মানুষকে অমৃতলাভের পথ বলে দিলেন। যে ভঙ্গীতে পথ বাত্‌লালেন সেইটি হয়ে গেল কাব্য। প্রতিদিনকার তুচ্ছ কথা সিদ্ধ সাধকের ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কাব্যবিতামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

রামপ্রসাদের গানের একটি বিশেষ 'ঘরানা' তৈরী হয়ে গেছে। রামপ্রসাদী সুর নামে তা পরিচিত। রামপ্রসাদ এমন একটি স্তরে উঠেছিলেন যেখান থেকে বলতে পেরেছেন শ্যাম ও শ্যামা এক। এই উদার মৈত্রী-বুদ্ধি ভারত-ধর্মের অন্যতম অভিব্যক্তি। এই কারণে রামপ্রসাদের গান সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ভক্তিতে, মাধুর্যে, শক্তিতে, বিশ্বাসে রামপ্রসাদী সঙ্গীত এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বোধ করি এই কারণে কোনও রসজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন, রামপ্রসাদের পদ শাক্ত পদাবলীর "আদিগঙ্গা হরিদ্বার"—শাক্ত পদাবলীর যাবতীয় সম্ভাবনা তাঁর রচনায় নিহিত ছিল, পরবর্তী কবিরা নানাভাবে তাকে বিস্তৃত করেছেন।

রামপ্রসাদের আরেক পরিচয় 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে। 'কালিকামঙ্গল' কাব্য তিনি লিখেছেন রাজার আদেশে—পরের গরজে। এ হল ফরমায়েসী কাব্য। 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে যে অসুস্থ আদিরসের প্রবাহ বয়ে চলেছে তার সঙ্গে পদাবলীর পবিত্রতার এবং শুদ্ধতার আশমান্-জমিন ফারাক দেখে আমাদের মনে এই প্রশ্নই জাগে যে রামপ্রসাদের মতো সাধক এই রকমের রুচিদুষ্ট কাব্য কেমন করে রচনা করলেন! এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বরঞ্চ ঐ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, রামপ্রসাদের সুতীক্ষ্ণ সমাজ মানস সমাজ জীবনের গভীরে অবগাহন করেছিল। আমরা লক্ষ্য করেছি, মধ্যযুগীয় সমাজের গোষ্ঠী জীবনের ভাঙন সুরু হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তার পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল। গোষ্ঠী জীবন ভেঙে গেছে অথচ সুস্থ পরিমার্জিত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে নি। গোষ্ঠী নিরপেক্ষ মানুষ অন্ধ ভোগে লিপ্ত। রাজসভায় ইতর ভোগের বন্যা বয়ে চলেছিল। অসুস্থ পচনশীল, মুমূর্ষু জীবনধারার সাহিত্যিক অভিব্যক্তি ঘটেছে 'কালিকামঙ্গল' কাব্যে। রামপ্রসাদের 'কালিকামঙ্গল' আরও বেশি আমাদের আহত করে, তার কারণ বোধ করি এই যে, যে বিদগ্ধতা থাকলে রুচিবিকারকে রুচিবিলাসে রূ[illegible]ান্তরিত করা যায়, অশ্লীল বস্তুকে কাব্যগুণোপেত করা যায়, রামপ্রসাদে[illegible] সেই বিদগ্ধতা ছিল না। এই বিদগ্ধতার গুণেই ভারতচন্দ্র একই বিষয়বস্তু[illegible]ব্যগু[illegible]পেত করে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

শ্যামা-সঙ্গীত রচনার মূলে ছিল প্রাণের আবেগ। "আয় মা দুটো কথা বলি"—বলে সেই আবেগ পরিতৃপ্ত করেছেন। বাঙালীর আত্মনিবেদনের অভীপ্সাকে ভাষা দিয়েছেন। এইখানে কবির কৃতিত্ব। অথচ এখানেও সমাজ জীবন উপেক্ষিত হয় নি। রামপ্রসাদ সম্পর্কে আমাদের সাধক বলে যে সংস্কার

গড়ে উঠেছে, সেই সংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে দেখলে এই ধারণা হবে যে 'কালিকামঙ্গল' ও শাক্তপদ পরস্পরের পরিপূরক হয়ে সামগ্রিক সমাজ জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছে। এইবার কবি রামপ্রসাদের রচনার নমুনা তুলে দিই :

(ক) "কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ-তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ, আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটি, এবে পীতধটি, এলোচুল চূড়া বংশীধারী।"

(খ) "ডুব দে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে,
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে যায়, কুল-কুণ্ডলিনীর কূলে ॥"

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য :

শাক্ত পদাবলীর অন্যতম কবি কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। কমলাকান্তের জন্ম আনুমানিক ১৭৭০ খ্রীঃ। এইরূপ অনুমান করবার কারণ হল এই যে, রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু ১৮২০ খ্রীঃ। রাজবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পরে কবি দেহত্যাগ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর। কবির আদিবাস ছিল কালনার অন্তর্গত অম্বিকা গ্রামে। কমলাকান্তের পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য, মাতার নাম মহামায়া। কমলাকান্তও গৃহী সাধক ছিলেন। ১৮০০ খ্রীঃ তিনি বর্ধমানে আসেন। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র তাঁর কাছে দীক্ষা নেন এবং কোটালহাট গ্রামে কবির জন্য বাড়ী তৈরী করিয়ে দেন। বর্ধমানের রাজ-পরিবারের সৌজন্যে কমলাকান্তের পদাবলী মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কেও অলৌকিক গল্পের প্রচলন আছে।

কমলাকান্ত সিদ্ধ সাধক ছিলেন। তিনিও দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত, মাতৃভাবে তদ্গত চিত্ত। কিন্তু কমলাকান্ত আত্মবিভোর হলেও আত্মবিস্মৃত ছিলেন না। এই কারণে তাঁর রচনার কাব্যগুণ, অন্তত গীতি-কবিতা হিসাবে রামপ্রসাদের চাইতে বেশি। রামপ্রসাদের রচনায় সুরের আরোপ না হলে তার মাধুর্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়, পক্ষান্তরে কমলাকান্তের পদে কথার প্রাধান্য। কথা এখানে ছন্দে, উপমায়, চিত্রে আলঙ্কারিক অর্থে ধ্বনি হয়ে উঠেছে। তাই কবিতা হিসাবে কমলাকান্তের পদের একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে। সহজ কথায় বলতে

পারি কমলাকান্ত ভক্ত, কিন্তু সচেতন শিল্পী। এই শিল্পী-স্বরূপ কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দ মাধুর্যে, কি অলঙ্করণে অভিব্যক্ত হয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দিলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে :

(ক) "সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা,
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও করতালি ॥
তুমি আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না মা মুণ্ডমালা কোথায় পেলি ॥"

(খ) "শুকনো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।
তরু পবন বলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে ॥
বড় আশা ছিল মনে ফল পাব মা এই তরুতে
তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা ছটা আগুন বিগুন আছে ॥"

এই সমস্ত পদে তত্ত্বকথা থাকলেও মার্জিত, সংযত ভঙ্গিমায় কবি যে ভাবে রূপ দিয়েছেন তাতে কাব্যরসিকও পরিতৃপ্ত হয়।

কমলাকান্ত রাজসভার কবি। কিন্তু রাজসভার স্থূল, অসংযত ভোগ, ইতর লালসা তাঁকে গ্রাস করতে কেন, সামান্য ভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। এদিক থেকে তাঁর কাব্য যুগের সাধারণ রুচি বিকারের উর্ধ্বে উঠে গেছে। আবার গ্রাম্যতার ছোঁওয়াও তাতে লাগে নি। এই সংযম তাঁর রচনাকে গম্ভীর মহিমা দান করেছে। এই হল তাঁর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়তঃ সাধারণ ভাবে শাক্ত কবিদের মধ্যে দেখা যায় সার্বিক সমাজ চেতনা। সাধারণ জীবনধারার বহু বিচিত্রিত সুর তাঁদের কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে। কমলাকান্ত এর সাধারণ ব্যতিক্রম। পারিবারিক জীবনের শান্ত পটভূমিকায় আত্মোপলব্ধিকে মূলধন করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। সেখানের জ্ঞান, ভক্তি ও রুচির সমন্বয়ের অত্যাশ্চর্য মহিমা আমাদের মুগ্ধ করে। এই গাম্ভীর্য-মহিমাতে কমলাকান্তের স্বাতন্ত্র্য।

চতুর্থতঃ রামপ্রসাদে আগমনী গানের সূচনা, কমলাকান্তে তার নাটকীয় বিস্তার। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, চরিত্র পর্যালো[illegible] বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধনে কমলাকান্ত যে শিল্প-নৈপুণ্যের অবতারণা ক[illegible] তা[illegible] অসামান্য সার্থকতা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের সম্পর্ক বৈষ্ণব-কাব্যের চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের অনুরূপ বলে চিহ্নিত করলে অযৌক্তিক হয় না।

রামপ্রসাদ কমলাকান্ত ছাড়াও গোবিন্দ চৌধুরী, প্রেমিক মহেন্দ্রনাথ, মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান রঘুনাথ, রসিকচন্দ্র ইত্যাদি বহুজনে পদ রচনা

করেছেন। সকলেই ভক্ত। কেউ পুরাণ-তন্ত্র মতে দেবীর রূপ বর্ণনা করেছেন, কেউ প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছেন, কেউ বিস্ময় বিস্ফারিত চিত্তে মহামায়ার লীলারস আস্বাদন করেছেন।

শাক্ত পদাবলীর পরিণতি :

শাক্ত পদাবলীর ধারা বিভিন্ন বাঁক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। কবিওয়ালার যুগ বলে যে কালটি চিহ্নিত হয়ে আছে, সেইটি বাংলা-সাহিত্যের এক দুর্যোগ-লগ্ন। ঐ দুর্যোগের ভিতরে কবিওয়ালারা বাংলা কাব্যের ধারাকে কোনও রকমে বাঁচিয়ে রেখে পরবর্তী যুগের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁদের কাব্য-প্রেরণা শাক্ত পদাবলী থেকে গৃহীত। এই প্রসঙ্গে হরু ঠাকুর, দাশরথি রায়, এন্টনী ফিরিঙ্গী, রাম বসু, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদির নাম করতে হয়।

আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা মধুসূদন শাক্ত সঙ্গীতের পৌরাণিক প্রসঙ্গতাকে (শাক্ত ভাবসাধনা নিরপেক্ষ ভাবে) কাব্যের উপাদান করেছেন, উমা-মেনকা, নামঘটিত রস বাঙালীর জীবন সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তার হৃদয়-সংবেদ্য আবেদন অনস্বীকার্য। আসল কথা য়ুরোপীয় কাব্যকলাকে দেশীয় কাব্যের রস উদ্বোধনের কাজে তিনি নিয়োগ করেছেন। ফলে সার্থক গীতি কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। বরঞ্চ বলা ভাল নতুন লিরিক ভঙ্গীর সূত্রপাত করেছেন। এই প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র সেনের নাম, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণ করতে হয়।

এতদ্ব্যতিরেকেও বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল ইত্যাদি কবি-শিল্পীর রচনা কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও পরোক্ষ ভাবে শাক্ত কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। মূল কথা হল এই যে, আধুনিক যুগচিন্তার দ্বারা তাঁরা সকলেই কম-বেশি শাক্ত পদের প্রসঙ্গকে নতুন ভাবে অভিষিক্ত করেছেন। এতেও প্রমাণ হয় মাতৃভাব বাঙালীর মজ্জাগত সংস্কার। শাক্ত পদাবলীর ঐতিহাসিক মূল্যও এইখানে।

গীতিকা সাহিত্য

গীতিকা সাহিত্য বলতে আমরা "ময়মনসিংহ গীতিকা" এবং "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" নামক দুইটি সঙ্কলন গ্রন্থকে বুঝে থাকি। এই গীতিকাগুলো পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। গীতিকাগুলো প্রকাশিত হওয়ার পর দেশী-বিদেশী বহু সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুধু তাই নয়, গীতিকাগুলো নিয়ে আলোচনা-প্রত্যালোচনায় মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে। গীতিকাগুলোর সংকলন এবং প্রচার কৃতিত্ব আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের। তাঁর প্রচেষ্টায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে গীতিকা সাহিত্যের প্রচার ঘটেছে এবং বাংলাদেশের এক অমূল্য সাহিত্যকৃতি কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়েছে।

গীতিকা সাহিত্যের আবিষ্কার, সম্পাদনা ও প্রচারণা :

ময়মনসিংহের কেদারনাথ মজুমদার 'সৌরভ' পত্রিকায় ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে চন্দ্রকুমার দে নামে এক ভদ্রলোকের 'মালীর যোগান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটি আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের চোখে পড়ে। তিনি তারই সূত্র ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। এবং কেদারনাথ মজুমদারের সাহায্যে চন্দ্রকুমার দে-র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং তাঁর সাহায্যে গীতিকাগুলো সংগ্রহ করেন। এই সংগ্রহকার্যে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কারণ এই পালাগুলোর প্রতি শিক্ষিত মানুষের কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। বরঞ্চ শিক্ষিত মানুষেরা আচার্য সেনকে এই [illegible]পারে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। যাই হোক আচার্য সেন চন্দ্রকুমার দে ছাড়া [illegible]হারী[illegible] সরকার, আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, কবি জসিমুদ্দিন ইত্যাদির সহায়তায় পালাগুালা সংগ্রহ করেন। ১৯২৩ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ময়মনসিংহ গীতিকা' এবং 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে দুইটি গ্রন্থে পালাগুলো প্রকাশিত হয়। আচার্য সেন এই পালাগুলোকে—'Eastern Bengal Ballads—Mymensingh' নামে ইংরাজীতে অনুবাদ করে প্রকাশ

করেন। এই প্রকাশনার পর গীতিকা কাব্য শিক্ষিত সমাজের নজরে পড়ে। ইংরাজী অনুবাদ বিদেশী সাহিত্য-রসিকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরাজী অনুবাদে আচার্য সেন পালাগুলোর গদ্যানুবাদ করেছেন। বিদেশী সাহিত্য-রসিকেরা ঐ অনুবাদকে আশ্রয় করে মূলতঃ আলোচনা করেছেন। সাম্প্রতিককালে বঙ্গভাষাবিদ অধ্যাপক ডঃ দুসান জবাভিতেল 'Bengali Folk-Ballads from Mymensingh' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত) গ্রন্থে গীতিকা কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি মূল কাব্য সংগ্রহকে আশ্রয় করেছেন। রোমাঁ রোলাঁর ভগ্নী মেডেলাইন রোলাঁ 'Eastern Bengal Ballads'-এর ফরাসী অনুবাদ করেছেন। এতদ্বারা গীতিকাগুলোর সর্বজনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। তবে আমাদের মনে হয়, গীতিকা সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক মূল্য বিদেশীদের যতটা আকৃষ্ট করেছে, সাহিত্যমূল্য ততটা নয়। এর স্বপক্ষে আমাদের যুক্তি হল এই যে, য়ুরোপে 'Folk-Ballads' প্রধানতঃ লোক-সমাজের গতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, রীতি-নীতি বিচারের প্রামাণ্য দলিল হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সামাজিক নৃতত্ত্বগত ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে তার বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। ফলে ঐ জাতীয় লোক-কথায় কোথায় নির্ভেজালত্ব রয়েছে, কোথায় পরিশীলিত চিত্তের ছায়া পড়েছে, এই বিচারের উপর আত্যন্তিক সচেতনতার আরোপে শিল্প-মূল্য কিছুটা উপেক্ষিত হয়েছে। ফলে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তাঁরা এই কথা বলতে পারেন নি যে, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে আধুনিক যুগের কোনও কবি ওগুলো রচনা করেছেন তাহলে এই কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, তিনি সেই যুগের ভাবাবহে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন,—লোক জীবনের শরিক হয়েছিলেন, কথায় ও কাজে তাদের সত্যিকারের আত্মীয় হয়েছিলেন।

গীতিকা সাহিত্যের রচনাকাল :

গীতিকা সাহিত্য কোন সময়ে রচিত হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারণ এই সব রচনায় আধুনিক কবি মনের ছাপ পড়েছে বলে অনেকে সন্দেহ করেছেন। এইরূপ সন্দেহের কারণ আছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ গীতিকায় সংগৃহীত মহুয়ার পালা সম্পর্কে জানিয়েছেন,—"চন্দ্রকুমার দে যে ভাবে গীতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল, গোড়ার গান শেষে আবার শেষের গান গোড়ায়—এইভাবে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল,

আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি।" আবার 'Eastern Bengal Ballads'-এর ভূমিকায় বলেছেন,—"The songs embodying these were found strewn at random over the whole collection in a quite unconnected way. I had to take great pains to re-arrange the poem by a close and careful study of the text."—তদুপরি পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত "বাস্থানীর গান" মহুয়া পালার অনুরূপ, কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থক্য আছে। চন্দ্রকুমার দে-র সংগ্রহের ভাষা অনেক বেশি পরিমার্জিত এবং কাব্যগুণান্বিত। এ ছাড়াও চন্দ্রকুমারের সংগ্রহে কলকাতার কথ্য ভাষার ছাপ আছে। কাজেই বলা যেতে পারে যে চন্দ্রকান্ত আসল সংগ্রহকে শিক্ষিত সমাজের মনোগ্রাহী করবার উদ্দেশ্যে কিছু অদল-বদল করেছেন। ফলে গল্পাংশের দিক থেকে বিষয়বস্তু ঠিক থাকলেও পরিবেষণের ভঙ্গীটি অবিকৃত থাকে নি। এই ধরণের কথা আচার্য সেনও বলেছেন। দ্বিতীয়তঃ আচার্য সেনও গ্রন্থ সম্পাদনার সময় মূল বিষয়কে অবিকৃত রাখেন নি, বিষয়বস্তুর পরিশোধন, পরিমার্জন করেছেন। ডঃ ডুসানকে তিনি মূল সংগ্রহ দেখাতে চান নি। ডঃ ডুসান জানিয়েছেন,—"To ascertain the truth and to find out to what extent the editor re-arranged some parts of the individual ballads as he mentioned in his prefaces. I tried to see the collector's manuscripts, they are in the keeping of one of Prof. D. C. Sen's sons. Unfortunately, I was able only to ascertain that they still exist, but was not given the opportunity to read them."—কাজেই মূল সংগ্রহ এবং সম্পাদিত পালার তুলনামূলক আলোচনার কোনও সুযোগ না থাকায় গীতিকা সাহিত্যের রচনাকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। এই সাহিত্যের প্রাচীনতা সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত [illegible] সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ভাষাগত বিচার করেও এর কাল নির্ণয় ক[illegible] সম্ভব [illegible]য়, কারণ সেখানেও আধুনিকতার প্রক্ষেপ ঘটেছে। বিষয়বস্তুতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের আভাস পাওয়া যায়। অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের যে প্রতিফলন দেখা যায় তাকে চৈতন্যোত্তর যুগের ফলশ্রুতি বলা যেতে পারে। এইসব পরোক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা যেতে পারে গীতিকাগুলো সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়েছে।

গীতিকা সাহিত্য ও লোক-সাহিত্য :

লোক-সাহিত্য জন্মলাভ করে চিৎপ্রকর্ষহীন (unsophisticated), মৃত্তিকা-চারী সহজ, সরল জীবনের ভিতর থেকে। সত্য, শিক্ষিত জীবনধারার তুলনায় অনুন্নত, অনগ্রসর জীবনধারার সাধারণ পরিচয় 'লোকজীবন' নামে। লোক-জীবনের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে, ধর্ম আছে, রীতি-নীতি আছে, গতি আছে, জীবন-ধ্যান আছে। এই জীবনধারার যে শৈল্পিক অভিব্যক্তি তাকেই বলা হয় লোক-সাহিত্য। যেহেতু এই জীবনধারার নিজস্ব গতি আছে সেইজন্য এই সমাজের মানুষেরা ঐ গতির সূত্রে পারিপার্শ্বিকতাকে অন্য সমাজের ভাবসত্তাকে আপন ক্ষমতানুযায়ী স্বীকরণের (Assimilation) দ্বারা নিজেকে পরিপুষ্ট করে তোলে।

লোকজীবন গোষ্ঠীবদ্ধ। লোক-সাহিত্যেও তেমনই গোষ্ঠী-জীবনধারার সাধারণ পরিচয় অভিব্যক্ত হয়। গোষ্ঠী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন-কল্পনা অভিব্যক্ত হয়। রচনার আড়ালে রচয়িতার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যায়। মনে রাখতে হবে শিল্প-সৃষ্টি মাত্রই ব্যক্তি সাপেক্ষ। লোক-সাহিত্যের শিল্পী গোষ্ঠী-জীবনের ভাব-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর রচনায় অখণ্ড লোক-মানসের প্রতিফলনের আড়ালে স্রষ্টা চাপা পড়ে যান। তাঁর রচনা মুখে-মুখে ফিরতে থাকে। কিন্তু কবিকে লোকে ভুলে যায়। মুখে মুখে ফেরে বলে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মেই মূল রচনার অবিমিশ্র রূপটি আর পাওয়া যায় না। তদুপরি এই জাতীয় সাহিত্যকৃতির প্রতি আধুনিককালের শিক্ষিত লোকের নজর পড়ায় যখন তা সংগৃহীত এবং সম্পাদিত হতে থাকে, তখন তাকে শিক্ষিত মনের উপযোগী করবার আগ্রহে সংগ্রাহক ও সম্পাদক সংগৃহীত বিষয়বস্তুকে কিছুটা পরিমার্জনা করেছেন। এইজন্যেও লোক-সাহিত্যের অবিমিশ্র রূপটি আজ আর পাওয়া যায় না। তাই আজ উপরে উল্লিখিত সা[illegible] লক্ষণের মাপকাঠিতে 'লোক-সাহিত্য' নামে একটি বিশিষ্ট সাহি[illegible]কৃতিকে [illegible]চিহ্নিত করা ছাড়া উপায় নেই।

বাংলা সাহিত্যে লোক মানসের প্রতিফলন ঘটেছে গীতিকা সাহিত্যে। আমাদের মনে হয় এই গীতিকাগুলোতে একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের মৃত্তিকাচারী মানুষের অপরিমার্জিত, নিছক প্রাণাবেগ তাড়িত, শাস্ত্রবিধি বহির্ভূত জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত শৈল্পিক অভিব্যক্তি ঘটেছে। এই অর্থে গীতিকাগুলো লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। একে বলতে পারি :—"The culture of the

backward elements in civilised societies"। গীতিকার মধ্যে বৈষ্ণবীয় চেতনার চকিত স্ফুরণ মাঝে মধ্যে দেখতে পাই, অভিজাত-অনভিজাত ভাব-সংস্কৃতির সমন্বয় লক্ষণ দেখতে পাই, তার দ্বারা এমন মনে করা ঠিক হবে না যে, আধুনিক কবি-শিল্পী বেনামদারে এগুলো রচনা করেছেন। আমাদের মনে হয় চৈতন্য-সংস্কৃতি সমগ্র সমাজস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল, লোকজীবন নিজস্ব গতি বলে তার যতটুকু আত্মসাৎ করে জীবনের অঙ্গীভূত করেছিল ঠিক ততটুকুর সাবলীল প্রকাশ ঘটেছে গীতিকা সাহিত্যে। কাজেই তা লোক-সংস্কৃতিরই সম্পদ। তাই গীতিকাগুলোকে স্বচ্ছন্দে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হল গীতিকা সাহিত্যে অপরিমার্জিত, চিৎপ্রকর্ষহীন, অরুগ্ন, বলিষ্ঠ জীবনানুভূতি চৈতন্য-সংস্কৃতিকে সাধ্যমতো আত্মসাৎ করে প্রকাশিত হলেও জীবন জিজ্ঞাসার প্যাটার্নের মৌলিক রূপান্তরণ ঘটে নি। অর্থাৎ চৈতন্য-সংস্কৃতির দেববাদ নির্ভর মানবতার প্রকাশ এখানে নেই—বরঞ্চ ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতার (Humanism) প্রকাশ ঘটেছে। গীতিকা সাহিত্যের অভিনব বৈশিষ্ট্য এইখানে।

ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার বিষয়বস্তু ও কাব্যমূল্য ঃ

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় মোট ৫৪টি পালাগান সংগৃহীত হয়েছে। পালাগানগুলোকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া যেতে পারে ;—(ক) লৌকিক প্রণয় গাথা, (খ) ইতিহাস-নির্ভর রোমান্টিক আখ্যান, (গ) ঐতিহাসিক আখ্যান। এ ছাড়াও রূপকথা জাতীয় রচনা, সাঁওতাল হাঙ্গামা ঘটিত রচনা, হাতীখেদা বিষয়ক রচনাও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে লৌকিক প্রণয়ঘটিত কাহিনীর প্রাধান্য কি পরিসংখ্যানের দিক থেকে, কি শিল্প-মূল্যের বিচারে সমধিক। এই কাহিনীগুলোতে প্রেমের দুর্মর আবেগ, প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের পথে নানা বাধা-বিপত্তি, দৈবের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম, প্রেমের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, আত্মত্যাগ, অপর দিকে কাজী-দেওয়ানের ব্যাভিচার, রক্তাক্ত প্রতিহিংসা নাটকীয় ঘটনা সন্নিবেশে [illegible] হয়ে উঠেছে। কবি-শিল্পীরা কাহিনীর আনুপূর্বিক স্তর পরম্পরা বিবৃত না করে ঘটনার কয়েকটি সংকট-পূর্ণ লগ্নের উপর আলোকপাত করেছেন, ঐ বিশেষ বিশেষ মুহূর্তগুলো অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত হয়ে সামগ্রিক রসাবেদন সৃষ্টি করেছে। নাটকীয় চমৎকৃতির জন্য ঘটনার উত্থান-পতন একমুখীন অনিবার্য পরিণতি গভীরভাবে আমাদের অভিভূত করে। প্রেম-গাথার অন্তর্নিহিত মানবিকতা আমাদের আবিষ্ট করে। প্রেমের

ব্যর্থতাকে কোনও অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত করে অলৌকিক সান্ত্বনা পাওয়ার প্রয়াস এখানে নেই। মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, মদিনা, লীলা, কঙ্ক সকলেই লৌকিক জীবনের মাপকাঠিতে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা-ব্যর্থতা অনুভব করেছে। "কেন প্রেম নাহি পায় আপনার পথ" মানবাত্মার অশান্ত ক্রন্দন পালাগানগুলোর ভিত্তি রচনা করেছে। তাই বলা হয়েছে,—"There is no afterlife for ballad Characters, and nothing more valuable than the happiness of earthly union."। এই বিশুদ্ধ মানবিকতা গীতিকাকে কাব্যগুণান্বিত করেছে। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে,
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব—
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি
ছিন্ন পালের কাছি
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যেটি ভাবের বিষয়, লিরিক নির্যাস গীতিকায় তারই প্রকাশ ঘটেছে ঘটনা-সংবেগের উত্থান-পতনে, জীবনের বাস্তব জবানীতে। গীতিকার নায়িকারা প্রেমের অমোঘ আকর্ষণে যে কোনও কঠিন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে, চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করেছে শেষ পর্যন্ত "প্রেম মৃত্যুঞ্জয়" ঘোষণা করে রক্তাক্ত বিলুপ্তির ভিতর দিয়ে বেদনাবিধুর ভাব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এই প্রেমের কোনও জাতি নেই, ধর্ম নেই এক সার্বভৌম জীবন সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই ধর্ম নিরপেক্ষ আবেদন গীতিকাকে রসোত্তীর্ণ করে দিয়েছে। সহজ কথায় বলা যেতে পারে মানুষের মৌলিক বৃত্তির সাধারণীকৃতি সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ:

আমাদের বাস্তবিক জীবনধারার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় যোগ রয়েছে। জীবনের ঘটনাস্রোত, হাট-বাজার, আহার-নিদ্রা, ঈর্ষা-প্রেম যেমন বাস্তব তেমনই বাস্তব ঋতুরঙ্গ, গাছপালা, জল, মাটি, আকাশ। প্রকৃতি ও জীবন

পরস্পরের পরিপূরক। এটাও তো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে মনের অবস্থার প্রকৃতি উপভোগ্যতার তারতম্য ঘটে। কোনও কারণে মন বিমর্ষ থাকলে যে বর্ষা বিরক্তিকর মনে হয়, কোনও সময়ের উৎফুল্ল মুহূর্তে ঐ বর্ষা-ই "অকারণ পুলকে" মন ভরে দেয়। তাই প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে জীবনের যে রূপ পাওয়া যায় তা খণ্ডিত, বাস্তবের রূপকে তা পরিস্ফুট করে না। কাজেই যে সাহিত্য জীবনকে অখণ্ডভাবে ব্যক্ত করে সেখানে মানুষ ও প্রকৃতি অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা থাকে। ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকায় প্রকৃতি ও মানুষ অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা পড়েছে।

এই গ্রন্থের নায়ক-নায়িকারা গ্রামের সজল-স্নিগ্ধ পরিবেশে দুই চোখ মেলে দেখেছে আম-জাম-বাঁশ বনের ঘন ছায়াচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা, অনুভব করেছে মাটির নমনীয়তা, কান পেতে শুনেছে পাখীর কলস্বর, অনুভূতিতে রাঙিয়ে তুলেছে শরতের টুকরো মেঘের পরতে পরতে অস্তোন্মুখ সূর্যের সোহাগের বর্ণালী নৃত্য। এই গ্রামগুলোর ঝাড়ে-জঙ্গলে আড়াল করা হাজার গল্প, খাল-বিল-নদীর তরঙ্গশীর্ষে লক্ষ অশ্রুর ঝিকিমিকি। ময়মনসিংহের এই গ্রাম্য প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষ জীবনের পসরা বিছিয়ে বসেছে। নায়ক-নায়িকার সুখে-দুঃখে এই প্রকৃতি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। লীলা-কঙ্কের আনন্দে নদীতে উজান বয়, কুমুদ-কহ্লার, নাগকেশর সূর্যের দিকে মাথা তোলে, আবার তাদের দুঃখে:

"মালতি-মল্লিকা পড়ে ঝরিয়া ভূতলে।
ভ্রমরা উড়িয়া যায় নাহি বসে ফুলে॥"

চাঁদ বিনোদ যখন উপবাসী থেকে জলভরা চোখে কুড়া শিকার করতে যায়, তখন বাঁশ ঝাড় নুয়ে পড়ে তাকে যেন সান্ত্বনা দেয়। ঝাড়জঙ্গলে ঘেরা জলের নীলাভ-কান্তি দেখতে দেখতে চাঁদ বিনোদ ক্লান্তি-অবসাদ ঝেড়ে ফেলে, সেই অবসরে চাঁদ বিনোদ ও মলুয়ার প্রেম-পদ্মটি দল মেলেছে। সায়াহ্নের বিষাদ আনন্দস্পৃষ্ট প্রকৃতির রাত্রির মৌন গভীরে আত্মাবলুপ্তির কালে কমলা গৃহত্যাগ করেছে। পড়ন্ত বেলার বিষাদঘন ছায়া কমলার বেদনাকে ঘনীভূত করেছে। আবার শেষরাতের অস্ফুট আলোক, মেঘাবৃত আকাশের ভয়াবহ সমাচ্ছন্নতার পটভূমিকায় নদের চাঁদকে হত্যা করবার নিষ্ঠুর সংকল্পের মধ্যেও মানসিক দোলাচলতার রহস্যময়তার প্রকাশ ঘটেছে এইভাবে:

"ডুবিল আসমানের তারা চান্দে না যায় দেখা।
সুনালী চান্নীর রাইত আবে পড়ল ঢাকা॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কায করিল।
বাপের হাতের ছুরি লইয়া ঠাকুরের কাছে গেল ॥"

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উদার আস্তরণের তলায় চাপা পড়ায় কর্কশ, গ্লানিকর, ভয়াবহ বিষয়বস্তু এমন কি মৃত্যু বর্ণনাও এক সাংকেতিক স্বপ্নময়তায় আমাদের আবিষ্ট করে, যেমন :

"বৈকালীন রাঙা ধনু মেঘেতে লুকায়।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু শয্যাতে শুকায় ॥"

জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব রামধনুর উপমায় মধুর হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর ভয়াবহতা ভুলে আমরা উপমা-মাধুর্যের আস্বাদন করি।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন,—"উপমান-উপমেয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেন এই অন্তরঙ্গ সাদৃশ্যরসে বিগলিত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে বিলীন হইয়াছে।" এই কাব্যে প্রকৃতির রাজ্য থেকে উপচয়িত উপমাগুলো চরিত্রের প্রাণ রহস্যের দ্যোতক।

এই কাব্যের নায়ক-নায়িকারা এই অঞ্চলের নদ-নদী, হাওর, অরণ্যের মানব-মানবী মূর্তি। ময়মনসিংহের বিশিষ্ট অঞ্চলটি চরিত্রগুলোর ভিতর দিয়ে কথা বলে উঠেছে। চরিত্রগুলো ঐ বিশেষ পরিবেশের শক্তি ও সত্তার প্রতীক হয়ে উঠেছে ;—তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও ঘটনাগত ঘাত-সংঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঐ বিশেষ অঞ্চলের স্বাভাবিক ফসল। চরিত্রগুলোর ভিতরে Elemental force-কে অনুভব করা যায়। দুর্মর প্রাণাবেগ ময়মনসিংহের প্রাকৃতিকতার ভিতর থেকে চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। একে বলা যেতে পারে,—"The inevitable outcome of a special environment"।—আঞ্চলিকতার দ্বারা চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও রসাবেদনে তা স্থানিকতাকে অতিক্রম করে গেছে। কারণ এর ভিতরে মানুষের আদিম জীবন-পিপাসার অভিব্যক্তি ঘটেছে।

এখানকার প্রকৃতি বর্ণনায় কবিরা ঘাস থেকে আরম্ভ করে জংলী লতাভারানত বাঁশবনের ঝরকার রন্ধ্রপথে ভীরু দৃষ্টি প্রসারিত পূর্ণিমার জ্যোছনা বিস্তারে, ধানের ক্ষেতে, পদ্মের [illegible]নে বাতাসের দৌরাত্ম্যে লজ্জা-ললাম উচ্ছ্বাসে, মালতি-মল্লিকার সলজ্জ কানাকানিতে, কষিত কৃষ্ণ মেঘান্ধকারের ভয়াচ্ছন্নতায়, সোনালী সূর্যের ঝিকিমিকিতে বাংলার প্রকৃতির চিত্রলেখা এবং তার সঙ্গে মানুষের জীবনের নাড়ীর যোগ ছন্দে, সুরে, উপমায়-অলঙ্কারে উৎসারিত করে আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন। এই দিক থেকেও গীতিকাগুলোর কাব্যমূল্য অসামান্য।

এতদ্ব্যতিরেকেও পল্লীকবিরা সামনে ছড়িয়ে থাকা জীবনধারা থেকে যে

শব্দ-চয়ন করেছেন, জীবনের সঙ্গে সাযূজ্য রেখে যে রকম নৈপুণ্য সহকারে ব্যবহার করেছেন তাতে কাব্যজগতের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে "আঞ্জল কাজল মেঘ", "ঝিল্‌কি ঠাডা পড়ে", "দাগল দীঘল কেশ", "লীলারি বাতাস" ইত্যাদি বাক্যাংশ স্মরণ করা যেতে পারে। এই বাক্যাংশগুলো চকিতে সৌন্দর্যের যে ঝিলিক মেরে যায় তা আমাদের মুগ্ধ করে। গোত্রহীন মহুয়ার পরিচয় এই ভাবে বিবৃত হয়েছে :

"নাই আমার মাতাপিতা গর্ভসোদর ভাই।
সোতের হেওলা অইয়া ভাইস্যা বেড়াই॥"

'সোতের হেওলা' উপমাটি পরিচয় দেওয়ার পবিবেশ এবং মহুয়ার যাযাবর জীবনের সঙ্গে সাযূজ্য লাভ করেছে। আবার :

"হাতেতে সোনার ঝাড়ি বর্ষা নামি আসে।
নবীন বরষা জলে বসুমাতা ভাসে॥
সঞ্জীবন সুধারাশি কে দিল ঢালিয়া।
মরা ছিল তরুলতা উঠিল বাঁচিয়া॥"

প্রথম পঙক্তির কাব্য সৌন্দর্য চকিতে আমাদের আবিষ্ট করে ফেলে। গীতিকার কাব্যমূল্য বিচারে নতুন শব্দের ব্যবহার, বাক্যযোজনারীতির নৈপুণ্য স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ ভাব ও রূপেব সারূপ্য সাধনে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয়। গীতিকাগুলোতে এই সারূপ্য সাধন ঘটেছে।

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকার সমাজ-জীবন ঃ

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা নারী-প্রধান। নারী-প্রাধান্যের দিকে নজর রেখে অনেকে বলেছেন গীতিকাগুলো মাতৃ-প্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি। এতটা সরলীকরণ আমরা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না। কারণ বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থাই মাতৃ-তান্ত্রিক। বাংলা সাহিত্যও নারী-প্রধান। বাংলা সাহিত্যে শক্তির উজ্জ্বল চিত্র বৈষ্ণব কাব্য থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আঁকা হয়েছে। ব্যাপারটা শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো এত সহজ ও স্বাভাবিক যে তা নিয়ে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন হয় নি। কাজেই গীতিকাগুলোর উৎস হিসাবে মাতৃকা-প্রধান সমাজ ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দেওয়ার কোনও যুক্তি আছে বলে মনে করতে পারি না। বরঞ্চ বলা যেতে পারে বাঙালীর মৌলিক স্বভাবের অঞ্চলভেদে রূপভেদ ঘটেছে। বৈষ্ণব কাব্য থেকে সুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অভিজাত সাহিত্যে আর্যেতর ও

আর্য সংস্কৃতির এবং পরবর্তীকালের য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ভিতর দিয়ে বাঙালীর মৌল স্বভাব নবমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। পক্ষান্তরে গীতিকাতে মৌল স্বভাব অনেকটা আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৈষ্ণব কাব্যাদির সঙ্গে গীতিকার যে তফাৎ চোখে পড়ে সেইটা সাংস্কৃতিক অগ্রগতির স্তরভেদ সম্পর্কিত। তাছাড়া লৌকিক প্রেমের গল্প বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিল, মুখে মুখে সে কাহিনী চলে আসছিল, কোনও কবির প্রতিভাস্পর্শে সেগুলো ধীরে ধীরে ব্যালাডে রূপান্তরিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকায় যে সমাজ চিত্র দেখতে পাই, সেই সমাজ স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধি-বিধান বহির্ভূত; প্রচণ্ড প্রাণাবেগ চঞ্চল। প্রাণাবেগের প্রবল অভিঘাতে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের গণ্ডিকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। এখানে কাজী-দেওয়ানের যে অত্যাচারী মূর্তি দেখতে পাই তা সমাজবিধির মানবরূপ নয়—ইতর প্রবৃত্তির ভয়াবহতা ব্যক্তি চরিত্রের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মহুয়া, মলুয়া, লীলা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রেরণায় জীবন পণ করেছে। কোনও কোনও সমালোচক প্রিয়তমের জন্য আত্মত্যাগের মহিমাকে সতীত্ব মহিমার প্রকাশ বলে মনে করেছেন। আমরা তা মনে করি না। কারণ মাতৃতান্ত্রিকতার কথা স্বীকার করবার পর ঐ কথা খাটে না। কেননা, মাতৃতন্ত্র কথাটি স্বীয় অর্থে পরিস্ফুট। সমাজ মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত। সেখানে ঐ বিশিষ্ট অর্থে স্বৈরাচারের কোনও অবকাশ নেই। স্বৈরাচার স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের আপেক্ষিকতায় প্রতিষ্ঠিত। মাতৃতন্ত্রে স্বামীর Conception অনুপস্থিত। কাজেই ব্যভিচার অর্থহীন। দ্বিতীয়তঃ সতীত্ব কথাটি সামাজিক আদর্শবোধের ফল—দেহ ও মনের সহজবৃত্তি নয়। অথচ গীতিকাতে দেহ-মনের সহজ আকর্ষণের কথাই বলা হয়েছে। সহজ প্রেমের আকর্ষণে মানুষ-মানুষীর নিগূঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেম অর্থ সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা। গীতিকায় দেখা যায় সঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা আরেক ধাপ এগিয়ে স্বামীরূপে পরিণতি লাভ করেছে। প্রেম ও প্রেমের আধারের মধ্যে দুর্লভ সাযুজ্য লাভ ঘটেছে, তাই প্রেমিকের জন্য আত্মত্যাগের প্রেরণা সহজভাবে অন্তর থেকে এসেছে—কোনও আরোপিত আদর্শ প্রেরণা থেকে নয়। তাই আধুনিক Sophisticated চিন্তার অনুসারিতায় সতীত্বের মহিমা আরোপ করা বোধ করি উচিত নয়। মনে রাখা দরকার আমাদের সামাজিক স্তরে শাস্ত্রশাসন সতীত্ব ব্যাপারটাকে বাধ্যতামূলক আদর্শে রূপান্তরিত করেছে, পক্ষান্তরে গীতিকার অভিব্যক্ত সমাজে প্রাণ-প্রাবল্যের সহজ সুরেই

তা প্রকাশিত হয়েছে। বলা যেতে পারে স্বাধীন প্রেম ক্লাসিক প্রেমের রূপ পেয়েছে। নারীর প্রেমের একনিষ্ঠতা মনুষ্যত্বের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এরই Sophisticated প্রকাশ ঘটেছে আধুনিক কথা-সাহিত্যে। সেখানে নারীর বাসনা-সংস্কার এবং স্বাধীন প্রেমের দেহ-প্রাণ বিদারী রক্তাক্ত দ্বন্দ্বের চিত্র আমরা পেয়েছি। তার বিচিত্র বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা দেখেছি।

উপসংহার ঃ

মধ্যযুগের সাহিত্য ধর্মীয় বাতায়নতলে রচিত হয়েছে। কোথাও ধর্মীয় দার্শনিক তত্ত্ব, কোথাও সাধনতত্ত্ব কাব্যছন্দে উৎসারিত হয়েছে। ফলে কাব্য বিশেষে অর্থ-গূঢ় পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার সর্বথা কাব্যানুমোদিত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। এই কালের সৃষ্ট গীতিকা-কাব্য এক বিচিত্র ব্যতিক্রম। সার্বভৌম জীবন সত্যের উপর ভিত্তি করে গীতিকা-কাব্য রচিত হয়েছে। অন্য নিরপেক্ষ মানবিকতা, পার্থিবতা যার স্বাস্থ্য, দৈবের নিষ্ঠুর পীড়নে যা মৃত্যু-করুণ, তাই এই কাব্যের মূল সুরকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। পরবর্তীকালে এই সুরের যুগোচিত রূপান্তরণ ঘটেছে কথা-সাহিত্যে। সাহিত্যে এর সুদূর প্রসারী পরোক্ষ, গোপন প্রভাবকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এইজন্যেও গীতিকা-কাব্যগুলি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

● অষ্টম অধ্যায় ●

নাথ সাহিত্য

নাথ ধর্মের স্বরূপ ও সাধনা ঃ

নাথ সাহিত্য নাথ ধর্মচিন্তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নাথ ধর্মের স্বরূপ ও সাধনার কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে যে কায়া-সাধনার দ্বারা পার্থিব ভোগের পথ নিষ্কণ্টক করা এই ধর্মের সাধকদের লক্ষ্য। তাঁরা মুক্তি চান না। এই দিক থেকে ভারতীয় ধর্ম সাধনায় "উল্টা-সাধন" নামে যে সাধন প্রক্রিয়া সুচিরকাল ধরে চলে আসছে তার সঙ্গে একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত নাথ-পন্থীদের ধর্ম সাধনার নিগূঢ় ঐক্য রয়েছে। যোগ-সাধনার মূল কথাটি হল প্রকৃতির বন্ধনমুক্তি। এতদ্বারা জরামরণ-রহিত অবস্থায়, প্রাকৃত সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে জগতে বিচরণ করা যায়। প্রকৃতির স্রোত বহির্মুখীন প্রকৃতি আমাদের সামনে ক্ষণস্থায়ী ভোগের অজস্র উপকরণ ছড়িয়ে রেখেছে, আমরা সাধারণতঃ তাতেই গা ঢেলে দিতে চাই। প্রকৃতির প্ররোচনায় আমাদের ঐ প্রবণতা দেখা দেয়। প্রকৃতির ফাঁদে পা দিলে নানা ধরণের অভাববোধের দ্বারা আমরা পীড়িত হই। ঐ পীড়ন হল দুঃখবোধের কারণ। এই পীড়ন থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রকৃতির বহির্মুখীন স্রোতকে অন্তর্মুখীন করতে হয়, স্রোতের এই মুখ ফেরানোকে বলে "উল্টা-সাধন"। আত্মসংহরণের দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্য রুদ্ধ হয় তারপর স্তর পরম্পরায় প্রকৃতি চেতনা লুপ্ত হয়ে যায়, মানুষ দিব্য-জীবন লাভ করে। চিত্তবৃত্তি নিরোধকে বলে যোগ। যোগ-সাধনার স্তর পরম্পরায় যোগশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। এই সাধনা দেহকেন্দ্রিক বলে কায়-সাধনা বলা হয়েছে। এই সাধনা প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে। নাথ ধর্ম সাধনায় এরই একটি বিশেষ স্তরের প্রতিফলন ঘটেছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন,—"The Nath Cult seems to represent a particular phase of the Siddha Cult of India. This Siddha Cult is a very old religious Cult of India with its main emphasis on a psychochemical process of Yoga, known as the Kāyā-Sādhanā or the culture of body with a view to making it perfect and immutable and thereby attaining an immortal

spiritual life." যোগ-সাধনার স্তর পরম্পরার একটি বিশেষ পর্যায় এসে 'অষ্টসিদ্ধি' লাভ হয়। 'অষ্টসিদ্ধি' লাভ হলে অলৌকিক ক্ষমতা করায়ত্ত হয়। একে বলে যোগ-বিভূতি। এই স্তরেও প্রকৃতির প্ররোচনা আছে। নাথ সিদ্ধাইরা এই বিশেষ স্তর পর্যন্ত এসে থেমে গেছেন। 'অষ্টসিদ্ধি' লাভের দ্বারা পার্থিব ভোগের পথকে নিষ্কণ্টক করাই তাঁদের লক্ষ্য—দিব্য-জীবন লাভ বা মোক্ষ নয়। নাথ সাহিত্য পাঠ করলে আমাদের এই ধারণাই দৃঢ় হয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—"ইহার আধ্যাত্মিক আদর্শ যে খুব উচ্চ ছিল তাহা বলা যায় না। প্রাকৃত মন যে অবাধ ভোগসুখের জন্য লালায়িত যোগ-বিভূতির দ্বারা তাহারই পরিতৃপ্তিকে অনায়াসলভ্য করাই ইহার আসল কাম্য।" আমরা সহজভাবে বলতে পারি নাথযোগীরা সুখকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চেয়েছেন—আনন্দের সন্ধান করতে চান নি। মাণিকচন্দ্রের অকাল মৃত্যু ঘটলে ময়নামতী যোগ-বিভূতির সহায় যমের সঙ্গে অসম এবং উদ্ভট সমরে প্রবৃত্ত হয়েছেন, পুত্র গোপীচাঁদকেও অকাল মৃত্যু এড়াবার কৌশল হিসাবে যোগ-সাধনায় প্ররোচিত করেছেন। মীননাথ, হাড়িপা, কানুপা সকলেই বিশেষ সিদ্ধাই লাভ করেও প্রকৃতির প্ররোচনা এড়াতে পারেন নি।

নাথ সাহিত্যের কালবিচার ঃ

নাথ সাহিত্যের লিখিত রূপ ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডঃ গ্রীয়ার্সন রংপুর থেকে পুঁথি আবিষ্কার করেন। এই পুঁথিতে রাজা মাণিকচন্দ্র, রাজপত্নী ময়নামতী ও রাজপুত্র গোপীচন্দ্রের জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে—"The Song of Manik Chandra" নামে। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে "ময়নামতীর গান" "গোপীচন্দ্রের গীত" "মাণিকচাঁদের গীত" নামে একই কাহিনীর নানা পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুন্সী আব্দুল করিম "গোরক্ষ বিজয়" নামে একটি কাব্য-কাহিনী প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামদাস সেন রচিত "মীন চেতন" কাব্য প্রকাশ করেন। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে নাথ ধর্ম সংক্রান্ত পুঁথিগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রাপ্ত পুঁথিগুলোর লিপিকাল বিচার করে ডঃ সুকুমার সেন নাথ সাহিত্যকে অষ্টাদশ শতকের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। লিপিকাল বিচারের দ্বারা নিঃসংশয়ে কাল নির্ণয় করা সর্বথা নিরাপদ নয়। এই নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়েছে। কারণ রাজা মাণিকচন্দ্রকে অনেকে

ঐতিহাসিক ব্যক্তি মনে করেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন এবং ডঃ গ্রীয়ার্সন গোপীচাঁদকে একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক বলে মনে করেছেন। তাই যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে স্বীকার করতে হয় পিতা মাণিকচন্দ্র তারও পূর্ববর্তী। আবার কানুপা, হাড়িপা, মীননাথ ইত্যাদির আবির্ভাব দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্ত-ভাগবত'-এ যোগীপালের গীতের উল্লেখ রয়েছে, এই গীত নাথ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। নাথ সাহিত্যে ইসলামী প্রভাবও নেই। কাজেই এমন মনে করা অযৌক্তিক হবে না নাথ সাহিত্যের সৃষ্টি তুর্কী বিজয়ের আগেই হয়েছে। এবং এটাও যুক্তিসিদ্ধ যে, নাথ ধর্মের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে নাথ সাহিত্যের জন্ম। তাহলে স্পষ্টই নাথ সাহিত্যের লিপিকাল এবং জন্মকালের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধ নিষ্পত্তি এইভাবে করা যেতে পারে যে নাথ ধর্মের সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশলগ্নে গোরক্ষনাথ-মীননাথ, গোপীচাঁদ-ময়নামতীর কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, পরবর্তীকালে লিখিত হয়ে থাকবে এবং সেইটি আমাদের হস্তগত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাই নাথ সাহিত্যের দুইটি রূপ পাশাপাশি চলে এসেছে, একটি মৌখিক লোক-সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত রূপ, অপরটি প্রাপ্ত সাহিত্যিক রূপ। অবশ্য সাহিত্যিক রূপের মধ্যেও লোক-সাহিত্যের স্বভাবধর্মও আভাসিত হয়েছে—যদিও তার বিশুদ্ধ রূপটি রক্ষিত হয় নি। বিশ্ব-সাহিত্যে কুত্রাপি ঐতিহাসিক কারণে লোক-সাহিত্যের বিশুদ্ধ রূপটি পাওয়া সম্ভব নয়। সে যাই হোক না কেন, এই জাতীয় সাহিত্যের কাল বিচার অনুমানের উপর ভর করে থাকে, কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা চলে না। সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিরাপদ নয় বলে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষ করে লিখেছেন,—"কোন প্রাচীন গ্রন্থকার সম্বন্ধে এরূপ একটি নিশ্ছিদ্র প্রমাণ-পঙ্ক্তীর লুপ্ত রত্নোদ্ধার খুব বিরল ও আশাতীত দৈবপ্রসাদ বলিয়াই ঠেকে। কোন পূর্ব হইতে সুপরিকল্পিত আয়োজনও এত নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তির দ্বারা পুরস্কৃত হইত কি না সন্দেহ।" কাজেই ঐরূপ কটাক্ষের বাইরে থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, নাথ সাহিত্যের জন্মকাল তুর্কী বিজয়ের পূর্বে এবং দশম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এবং তা লিখিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকে।

॥ গোরক্ষ বিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান ॥

কাব্য পরিচয় :

নাথ সাহিত্যকে মোটামুটিভাবে দুইভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। (১) গোরক্ষনাথ সম্পর্কিত রচনা, (২) গোপীচন্দ্রের গান। "গোরক্ষ বিজয়" কাব্যটিতে গল্পের কাঠামোতে তত্ত্বের পরিবেষণ সমধিক প্রাধান্য লাভ করেছে। 'গোপীচন্দ্রের গান' তত্ত্ব বিরহিত নয়, তবুও মানব রসের (human interest) আপেক্ষিক প্রাধান্যের জন্য রসিক চিত্তের সমাদর লাভ করেছে। আমরা বর্তমানে গ্রন্থ দুইটির সামান্য আলোচনা করব।

ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল গোরক্ষনাথ সংক্রান্ত কাব্যটিকে 'গোর্খ বিজয়' নামে প্রকাশ করেছেন। গোর্খ নামটি কাব্যের ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে। এই কারণে ডঃ মণ্ডল মনে করেছেন কাব্যের নাম 'গোর্খ বিজয়' হওয়া উচিত—"গোরক্ষ বিজয়" নয়। আপাতঃভাবে ডঃ মণ্ডলের বক্তব্য যুক্তিসহ বলে মনে হয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় পারিপার্শ্বিক প্রমাণ তাঁর বক্তব্যের সমর্থন করে না। কারণ গোরক্ষনাথের কাহিনী ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং সর্বত্রই নামটি হচ্ছে 'গোরক্ষ'—'গোর্খ' নয়, সম্ভবতঃ উচ্চারণ বিকৃতির ফলে 'গোরক্ষ'—'গোর্খ' হয়ে গেছে। তাই আমাদের মতে গ্রন্থটির নাম "গোরক্ষ বিজয়" হওয়াই ঠিক। তাছাড়া আব্দুল করীম সাহেব, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী গ্রন্থের নাম "গোরক্ষ বিজয়" হবে না "মীন চেতন" হবে তা নিয়ে তর্ক তুলেছেন, ঐ তর্ক প্রসঙ্গে তাঁরা গ্রন্থটিকে "গোর্খ বিজয়" বলেন নি, বলেছেন "গোরক্ষ বিজয়"। এর থেকেও আমরা "গোরক্ষ বিজয়" নামটিকে যথার্থ বলে মেনে নিতে পারি। এই কাব্যের রচয়িতা শেখ ফয়জুল্লা, ভীমসেন কবিরা।

কাহিনী :

"গোরক্ষ বিজয়"-এর গল্পাংশটি হল এই :— আদি নিরঞ্জনের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিব, মীননাথ, হাড়িপা ও কানুপার জন্ম হল। নিরঞ্জন আবার নিজের দেহ থেকে সৃষ্টি করলেন গৌরীকে। শিবের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে হল। মীননাথ ও হাড়িপা শিবের, গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কানুপা হাড়িপার কাছে দীক্ষা নিয়ে যোগাভ্যাসে রত হলেন। পার্বতী মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা এই চারজনের চরিত্রবল পরীক্ষা করতে চাইলেন। এই পরীক্ষায় একমাত্র গোরক্ষনাথ ছাড়া আর কেউ উত্তীর্ণ হতে পারলেন না।

ফলে পার্বতী মীননাথকে অভিশাপ দিলেন কদলীর রাজ্যে গিয়ে স্ত্রী সহবাসে ইতর ভোগময় জীবন যাপন করতে। হাড়িপাকে শাপ দিলেন রাণী ময়নামতীর হাড়িবৃত্তি করতে, কানুপাকে বললেন সৎমাকে ভজনা করতে। এরপর গোরক্ষনাথকে তিনি আর এক কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন। এই পরীক্ষার জন্য পার্বতী অত্যন্ত ঘৃণিত উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। এতেও গোরক্ষনাথ উত্তীর্ণ হলেন এবং পার্বতীকে অভিশাপ দিয়ে রাক্ষসীতে রূপান্তরিত করলেন। এদিকে শিব নিজের স্ত্রীকে আর খুঁজে পাচ্ছেন না, তিনি এসে গোরক্ষনাথকে ধরলেন, গোরক্ষনাথ বললেন :

"ভাঙ ধুতুরা খাও কি বলিব তোরে।
কোথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে ॥"

যাই হোক শেষ পর্যন্ত গোরক্ষনাথ দেবীকে রাক্ষসীর জীবন থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু শিব মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। এই অপমানের শোধ নেওয়ার জন্য বিরহিণী নাম্নী এক রাজকন্যার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গোরক্ষনাথের সঙ্গে তার বিয়ে হবে বলে বর দিলেন। শিবের বর অমোঘ। গোরক্ষনাথের সঙ্গে বিরহিণীর বিয়ে হল। কিন্তু গোরক্ষনাথের ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গ করানো গেল না। গোরক্ষনাথ যোগবলে নিজেকে ছয় মাসের শিশুতে পরিবর্তিত করে স্তন্যধারা পানের জন্য বায়না ধরলেন। নব-বিবাহিতা বধূ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তখন গোরক্ষনাথ নিজের আসল পরিচয় দিয়ে বিরহিণীকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ করে এবং পুত্রলাভের উপায় বলে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। পথে কানুপার সঙ্গে তাঁর দেখা হল, কানুপা তাঁকে শাপগ্রস্ত মীননাথের অবস্থা জানালেন। এইবার গোরক্ষনাথ কদলীর রাজ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলেন মীননাথ নারীসঙ্গ ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে আছেন। গুরুকে কায়া সাধনায় উদ্বুদ্ধ করবার জন্য নর্তকীর ছদ্মবেশে মাদল বাজিয়ে নাচগান সুরু করলেন। হেঁয়ালীর ভিতর দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের কথা, উল্টা-সাধনার কথা শোনালেন। এর ফলে মীননাথ একবার যোগ-সাধনার জন্য প্রবুদ্ধ হন আবার প্রবৃত্তির রাজ্যে ফিরে যেতে চান। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির দোটানায় পড়ে দুলতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একরকম বাধ্য হয়েই যোগপন্থা গ্রহণ করেন। এইখানে কাহিনীর শেষ। গোরক্ষনাথের বিজয় অভিযান বা মীননাথের চৈতন্য সম্পাদন মূল লক্ষ্য। এই দিক দিয়ে "গোরক্ষ বিজয়" বা "মীন চেতন" নামকরণ সার্থক।

কাব্যমূল্য :

আমরা পূর্বেই বলেছি "গোরক্ষ বিজয়" কাব্যে তত্ত্বের সমধিক প্রাধান্য রয়েছে। কবিশেখর কালিদাস রায় এই তত্ত্বের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বলেছেন,—"বৈরাগ্যের মহাশত্রু মহামায়া। তিনি মায়ায় মুগ্ধ করিয়া জীবকে লালন করেন এবং তাহার দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করেন। মীননাথ মায়ার ছলনায় ভুলিলেন।...মহামায়ার মোহিনীমূর্তি দেখিয়া গোরক্ষনাথের মনে হইল, এমন জননী পাইলে 'তাহার কোলেতে বসিয়া সুখে দুগ্ধ খাই'। মহামায়া মোহিনী-মূর্তিতে সকলকেই মোহিত করিতে আসেন, যে মা বলিয়া তাঁহার চরণে শরণ লয়, সেই বাঁচিয়া যায়।" তত্ত্বের এই দিকটি প্রতীকায়িত হয়েছে গোরক্ষনাথের চরিত্রের ভিতর দিয়ে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্য তো তত্ত্ব প্রকাশের বাহন নয়। সাহিত্যের কারবার জীবন নিয়ে। মানব জীবনের আলো-অন্ধকার, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, স্বপ্ন ও বাস্তব, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির লুকোচুরি সাহিত্যের উপজীব্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখব মীননাথের চরিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়ে মানুষের সবলতা-দুর্বলতা রূপায়িত হয়েছে। যোগভ্রষ্ট মীননাথের চৈতন্য-সম্পাদনের প্রয়াসের ভিতর দিয়ে ফু'ট উঠেছে মীননাথের উৎসাহ-অবসাদ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংকল্পের শিথিলতা ও নৈষ্ঠিকতা, আত্মবিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ওঠানামা, তথা দেহ ও আত্মার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানব রস সৃষ্টি হয়ে। শেষ পর্যন্ত একরকম বাধ্য হয়েই সন্ন্যাস গ্রহণের ভিতরেও দেহ-সংস্কারের চিহ্ন পাহাড়ের গায়ে ফাটলের মতো উঁকি দিয়েছে। এইখানেই এই কাব্যের মানবিকতা,—তথা কাব্যমূল্য।

এই কাব্যের আঙ্গিকে নাটকীয়তা আছে, মানববৃত্তির নিরাভরণ বিস্ফোরণে, প্রকাশের ঋজুতা, আমাদের সহানুভূতি দাবি করে। তথাপি মাঝে মধ্যে দুষ্টরুচির অভিব্যক্তি চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিবিধায়ক না হওয়ায় আমাদের পীড়িত করে। এই প্রসঙ্গে পার্বতীর অসম্বৃত অবস্থায় গোরক্ষনাথকে ছলনা, গোরক্ষনাথের পার্বতীকে শাস্তিবিধান স্মরণ করা যেতে পারে। অবশ্য এর জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে লাভ নেই। কেননা "গোরক্ষ বিজয়" কাব্য সমাজের যে স্তর থেকে উদ্ভূত তাদের অসংযত কল্পনাকে স্বীকার করে নিয়ে কাব্য পাঠ করতে হবে। তাহলে উল্লিখিত ত্রুটি কিছুটা সুসহ বলে মনে হতে পারে।

॥ গোপীচন্দ্রের গান ॥

কাহিনী পরিচয় ঃ

মাণিকচাঁদ নামে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। ময়নামতী নামে এক কন্যাকে বিয়ে করেন। কিন্তু তাতে রাজার ভোগাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত না হওয়াতে তিনি দেবপুরের আরও পাঁচ কন্যাকে বিয়ে করেন। নববধূদের সঙ্গে ময়নার অহরহ বিবাদ লেগে থাকত। রাজা উত্যক্ত হয়ে ময়নাকে রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দিলেন। ফেরুসা নগরে ময়নাকে আলাদা ভাবে বসবাস করবার ব্যবস্থা করে দেন। ময়না গোরক্ষনাথের শিষ্যত্ব নিয়ে যোগাভ্যাসের দ্বারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করে। এদিকে মাণিকচাঁদ ভোগে লিপ্ত রয়েছেন, রাজকার্য দেখেন না, রাজার অমনোযোগিতার সুযোগে নব নিযুক্ত দেওয়ান প্রজাদের উপর অত্যাচার সুরু করে দিল। অত্যাচারিত প্রজাপুঞ্জ আভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা রাজার মৃত্যুবিধান করল। রাজার মৃত্যু আসন্ন জেনে "ধিয়ানের বুড়ি" ময়না রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে অনেক আয়াস স্বীকার করেও রাজাকে রক্ষা করতে পারল না। কৌশলসাধ্য উপায়ে গোদা যম "রাজার জীউ নিল লাংটিতে বান্ধিয়া"। ময়না রাজার আত্মীয় পরিজনকে তাঁর দেহ রক্ষা করতে বলে যমপুরীতে হাজির হল রাজার জীবন ফিরিয়ে আনবার অভিপ্রায়ে। সেখানে যমের সঙ্গে উদ্ভট সমরে প্রবৃত্ত হল, যম নাজেহাল হয়ে শিব গোরক্ষনাথের স্মরণ নিল। শিব গোরক্ষনাথের মধ্যস্থতায় স্থির হল ময়নামতী মাণিকচাঁদের জীবন ফেরত পাবে না, তবে তার একটি পুত্রলাভ হবে। এই পুত্রের আয়ু আঠারো বছর। তবে পুত্র যদি হাড়ি সিদ্ধার শরণ নেয় তাহলে তার অকাল মৃত্যু হবে না। এই পুত্র হল গোপীচাঁদ।

গোপীচাঁদের জন্মের পর ময়নামতী তার নামে রাজ্যশাসন করতে থাকলেন, কিছুকাল পরে নারদের ঘটকালিতে তার বিয়ে দিলেন। বিবাহোত্তর জীবনে গোপীচাঁদ নিজে হাতে রাজ্যভার গ্রহণ করে, দুই স্ত্রীকে নিয়ে ভোগসুখে দিন কাটাতে থাকলেন। এমন সময় ময়নামতী পুত্রকে হাড়িপার শিষ্যত্ব নিয়ে সন্ন্যাস নিতে আদেশ করলেন, যাতে গোপীচাঁদ অকাল মরণ এড়াতে পারে। একে তো সন্ন্যাসের নামেই পুত্রের আপত্তি, তদুপরি হাড়িপার নামে তার আভিজাত্যে বাধলো। গোপীচাঁদ বললেন :

> "ওগো, মা জননি, ডুবালু, মা, জাত কুল আর সর্ব গাঁও।
> বাইশ দণ্ড রাজা হইয়া হাড়ির ধরব পাও ॥"

ময়নামতী হাড়ির গুণকীর্তন করে সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য যতই পীড়াপীড়ি করেন পুত্রও তত ক্রুদ্ধ হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত গোপীচাঁদ হাড়িপা ও ময়নামতীকে জড়িয়ে মাতৃচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। মাতৃচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করবার জন্য গোরক্ষনাথ গোপীচাঁদকে অভিশাপ দিলেন। যাই হোক শেষ পর্যন্ত হাড়িপাকে গুরু মেনে গোপীচাঁদ সন্ন্যাস নিলেন। হাড়িপা তাঁকে নিয়ে পথে বেরোলেন, পথে গোপীচাঁদ অবর্ণনীয় কষ্টভোগ করলেন। হাড়িপা তাঁকে হীরানটীর ঘরে "না তিরি না পুরুষ" করে বাঁধা দিয়ে চলে গেলেন। হীরানটী রাজপুত্রের কাছে ঘৃণিত প্রস্তাব নিয়ে প্রত্যাখ্যাতা হয়ে নির্মম অত্যাচার সুরু করলেন। বারো বছর পর হাড়িপা তাঁকে উদ্ধার করেন, তিনি রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে সুখে রাজ্য করতে থাকেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার গল্পাংশের মূল কাঠামো ঠিক থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাপ্ত পুঁথিতে কাহিনীর সমাপ্তিতে, বিবৃতিতে পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের মনে হয় অঞ্চল বিশেষের কিম্বদন্তীর বৈচিত্র্য-ভেদে এমন রূপভেদ ঘটেছে। আমরা এখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত "গোপীচন্দ্রের গান" গ্রন্থটিকে অবলম্বন করে আলোচনা করেছি। ভবানীদাস, সুকুর মামুদ এই গ্রন্থের রচয়িতা। একজন লিখেছেন "গোপীচন্দ্রের পাঁচালী", অপরজন লিখেছেন "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" এ ছাড়া দুর্লভ মল্লিকের "গোপীচন্দ্রের গীত" উল্লেখযোগ্য রচনা।

কাব্য বিচার ঃ

"গোপীচন্দ্রের গান"-এর সাহিত্য-গুণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন ;—"গোপীচন্দ্রের গান এপিক ধর্মী রচনা—ইহার বিস্তার, ভাবগভীরতা, সমুচ্চ আদর্শ ইহাকে মহাকাব্যের গুণে মণ্ডিত করিয়াছে। যদি মৌখিক মহাকাব্য (Oral epic) বলিয়া কিছু থাকে, তবে গোপীচন্দ্রের গান তাহাই"—এই মন্তব্যে যতটা ভাবাবেগ আছে, ততটা বিচার (Reasoning) নাই। কেননা মহাকাব্যে থাকে গৌরব-সমুন্নতি (Sublimity)। এ গৌরব সমুন্নতি আকারগত (Mathemetical) এবং ব্যঞ্জনাগত (Dynamic)। এই দুয়ের সমীকরণে সামগ্রিক ভাবে মহাকাব্যের আবেদনে চিত্ত উর্ধ্বাভিমুখী হয়—বিশালের সম্মুখীন হয়ে আমাদের তুচ্ছতা ভুলে যাই, আত্মার গহনে মহত্তের আহ্বান আপন মহত্ত্বকে উপলব্ধি করি। গোপীচন্দ্রের গানে মহাকাব্যোচিত

মহিমা নেই। দ্বিতীয়তঃ "সমুচ্চ আদর্শ" বলতে ডঃ ভট্টাচার্য হীরানটীর ঘরে গোপীচাঁদের প্রলোভন জয় করবার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য ;—"একমাত্র পত্নী প্রেমের দুর্জয় শক্তি দ্বারাই রাজপুত্র সকল দুঃখ জয় করিলেন—সন্ন্যাসের পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইলেন।" এই মন্তব্যও বিচার সহ নয়। কারণ কাব্য পাঠে দেখা যাচ্ছে যে, হীরানটীর ঘরে রাজপুত্রকে বাঁধা রাখবার সময় হাড়িপা তাঁকে "না তিরি না পুরুষ" করে যোগবলে তাঁর কাম, ক্রোধ, রতি, মায়া শোষণ করে নিয়েছিলেন। তাই "সন্ন্যাসের পরীক্ষা" হয় নি। প্রেমের সূত্রপাত দেহজ আকর্ষণে, তথা কামবৃত্তি থেকে। যে পুরুষের কাম নেই তার কাছে হীরার আবেদন মূল্যহীন। এমন পুরুষ নারীরূপে আকৃষ্ট হবে না, এমনই স্বাভাবিক। গোপীচাঁদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাছাড়া যে পুরুষ একাধিক বিবাহ করেছেন তাঁর কাছে পত্নীপ্রেমের গৌরব কি আদৌ ছিল? সন্ন্যাস গ্রহণের কালে গোপীচাঁদের ক্রন্দন কি বিরহ-বেদনার আশঙ্কা থেকে উত্থিত হয়েছিল? কখনই নয়,—যৌন-ভোগাসক্তি বাধিত হবে বলেই এই আকুলি-বিকুলি, এবং রাজপুত্রের বয়ঃধর্মের বিচারে এইটেই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে যৌনবোধ অপহৃত হওয়ার পর হীরানটীর গৃহে জড়ের মতো কালাতিপাতে, চরিত্র মাহাত্ম্যের প্রকাশ ঘটেছে বলে আমরা মনে করতে পারি না। "সমুচ্চ আদর্শ" রক্ষা কথাটাই অবান্তর হয়ে পড়ে। কাজেই আলঙ্কারিক বিচারে মহাকাব্যের গুণ এই কাব্যে নেই, "সমুচ্চ আদর্শ" নেই। ডঃ ভট্টাচার্যও একই আলোচনায় স্বীকার করেছেন,—"গোপীচন্দ্রের গান বৃহদায়তন রচনা হইলেও ইহা এপিকের মতো কোন উচ্চ সামাজিক নৈতিক আদর্শ প্রচার করিবার পরিবর্তে গীতিকার মতো নরনারীর মনের প্রেমের শক্তির কথাই প্রচার করিয়াছে।" এখানেও সাহিত্য-তত্ত্বের দিক থেকে গোড়া ঘেঁষা প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ কোন সৎ-সৃষ্টি কিছু প্রচার করে না। প্রচার করা অর্থ হল কোন কিছু সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করা। মোহ মাত্রেই ক্ষণস্থায়ী। অথচ সাহিত্য শাশ্বত। মূল বিরোধ এইখানে। যদি বলা যায় সত্যের প্রচার। তাহলে বলব সত্য স্বয়ম্প্রকাশ। তার প্রচারের বরাত কাউকে দেওয়া হয় নি। "গোপীচন্দ্রের গান"-এর সাহিত্যিক মূল্য অনস্বীকার্য। প্রচারধর্মী হলে সাহিত্য মূল্য অস্বীকৃত হত। দ্বিতীয়তঃ গীতিকায় প্রেমকে কঠিন পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, এখানে তদ্রূপ অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় নি। কাজেই আমাদের মনে হয়, "গোপীচন্দ্রের গান" মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত নয়। মানুষের ভোগলালায়িত জীবনের প্রতি যে সহজ আকর্ষণ রয়েছে তার থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করতে

গেলে মন-প্রাণ বিদ্রোহ করে উঠে, এই অসহায় বিদ্রোহের অমার্জিত কাব্যাভিব্যক্তি ঘটেছে। তাতে জীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে বলেই কাব্য হয়েছে। বিচার এই দৃষ্টিকোণ থেকে করা কর্তব্য।

আমরা দেখেছি রাজপুত্র সন্ন্যাস ধর্ম নিয়েছেন অন্তরের তাগাদায় নয়—মাতার কঠিন নির্দেশে। তাই সন্ন্যাস জীবনেও ফেলে আসা ভোগলিপ্ত জীবনের জন্য তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়েছে। তারই মানবিক আবেদন আমাদের অভিভূত করেছে। মানুষের প্রত্যক্ষ আশা-নিরাশা, আশঙ্কা-বেদনার কথাতেই এই কাব্যটি সার্থক হয়েছে। গোপীচাঁদের চরিত্র পরিকল্পনায় গড়পড়তা মানুষের মায়াপাশ বদ্ধ অবস্থায় সংগ্রামের রক্তক্ষরা কাহিনী বিবৃত হয়েছে। মাতা ও পুত্রের বাদ-বিতণ্ডা, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ নাটকীয় প্রাণময়তায় চরিত্রগুলোকে জীবন্তভাবে উপস্থাপিত করেছে। এর ভিতর দিয়ে আদিম জীবনের বর্বরতা, অসংবৃত ভোগলালসা, কল্পনার আতিশয্যে প্রকাশিত হয়েছে। এই আতিশয্যের জন্য চরিত্র এবং ঘটনার সঙ্গতিও মাঝে মধ্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তথাপি আমরা এই কারণে বিস্মিত হই যে গ্রাম্য কবিরা তত্ত্বকে জীবনরস সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ-তত্ত্ব সাহিত্য বিচারের অন্যতম মানদণ্ড বলে স্বীকৃত। এই মাপকাঠিতে কবিরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুই একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা পরিষ্কার করি,—রাজা গোপীচন্দ্র ও খেতুয়া সহোদর ভাই; খেতুয়া হীন কাজ করে বলে অপাঙক্তেয় নয় বোঝাতে কবি বলেছেন :

> "এক থোবের বাঁশ রাণী নছিবেতে ল্যাখা।
> কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝ্যাটা॥"

আবার ছোট লোক হঠাৎ ধনী হলে :

> "ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড় বিসই পায়।
> টেড়িয়া করে পাগড়ি বাঁধে ছেঁওয়ার দিকে চায়॥
> *   *   *   *
> বাঁশের পাতার ন্যাকান ফ্যারফিরিয়া ব্যাড়ায়॥"

মন্তব্যের তির্যক কটাক্ষ উপভোগ্য। যে লোক কোনদিন রাজ্য পাওয়ার আশা করে নি এমন লোক যদি হঠাৎ রাজ্য পেয়ে যায় তখন সে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সে এমন কাজকর্ম করে, তার চলনে-বলনে এমন অস্বাভাবিকতা দেখা যায় যা আমাদের হাসির খোরাক যোগায়। অথচ সেই বিশেষ লোকটি তৎসম্পর্কে আদৌ সজাগ নয়। খেতুয়া হঠাৎ রাজ্য পেয়ে কি রকম হাস্যকর

আচরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছে সেইটে উপরি উদ্ধৃত পঙক্তিতে রূপ পেয়েছে। আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে খেতুয়ার বিরাট পাগড়ি-বাঁধা চেহারাটা, সে নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের চেহারা দেখছে আর চঞ্চলপদে চলাফেরা করছে। এর ভিতরে ফুটে উঠেছে খেতুয়ার অপ্রত্যাশিত রাজ্যলাভের আনন্দ এবং তজ্জনিত মানসিক ভারসাম্যহীনতা। কবি কৌতুকভরা চোখ দিয়ে সব দেখছেন এবং আমাদের দেখাচ্ছেন। গোপীচাঁদ ধর্মতত্ত্ব বোঝেন না, প্রত্যক্ষগম্য জীবনভোগই তাঁর কাম্য, তাই মাতার সন্ন্যাস গ্রহণের প্ররোচনার প্রতিবাদে বলেন :

> "এত যদি জান মাতা, জরু প্রাণের বৈরী।
> তবে কেন বিবাহ দিলেন এক শত সুন্দরী॥
> এক শত রাণীকে মা, মোর গলায় বান্ধ দিয়া।
> এখন নিয়া যাইতে বল, সন্ন্যাসক লাগিয়া॥"

এই কারণে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে গানের কথা অমার্জিত হলেও মাঝে মধ্যে এমন পঙক্তি আছে যা অন্তর-ছোঁয়া এবং স্পষ্ট। এই দিক থেকেও গোপীচন্দ্রের কাব্যগুণ অনস্বীকার্য। অসংস্কৃত হলেও একটি অর্দ্ধ-সভ্য সমাজের জীবনধ্যানের নৈষ্ঠিক প্রকাশের জন্য "গোপীচন্দ্রের গান" স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাই আমরা আবার বলতে চাই আলোচ্য কাব্যের মহাকাব্যোচিত মহিমা নেই, উচ্চ আদর্শের বিঘোষণ নেই, কিন্তু অদুনা-পদুনা, ময়নামতীর-গোপীচন্দ্রের বাস্তবধর্মী চরিত্র সৃষ্টিতে, গ্রাম্য জীবনের উপমা রূপকের সহায়তায় মনোভাব প্রকাশ গৌরবে, রূপকথাসুলভ আনন্দময় পরিসমাপ্তিতে জীবনের জয় ঘোষিত হয়েছে। এই জীবনধর্মিতা গ্রন্থটিকে কাব্যগুণান্বিত করেছে। চিৎপ্রকর্ষহীন কবির রচনা বলেই এতে স্থূলতার ছাপ পড়েছে, কিন্তু তার দ্বারা জীবনধর্মিতা ক্ষুণ্ণ হয় না।

● নবম অধ্যায় ●

বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের দান

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় ঃ

আমরা সাধারণভাবে রাজবৃত্ত নির্ভর ইতিহাস পাঠে এই ধারণাই করে থাকি যে মধ্যযুগের ইতিহাস হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধ-সংঘাতের রক্ত পিচ্ছিলতায় কলঙ্কিত। মধ্যযুগের হাওয়া-বাতাস বিদ্বেষ-বাষ্পে কলঙ্কিত হয় নি, এমন কথা আমরা বলি না, আমাদের বক্তব্য হল সেইটি আংশিক সত্য, জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়ের দুঃস্বপ্নমাত্র। দিল্লীর কাঞ্চনতক্ত লালসা, হিংসা, ক্ষমতালিপ্সা আর চরম ভোগ-বিলাসের ফেনোচ্ছলতায় কখনও রক্তাক্ত কখনও বা সুরাসিক্ত পিচ্ছিল হত কি না হত বিশাল দেশের জনমানসে তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হত না। কারণ এই দেশের ইতিহাস সমাজ-কেন্দ্রিক। এবং এই সমাজ ধর্মীয় অনুশাসনে মানুষের মঙ্গলামঙ্গলের নিত্য মূল্যবোধের দ্বারা বিধৃত এবং নিয়ন্ত্রিত ছিল। কাজেই সামাজিক ক্ষেত্রে আত্মবিস্তারী ইসলামের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ রক্ষার ক্ষেত্রে বিরোধের ও আপোষের প্রশ্নটি ছিল সমধিক জড়িত। এই মৌল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে এবং সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এই সমন্বয়ের সাধনা বাঙালীর বিশিষ্ট সাধনা। পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে নতুনতর, সমৃদ্ধতর জীবনবোধে উত্তরণই সংস্কৃতি। চলমান জীবনের ছন্দ আপন আবেগে পারিপার্শ্বিকতাকে, বিরোধী ভাব-ভাবনাকে সাঙ্গীভূত করে নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। এই অগ্রসরমানতাই প্রাণের লক্ষণ। বাঙালীর ঐ বিশিষ্ট সাধনার অভিব্যক্তি একটি রূপ যেমন চৈতন্য-সাহিত্যে দেখেছি তেমনই আরেক রূপ দেখেছি মুসলমান কবিদের সারস্বত-সাধনায়। ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী আরাকান রাজ্যে মুসলমান কবিদের আবির্ভাব এবং তাঁদের কাব্যকৃতিতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়মূলক রূপটি অভিব্যক্ত হয়ে বাঙালীর বিশিষ্ট জীবন-সাধনাকে প্রোজ্জ্বল ভাবে তুলে ধরেছে। এই কারণ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ;—"মাঝে মধ্যে ধর্মান্ধতার উগ্র অসহিষ্ণুতা জীবনের শান্তিকে বিঘ্নিত করিয়াছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সহজ প্রীতি ও মিলনকামনাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া উহাদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ও অবিশ্বাসের প্রাচীর

তুলিয়াছে। কিন্তু এই রেষারেষির ভাব সাময়িকভাবে উদ্দীপ্ত হইলেও মধ্যযুগের জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়ম ছিল না। বোঝাপড়া ও মিলনের প্রবল আগ্রহ সমস্ত ধর্মমত ও সমাজপ্রথার পার্থক্য সত্ত্বেও এই প্রতিবেশী সম্প্রদায় দুইটিকে পরস্পরের নিকট আকর্ষণ করিত।" অন্তরের এই মূল প্রেরণা সমন্বয় সাধন ঘটিয়েছে। বাংলাদেশের সীমার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক মিলনাকৃতির প্রত্যক্ষ সাহিত্যিক প্রকাশ দেখতে পাই না ঠিকই, কিন্তু তাতে আমাদের ধারণার খণ্ডন হয় না, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের পাঠান নরপতিরা বাংলা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সাম্প্রদায়িক চেতনার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে। তাঁরা হিন্দুশাস্ত্র অনুশীলনে এবং তার রসাভিব্যক্তিতে উদার ভাবে সাহায্য করেছেন। এইক্ষেত্রে তাঁরা ঐশ্লামিক সর্তের আরোপে হিন্দু কবিদের গান গাইবার স্বাধীনতাকে খর্ব করেন নি। এতদ্বারা সমাজ জীবনে উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষার আন্তর-প্রেরণার পরোক্ষ প্রমাণ পরিস্ফুট হয়েছে। মোগল যুগে বিভিন্ন কারণে বাংলার সমাজ জীবনে ভাঙন ধরেছিল। তাই সেই অবক্ষয়ের যুগে সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাও ভিন্ন পথগামী হয়েছিল। বাংলাদেশে যখন সমাজ জীবন অবক্ষয়ের মুখে, তখন সপ্তদশ শতকে আরাকানে সমন্বয়মূলক জীবনের অভিব্যক্তি ঘটেছে মুসলমান কবিদের শিল্পকৃতিতে।

বাংলাদেশে তুর্কী অভিযান ও শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই, মুসলমান পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত মতে অষ্টম-নবম শতাব্দীতে ব্যবসায়িক কারণে আরব বণিকেরা আরাকান-চট্টগ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা এই দেশের বাসিন্দা হয়ে পড়েছিলেন। এই দেশের জলবায়ু, ভাব-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মক হয়ে পড়েছিলেন। তুর্কী বিজয়ের পর যে সব মুসলমান এই দেশে বসবাস করতে থাকলেন তাঁরাও এই দেশের ভাব-সংস্কৃতিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ইসলাম ধর্মপ্রচারক যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের বৃহদংশটি ছিল সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত। সুফীরা প্রেমের সাধক। সুফীদের মতে আদির এক অদ্বয় প্রেম-স্বরূপই আমাদের আসল স্বরূপ। ঐ প্রেম-স্বরূপে সমাধিস্থ হওয়াকে বলেছে 'ফানা'। উল্টা-সাধনার পথে ঐ স্বরূপে প্রত্যাবর্তন ঘটে এবং ঐ প্রত্যাবর্তনেই নিঃশ্রেয়স। কাজেই দেখতে পাচ্ছি বৈষ্ণব-সহজিয়া, শাক্ত-তান্ত্রিক, বাউল ইত্যাদির সাধনমার্গের সঙ্গে সুফীদের সাধনার অন্তরঙ্গ মিল রয়েছে। জীবসত্ত্বা থেকে আসল স্বরূপে ব্যক্তের দেশ থেকে অব্যক্ত স্বরূপে ফিরে যাওয়ার মূল কথাটি এখানেও বলা হয়েছে ; ঐ অব্যক্তকে হিন্দুধর্মে কোথাও ব্রহ্ম, কোথাও রাধাকৃষ্ণ যুগল তত্ত্ব, কোথাও সামরস্যে অবস্থান, কোথাও মনের মানুষ বলা হয়েছে।

সুফী তাকেই বলেছে 'ফানা'। কাজেই উল্লিখিত ঐক্যের সূত্রে, রক্তের সংমিশ্রণের সূত্রে, জলবায়ুর প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনের নিগূঢ় অভিপ্রায় অজ্ঞাতসারে চলে আসছিল। ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে আরাকান-চট্টগ্রামের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। ঐ সূত্রে বাঙালীর সংস্কৃতি আরাকান-চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং লালিত হতে থাকে। তারই পাশাপাশি সেখানে লালিত হয়েছে আরবী-ফারসীর রোমান্টিক প্রণয় গাথা। এই দুয়ের সংমিশ্রণে আরাকান রাজসভায় দৌলত কাজী ও আলাওল কাব্য রচনা করলেন। মুসলমান কবিদ্বয়ের রচনা মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে অভিনব সংযোজনা। সংস্কৃতি সমন্বয়ের এক অত্যাশ্চর্য নিদর্শন। মুসলমান কবি য়ের শিল্পকৃতিতে বিশুদ্ধ মানবিকতার (Secular humanism) অভিব্যক্তি ঘটেছে। আবার "ঐশ্লামিক সাহিত্য" নামাঙ্কিত একটি বিচিত্র বস্তুর সঙ্গে আমরা এই যুগে পরিচিত হয়েছি, এঁদের কাব্য ঐ গোষ্ঠীভুক্ত নয়—সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত সর্বভারতীয় জীবনবেদীতে এই কাব্যের প্রতিষ্ঠা।

আরাকান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, সাংস্কৃতিক ভাবাবহ ও কাব্য প্রেরণা ঃ

১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে আরাকান-রাজ নরমেইখলা রাজ্যচ্যুত হয়ে বাংলার পাঠান সুলতানের রাজনৈতিক আশ্রয়লাভ করেন। তিনি বাংলাদেশে দীর্ঘকাল বসবাস করেন এবং তার ফলে বাঙলার সংস্কৃতিকেও আত্মসাৎ করেন। পাঠান সুলতানের সহায়তায় হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং আরাকানে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন বাঙালী-সংস্কৃতিকেও বহন করে নিয়ে যান। আবার রাজনীতির ক্ষেত্রেও আরাকানের সঙ্গে বাংলাদেশের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই সূত্রে আরাকান রাজসভায় বাঙালী মুসলমান রাজকর্মচারী সূফী সাধকদের মর্যাদাপূর্ণ স্থান নির্ণীত হয়ে যায়। তদুপরি আরাকান [illegible]সভার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল সর্বভারতীয় সংস্কৃতি চেতনায় সমন্বয়ে। আরব বণিকদের সঙ্গে এসেছিল আরবী-ফারসী সাহিত্য। এই সব সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয় গাথা, রূপ-সৌন্দর্য ভারতীয় সাহিত্যের জীবন-ধ্যানের অনুকূলে কবিরা সাজিয়ে নিয়েছিলেন। এটাও স্মরণ রাখতে হবে আরাকানের সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যম ছিল বাংলা-ভাষা। এখানকার কবিরা বাঙালী। তাঁরা হিন্দী কাব্যের মধ্যবর্তিতায় ফারসী-কাব্যের রোমান্টিক প্রণয় গাথাকে আয়ত্ত করে নিয়ে বাঙালী সংস্কৃতির আলোকে পরিশুদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। কাজেই আমরা

বলতে পারি যে, আকস্মিক ভাবে রাজনৈতিক সংকটের সূত্র ধরে বাংলার সঙ্গে আরাকানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তাই সাংস্কৃতিক ভূমিতে উন্নীত হয়ে প্রায় দুই শতাব্দী ব্যাপী ভাব-বিনিময়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে দৌলত কাজী এবং আলাওলের কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই কাব্যের মূল ভাব-প্রেরণার উৎস ভিন্নতর তাই কাব্যের রসনিষ্পত্তিতে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিরল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন,—"রোমান্টিক কাহিনী কাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের বরাবরই একচ্ছত্রতা ছিল। কিন্তু কাব্যের বিষয় সর্বদা ফারসী সাহিত্যের অনুগত ছিল না।" শেষ বাক্যে তিনি ফারসী প্রণয় গাথার বাঙালীয়ানায় রূপান্তরণের ইঙ্গিত করেছেন। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীও একই কথা ভিন্ন ভাবে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন,—"পরবর্তী যুগে দেখব,—নবীন জীবন চেতনা গড়ে উঠেছে দেববাদ-বিনির্মুক্ত বিশুদ্ধ মানবিক মূল্যবোধের প্রভাবে; সাহিত্য-ইতিহাসের আধুনিক পর্যায়ের কথা এটি। কিন্তু এই বিশুদ্ধ মানব-ধর্মের স্বভাব বাংলা ভাষায় প্রথম অভিব্যক্ত হয়েছে আরাকানের মুসলমান কবিদের দ্বারা। আরবী-ফারসী ভাষায় রচিত ইসলামিক সাহিত্যে মানব প্রেমের একটি মর্মস্পর্শী রূপ স্বপ্ন মদিরতায় ঘন-নিবিড় হয়ে আছে। আরাকানের মুসলমান কবিরা সেই সূত্র থেকেই স্পর্শকাতর মানব-প্রেম-গাথার অবতারণা করেছেন বাংলা ভাষায়।" এইখানেই তাঁদের কবিকৃতির অনন্যতা।

॥ কবি দৌলত কাজী ॥

কবি পরিচয়ঃ

চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দৌলত কাজীর জন্ম হয়। তরুণ বয়সে তিনি আরাকান রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন আরাকানের রাজা ছিলেন থিরি-থু-ধম্মা বাংলায় তাঁর পরিচিতি শ্রীসুধর্মা নামে। তাঁর সমর-সচিব আশরফ্ খান গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। আশরফ্ খান দৌলত কাজীর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সুলতানপুরে কবির বাস্তুভিটা এখনও আছে কিন্তু তাঁর বংশধর কেউ নেই। দৌলত কাজী কাব্যে রাজ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু আত্মপরিচয় দেন নি। আশরফ্ খানের উৎসাহে তিনি "লোর চন্দ্রাণী" বা "সতী ময়নামতী" কাব্য রচনা করেন। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে ১৬২২ থেকে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।

কাব্য পরিচয় ঃ

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, আরাকান-রাজ পাত্রমিত্রসহ অরণ্য বিহারে গিয়েছিলেন, সেখানে আরবী-ফারসী-হিন্দী ভাষায় রচিত নানা কাব্য আলোচনা হয়েছিল। সেই সময় আশরফ্ খান সাধন রচিত হিন্দী কাব্য "মৈনা-সত"-কে বাংলা অনুবাদ করতে অনুরোধ করেছিলেন :

"ঠেটা চৌপাইয়া দোহা কহিলা সাধনে।
না বুঝে গোহারী ভাষা কোন কোন জনে ॥
দেশী ভাষে কহ তারে পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝয় সানন্দে ॥"

"দেশী ভাষে" হল বাংলা ভাষা এবং আঙ্গিকের নির্দেশনায়ও বাঙালীয়ানার কথা বলা হয়েছে। দৌলত কাজীর কাব্য অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সরাসরি আক্ষরিক অনুবাদ কখনই নয়। সাধনের কাব্য কাঠামোতে কবি নিজের ভাবস্বপ্নকে প্রকাশ করেছেন। এক রোমান্টিক জগতের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সহজ কথায় বলতে পারি সাধনের কাব্য-কাহিনীকে সমীকৃত করে নতুন সৃষ্টি করেছেন। এখানেই তাঁর বাঙালী প্রাণের পরিচয় নিহিত, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর শিল্পকৃতির আলোচনার সার্থকতা এইখানেই। কারণ আমরা জানি বাংলা ভাষায় রচিত বস্তু মাত্রেই বাংলা-সাহিত্য নয়। বাঙালীর প্রাণ-মনের পরিচয় রচনাতে উদ্ভাসিত হওয়া চাই—এই উদ্ভাসন তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। দৌলতের কাব্য-কাহিনী আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

লোরক সর্বগুণান্বিতা সতী ময়নামতীকে বিয়ে করেছিলেন। গুণবতী সতী স্ত্রীর সান্নিধ্যে তিনি সুখে কালাতিপাত করছিলেন। তিনি রাণীর উপর রাজ্যের ভার দিয়ে সবান্ধব বনবিহারে গেলেন। সেখানে এক যোগী পুরুষের কাছে চন্দ্রাণীর প্রতিকৃতি দেখে তাঁর রূপে আকৃষ্ট হলেন। চন্দ্রাণীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গোহারি রাজ্যের বামন নামে এক বীরপুরুষের সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের দাম্পত্য-জীবন সুখের হয় নি, কারণ :

"মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি।
নারী সঙ্গে রতিরসহীন মূঢ় মতি ॥"

কাজেই লোর চাইলেন চন্দ্রাণীর অতৃপ্ত প্রাকৃতিক পিপাসার সুযোগ নিয়ে তাঁকে হাত করতে। লোর গোহারি দেশে উপস্থিত হলেন, প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হল। অতঃপর চন্দ্রাণীকে নিয়ে পালাবার পথে

লোরকে বামনের সম্মুখীন হতে হল। দ্বৈরথ-যুদ্ধে বামন মৃত্যু বরণ করলেন। ইতোমধ্যে চন্দ্রাণী সর্পদংশনে মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়েছেন। চন্দ্রাণীর শোকে লোর তখন উন্মত্তপ্রায়, এমন সময় অকস্মাৎ যোগীপুরুষ আবির্ভূত হয়ে চন্দ্রাণীকে জীবন দান করলেন। গোহারির রাজা সব কিছু ইতোমধ্যে জেনে ফেলেছেন। তিনি লোর-চন্দ্রাণীকে রাজধানীতে আনলেন। লোর-চন্দ্রাণী সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এদিকে সতী ময়নামতী পতিবিরহে ম্রিয়মান হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ঋতুচক্রের আবর্তন, নিত্য নতুন রূপ পরিবর্তন, বিরহ বেদনাকে আরও প্রতপ্ত করে তোলে। মনের ব্যথা তিনি মালিনীর কাছে ব্যক্ত করেন। মালিনী আদৌ সৎ নয়। সে ছাতন-কুমারের উৎকোচ গ্রহণ করে সতী ময়নামতীকে তাঁর শয্যাসঙ্গী করে দিতে চেয়েছিল। সতী ময়নামতীর রিরংসাতপ্ত বিরহ বেদনার সুযোগে ছাতনের কুমারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বারংবার প্রস্তাব এনে তাঁকে বিড়ম্বিত করতে থাকে। ময়নামতী দৃঢ় ভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এইখানে কাব্যটি খণ্ডিত হয়ে পড়েছে। কবির অকাল মৃত্যুর ফলে কাব্যটি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। পরবর্তী কবি সৈয়দ আলাওল কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন। তার ফলে কাব্যের tune ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

সৈয়দ আলাওল লিখেছেন, ময়নামতী মালিনীকে শারীরিক দণ্ড দিয়ে দূর করেছেন। পরে সখীদের সঙ্গে পরামর্শ করে গোহারি রাজ্যে এক ব্রাহ্মণকে পাঠালেন। ব্রাহ্মণ এক শিক্ষিতা সারীর মাধ্যমে লোরকে সতী ময়নামতীর দুরবস্থার কথা জানালেন। এইবার লোরের সম্বিৎ ফিরল, তিনি পুত্রের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে দেশে ফিরলেন। দেশে দুই সহধর্মিণীকে নিয়ে সুখে জীবন কাটিয়ে মারা গেলেন এবং সতী ময়নামতী ও চন্দ্রাণী তাঁর অনুমৃতা হলেন। অবশ্য আলাওল কাহিনীতে রূপকথা জাতীয় উপকাহিনী সংযোজন করেছেন। এই উপকাহিনী কাব্যের পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা উক্ত প্রসঙ্গের বিবৃতি দিয়ে বোঝা বাড়াতে চাই না।

কাব্য বিচার ঃ

কাহিনী বিন্যাসে এবং চরিত্র সৃষ্টিতে দৌলতের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। দৌলত কাহিনী পরিকল্পনায় মূল কাহিনীকে প্রয়োজন মতো পরিবর্ধন এবং সা-র্তন করেছেন। সমালোচক লক্ষ্য করেছেন—"দৌলতে এমন বহু অংশ কাব্য যাহা সাধনের কাব্যে নাই।" এই কাব্যের কোথাও সাম্প্রদায়িকতার

চিহ্নমাত্র নেই। ক্লাসিক রীতির কাঠামোয় কবি রোমান্টিক প্রণয় গাথা বর্ণনা করেছেন। দৌলত কাজী সুফী ধর্মের সাধক। প্রেমই তাদের সাধ্য-সাধন বস্তু। কবির প্রেমানুরক্তি ময়নামতীর জীবনের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রেমকে জীবনের অবিনশ্বর, সারবস্তু বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ এই ঘোষণায় জবর্দাস্তমূলকতা নেই—স্বাভাবিক আবেগেই তা অভিব্যক্ত হয়েছে। অভিব্যক্তির প্রয়োজনে জয়দেব, বিদ্যাপতি, কালিদাস এসে পড়েছেন। তাকে আমরা বিদ্যাপতি-কালিদাসের প্রতিধ্বনি বলব না। বরঞ্চ রোমান্টিক মনোভাবের জন্য বিদ্যাপতি-কালিদাসের সঙ্গে তাঁর সাধারণ ঐক্য দেখা যায়, তাঁর বিদ্যাপতি-কালিদাস পাঠ তাঁর পক্ষে জীবন রসায়নের কাজ করেছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, দৌলত কাজী পার্থিব জীবনরস পরিবেষণ করেছেন। তাঁর কাব্যের নরবন্দনা ও মৃত্তিকা বন্দনায় তার প্রমাণ রয়েছে। এইখানে তাঁর অনন্যতা। অবশ্য এর পিছনে সুফী-সাধনার মর্মবাণীটি উচ্চারিত হয়েছে। তাঁর বাণীভঙ্গির পরিচয় দিই:

"জটাধারী ব্যাঘ্র-চর্ম বিভূতিভূষণ।
কণ্ঠে রুদ্রমালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন॥
জ্বলন্ত প্রদীপ দীপ্তি দিব্য কলেবর।
যোগানলে দহিছে সকল অভ্যন্তর॥"

উদ্ধৃতাংশে যোগীর দেহাবয়ব কয়েকটি রেখার মোটা টানে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, একেই বলেছি ক্লাসিক রীতি, আবার শেষ পংক্তিতে "যোগানলে দহিছে সকল অভ্যন্তর"—রোমান্টিক কল্পনা, যা বলেছেন তার সূত্র ধরে ইন্দ্রিয়জিৎ যোগীর জীবন-সাধনা এবং বিস্ময়কর ক্ষমতা কল্পনায় দেখি। এইজন্যে বলেছি ক্লাসিক রীতির কাঠামোতে রোমান্টিক জীবন-চর্যা করেছেন। পরিচ্ছন্নতা ও পরিমিতি বোধ ক্লাসিকতার লক্ষণ, এই লক্ষণ তাঁর কাব্যের সর্বত্র পরিস্ফুট। যেমন:

"নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান॥
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান।
নর সে পরম দেব তন্ত্র-মন্ত্র জ্ঞান॥
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর॥
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল॥"

মানুষের মূল্যে কবি পৃথিবীর মূল্য নির্ণয় করেছেন। এই কবি ব্রাত্য, এই কবি মানুষের দলে। আধুনিক যুগে আরেক কবির মুখে শুনেছি :

"তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয় ;
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।"

স্বীকার করি দুই কবির পরিবেশ ভিন্ন, কাব্য প্রেরণার উৎস ভিন্ন তবুও মানুষের প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধের উৎসার-ঐক্য অস্বীকার করব কেমন করে ? এই মমত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ভিন্ন কারণজাত হলেও কেন্দ্রীয় ঐক্য অনস্বীকার্য। মানুষের রক্তমাংসের দেহ-বাস্তবের প্রতি এমন শ্রদ্ধাবোধ এই যুগের কথা হলেও তার চকিত স্ফুরণ দৌলত কাজীর কাব্যে আমরা একবার দেখেছি। মধ্যযুগীয় সাধারণ কাব্যধারার বিরল ব্যতিক্রম এই কবি। এইখানেই তাঁর মৌলিকত্ব। এতদ্ব্যতিরেকেও দৌলতের কাব্যে ছড়িয়ে থাকা সুভাষিতাবলী দেখা যায় তাতে যেমন তাঁর সমাজ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তেমনই অপর দিকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কবি বৈশিষ্ট্যের সাম্যের ইঙ্গিত দিয়েছে। মালিনীর চরিত্র ভারতচন্দ্রের কুট্টনীর পূর্বাভাস বলে মনে হয়। মোটের উপর আমরা বলতে পারি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাংলা-কাব্যের বিভিন্ন খাতে ভাঁটার টান সূচিত হচ্ছিল সেই সময় এইরূপ জীবনরসোজ্জ্বল কাব্য যথার্থ গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে।

॥ সৈয়দ আলাওল ॥

কবি পরিচয় ঃ

সৈয়দ আলাওল আরাকান রাজ-সভার দ্বিতীয় কবি। ইনি রাজা সাঙ্গ-থু-ধম্মার আমলে আবির্ভূত হন। রাজা সাঙ্গ-থু-ধম্মা বাংলা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম নামে পরিচিত। এই রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠ পোষকতা লাভ করেছিলেন সৈয়দ আলাওল। মাগন ঠাকুরের মৃত্যুর পর সুলেমানের পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করেছিলেন। ডঃ শহীদুল্লাহ মনে করেছেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কবির জন্ম। কবির আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় ফতেহাবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন কবির পিতা। ফতেহাবাদ কবির জন্মভূমি। ফতেহাবাদের ভৌগোলিক সংস্থান নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। এই বিষয়ে তর্কাতীত কোনও মত দেওয়া যায় না। তবে ধরে নেওয়া হয়েছে ফতেহাবাদ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোনও গ্রাম। বর্তমানে সেই গ্রামের অস্তিত্ব পদ্মা লুপ্ত করে দিয়েছে।

একদা জলপথে যাওয়ার পথে কবিরা সপরিবারে হার্মাদ দস্যুদের হাতে পড়েন। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে কবি-পিতা 'শহীদ' হন। আলাওল কোনও রকমে রক্ষা পান এবং নানা বিপদ পেরিয়ে আরাকানে উপস্থিত হন। সেখানে রাজ সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, রসবোধ রাজসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজসভার আনুকূল্যে কাব্য রচনায় ব্রতী হন। এই সভার প্রভাবশালী কর্মচারী মাগন ঠাকুর, সুলেমান এবং সৈয়দ মুসার উৎসাহে কবি আরবী, ফারসী ও হিন্দী কাব্যের রস বাংলায় পরিবেষণ করেন এবং 'লোর চন্দ্রাণী' কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন।

এই রাজসভাতেও নিরুপদ্রব, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতে পারেন নি। দিল্লীর কাঞ্চনতক্ত ঘিরে সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছে, শাহ্ সুজা পরাজিত এবং বিতাড়িত হয়ে আরাকান রাজের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করলেন। কিন্তু কোনও কারণে শাহ্ সুজা আরাকান রাজের বিরাগভাজন হওয়াতে তিনি সপরিবারে নিহত হলেন। শাহ্ সুজা সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আলাওলের সঙ্গে এই দিক থেকে তাঁর মনের মিল ছিল। এইটাকে ভিত্তি করে রাজদরবারে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হল, কবি কারারুদ্ধ হলেন। পঞ্চাশ দিন যন্ত্রণাভোগের পর বিচারপতি সৈয়দ মাসুদ শাহার হস্তক্ষেপে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং রাজসভায় স্থান পান। এই সময় 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' এবং 'সেকেন্দার নামা' অনুবাদ করেন। এর কিছুকাল পরে ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন।

সৈয়দ আলাওলের রচনাবলী হল—'পদ্মাবতী' (১৬৪৬ খ্রীঃ), 'লোরচন্দ্রাণীর উত্তরাংশ' (১৬৫৯ খ্রীঃ), 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল' (১৬৫৮-৭০ খ্রীঃ), 'সপ্তপয়কর' (১৬৬০ খ্রীঃ), 'তোহ্ফা' (১৬৬৩-৬৯ খ্রীঃ), 'সেকেন্দার নামা' (১৬৭২ খ্রীঃ)। আমরা এইখানে আলাওলের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করব এবং তাঁর কবিপ্রতিভার পরিচয় নেব।

॥ কাব্য পরিচয় ॥

পদ্মাবতী (১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ):

আমরা পূর্বেই বলেছি আরাকান রাজসভায় বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। অপর ভাষায় রচিত কাব্যরস বাংলা ভাষায় পাত্রান্তরিত করে পান

করবার আকাঙ্ক্ষায় দৌলত কাজী "মৈনা সত" কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন। তেমনই মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম কবি মালিক মহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের রসকে বাংলা ভাষার মাধ্যমে আস্বাদন করবার অভিপ্রায়ে মাগন ঠাকুর সৈয়দ আলাওলকে ঐ কাব্যটি বাংলায় অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। 'পদুমাবৎ' কাব্য হিন্দীতে রচিত, তাই :

"রোসাঙ্গেতে আন লোক না বুঝে এই ভাষ।
পয়ার রচিলে পুরে সবাকার আশ॥"

মাগন ঠাকুরের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে সৈয়দ আলাওল 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত কাব্যটি বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 'পদ্মাবতী' নামে পরিচিত।

'পদ্মাবতী' কাব্যের কাহিনী রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগৃহীত। পদ্মিনীর রূপলাবণ্যের কথা শুনে আলাউদ্দিন তাঁকে লাভ করবার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন। বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তিনি চিতোর জয় করেন। এদিকে সতীধর্ম রক্ষার্থে পদ্মিনী সখীদের নিয়ে জহরব্রত উদ্‌যাপন করলেন। আলাউদ্দিন চিতোর জয় করলেন ঠিকই, কিন্তু পদ্মিনীকে লাভ করতে পারলেন না। এই মূল কাহিনীকে জায়সী আপন কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন। মূল কাহিনীকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন মতো পরিবর্তিত করেছেন। চারণ-কবি কীর্তিত আলাউদ্দিন-পদ্মিনীর কাহিনীকে প্রেমের কৃচ্ছ্র সাধনের কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন এবং উপকাহিনীর সংযোজনায় তার মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্ এই কারণে বলেছেন,—"পদ্মাবতী উপাখ্যান মালিক মুহম্মদ জায়সীর নানা সময়ের নানা ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক বৃত্তান্তে জোড়া দেওয়া একটি কাব্য মাত্র। তিনি ইতিহাস লিখিতে বসেন নাই। তিনি তাঁহার কাব্যে সুফী মতের ব্যাখ্যার জন্য আদিরসের আবরণে এক আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য রচনা করিয়াছেন।"

সৈয়দ আলাওল সুফী মতের সাধক ছিলেন। জায়সীর কাব্য ভাবনাকে তিনি নিজের মতো করে গ্রহণ করেছেন। ফলে 'পদ্মাবতী' জায়সীর কাব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র নয়। আলাওল নিজের উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেছেন, নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছেন, কাহিনী বিন্যাসেও ক্ষেত্র বিশেষে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। ফলে কাব্য চরিত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। জায়সী যেখানে অধ্যাত্মরসের সৃষ্টি করেছেন, আলাওল সেখানে পার্থিব মানবীয় প্রেমের কাহিনী

সৃষ্টি করেছেন, তাতে অধ্যাত্মরাগের চিহ্নমাত্র নেই এমন কথা বলছি না, পাল্লার ঝোঁকটা মানবীয় রসের দিকেই বেশি। আসল কথা জায়সীর কাব্য মূলতঃ অধ্যাত্মতত্ত্বের বাহন, প্রকাশ দক্ষতায় তা জনপ্রিয় হয়েছে, আলাওলের কাব্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের উপরে মানবিক প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। "নরনারীর একান্ত হৃদয়গত কামনা-বাসনায় তাঁর কাব্য সমৃদ্ধ" এবং এরই মধ্যে দিয়ে মরমিয়া চিত্তের সুরভি ব্যাপ্ত হয়েছে।

আলাওলের কাব্যে তাঁর বহু বিস্তৃত পাণ্ডিত্য, হিন্দু-শাস্ত্রের উপর ব্যুৎপত্তি, পুরাণ কথার উপর অধিকার নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বৈদগ্ধ্যের সর্বগ্রাসী উত্তাপে তাঁর কবি অনুভূতি কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়। যাই হোক প্রেমের সত্যকে কবি সার বলে অনুভব করেছেন। এই অনুভূতি হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ভিত্তি রচনা করেছে। সুতো যেমন বিচিত্র পুঁথিগুলোকে গেঁথে অখণ্ড মালা তৈরী করে ; প্রেমের উত্তাপে তেমনই হিন্দু-মুসলমানের বিচিত্র উপাদানগুলোকে গলিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এইখানে তাঁর কৃতিত্ব এবং দৌলত কাজীর সার্থক উত্তরাধিকার, বাঙালীর জীবন সাধনার সার্থক অভিব্যক্তি।

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল (১৬৫৮-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) ঃ

মাগন ঠাকুরের নির্দেশে আলাওল "আলফ্-লায়লার" কাহিনীকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। সৈয়দ মুস্তাফার মুখে ফারসী কবির রচিত প্রেমকাব্য কাহিনী শুনে আলাওলকে সেই কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করতে অনুরোধ করেন। তারই ফলশ্রুতি "সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল" কাব্য। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কবি এই কাব্য রচনায় হাত দেন। কাব্য রচনা সমাপ্তির পূর্বে মাগন ঠাকুর লোকান্তরিত হন। ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে ঝড় উঠেছিল, এই ঝড়ের ঝাপ্টায় কবির জীবনেও দুর্ভাগ্য নেমে এলো। কবির কাব্য-সাধনায় ছেদ পড়ল। ভাগ্যচক্রের আবর্তনে কবি [illegible]ন পুনরায় সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন তখন সৈয়দ মসার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬৭০ খ্রীঃ কাব্য সমাপ্ত করলেন।

"সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমাল" রোমাণ্টিক প্রেমের গল্প। গল্পের নায়ক সয়ফুলমুলুক মিশরের বাদশাহ্ ছিপিয়ানের পুত্র। নায়িকা বদিউজ্জমাল বোস্তানের অন্তর্গত পরীরাজ্যের রাজকন্যা। তিনি অপূর্ব রূপবতী ছিলেন। তাঁর একটি প্রতিকৃতি দেখে তাঁকে লাভ করবার জন্য সয়ফুল পাগল হয়ে উঠলেন। এবং নানা ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁকে লাভ করেন। এই হল

মোটা কাহিনী। এতে বহু অবাস্তর, অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ রয়েছে। মোটের উপর আলাওল রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী লিখেছেন। রোমান্স শেষের দিকে কিছুটা খণ্ডিত হয়েছে। কেননা কাব্য ছেদহীন ভাবে রচিত হয় নি। কাব্য রচনার প্রাথমিক পর্যায়ের রোমান্টিক প্রেরণা পরবর্তীকালে কবির বয়ঃধর্ম এবং ভিন্নতর অভিজ্ঞতার ফলে খণ্ডিত হয়েছিল। তাই গ্রন্থের সূত্রপাত এবং সমাপ্তির মধ্যে সুরসঙ্গতির অভাব অনুভূত হয়।

সপ্তপয়কর (১৬৬০ খ্রীঃ), তোহ্ফা (১৬৬৩-৬৯ খ্রীঃ) ও সেকেন্দার নামা (১৬৭২ খ্রীঃ) :

১৬৬০ খ্রীঃ ইরানী কবি "নেজাম গঞ্জনির"র ফারসী ভাষায় রচিত কাব্যের অনুবাদ করেছেন। বাহ্রামের বিচিত্র কাহিনী এই কাব্যে বর্ণনা করেছেন। "তোহ্ফা" গ্রন্থে মুসলমান সমাজের নীতিকথা কাব্যছন্দে কীর্তিত হয়েছে। "সেকেন্দার নামা" কাব্য ফারসী কবি নেজামী সমরকন্দীর "ইস্কান্দার নামা" কাব্যের অনুবাদ। এই কাব্যে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এইসব রচনাবলী কেবল ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয়। এখানে আলাওলের রচনার সামান্য পরিচয় দিই :

"এ বেদ পুরাণ আদি যত মহামন্ত্র।
বচনে সুরস পুনি যত যন্ত্রতন্ত্র ॥
বচন অধিক রত্ন যদি সে থাকিত।
স্বর্গ হন্তে বচন ভূমিতে না নামিত ॥
তার মধ্যে প্রেম কথা মাধুর্য অপার।
প্রেমভাবে সংসার সৃজন করতার ॥
প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ।
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥"

আলাওলের কবি বৈশিষ্ট্য :

উপরের উদ্ধৃতাংশে আলাওলের জীবনবোধের পরিচয় রয়েছে। জীবনে কবি প্রেমকেই সারসত্য বলে জেনেছেন। সার্বভৌম সত্যের জোরে তিনি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন। জীবনের বিচিত্র পরিবেশ প্রেমকে

বিচিত্রভাবে দেখেছেন। প্রেমই আত্মবিলোপের মূলে কাজ করে। এই আত্মবিলোপ অর্থ ব্যক্তিক সঙ্কীর্ণতার দেওয়াল ভেঙ্গে সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়া। ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের এই হল পথ। তাই :

"আপনি করিয়া নাশ আপে সর্বময়।
আপনি যাহাকে ভাব সেই আপ হয়॥"

আলাওলের জীবনধ্যান প্রকাশে সর্বদা ভাব ও রূপের সারূপ্য সাধন ঘটেছে এমন কথা বলা চলে না। তাঁর পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র ব্যুৎপত্তি, ভূয়োদর্শন সবক্ষেত্রে কবি অনুভূতির তাপে বিগলিত হয়ে রসসৃষ্টির সহায়ক হয় নি—বরঞ্চ বাধাসৃষ্টি করেছে। এই দিক থেকে দৌলত কাজীর সিদ্ধি অনেক বেশি।

বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি সম্প্রদায় :

দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওলের কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে বৈষ্ণব পদের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ পদগুলো খাঁটি বৈষ্ণব পদ নয়। তার আবেদনও বৈষ্ণবীয় রসনিষ্পত্তির জন্য নয়। বাঙালী চিত্তে বৈষ্ণবীয় রসসংস্কার দানা বেঁধে উঠেছিল দীর্ঘ দিনের বৈষ্ণব পদাবলীর কর্ষণে। দৌলত কাজী ও আলাওল বৈষ্ণব কাব্য প্যাটার্নের ব্যবহার করে ঐ সংস্কারের সংবেদনশীলতাকে কাজে লাগিয়েছেন। এইটে একান্ত ভাবে বহিরাঙ্গিক।

কিন্তু সৈয়দ মর্তুজা. আলী রাজা, আলী মিঞা প্রভৃতি মুসলমান কবিরা আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন নি। তবে মনেপ্রাণে তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রচিত পদে বৈষ্ণব কাব্যের আন্তর রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে। এখনে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, আমরা অনেক মুসলমান কবির সন্ধান পেয়েছি যাঁরা নিজেদের অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতাকে রাধা-কৃষ্ণের নামের আড়ালে প্রকাশ করেছেন, তাঁরা সকলে সুফী সম্প্রদায়ের লোক। বৈষ্ণব ধর্মের সর্বাতিশায়ী প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণ নামেই যে সার্বজনীন প্রেম সংস্কার গড়ে উঠেছিল তাকেই তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সৈয়দ শাহানূর, সৈয়দ সুলতান, মুক্তাল হুসেন, কবি আরকুমের নাম উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু আমরা যাঁদের কথা বলছি তাঁরা ভক্ত কবি। তাঁরা বৈষ্ণবীয় ভক্তির বিশুদ্ধ প্রেরণায় পদ রচনা করেছেন। এঁদের পদ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব মনোভাবের প্রকাশক। আমরা বক্তব্যের সমর্থনে দু'একটি পদ উদ্ধার করে দিলাম :

"শ্যাম বন্ধু চিত নিবারণ তুমি।
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে এ চাঁদ বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান্
দণ্ডে দশবার মরি।
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইলুঁ জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মর্তুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রৈলুঁ তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥"

এই পদে অভিব্যক্ত অনুরাগ এবং আত্ম-নিবেদন বিশুদ্ধ বৈষ্ণব মনোভাব-জাত তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। আবার আলী রাজা লিখেছেন:

"কি খেনে আসিলাম ঘাটে।
নন্দের নন্দন ভুবনমোহন
দেখিয়া মরম ফাটে॥"

এই আক্ষেপোক্তি এবং রসনিষ্পত্তি বৈষ্ণব কাব্যের শ্রেষ্ঠ মহাজনদের কথাই মনে করিয়ে দেবে। আলী মিঞা লিখেছেন:

"গাছের উপরে লতার বসতি
লতার উপরে ফুল।
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে
কানুএ মজাই জাতিকুল॥"

চণ্ডীদাসকে স্মরণ করিয়ে দেবে। কাজেই আমরা বলতে পারি এই কবি-গোষ্ঠীর অভ্যুদয় বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ইঙ্গিত দান করে। বাঙালীর বিশিষ্ট সাধনার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছে। হিন্দু-মুসলমান দুইটি সম্প্রদায়ের সমাজ প্রথার বিরোধিতাকে প্রেম-ভাবনার সূত্রে সমন্বিত করে প্রকাশ করেছে। মুসলমান কবিদের সারস্বত সাধনার ঐতিহাসিক মূল্য এইখানে।

॥ লোকসঙ্গীত ঃ বাউল গান ॥

লোকসঙ্গীত ও বাউল ঃ

জল মাছের পক্ষে সহজ, কিন্তু মাছ জলকে উপলব্ধি করতে পারে না—তার পক্ষে উপলব্ধি করবার সম্ভাবনাও নেই। মানুষ তেমনই পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে, সহজের মধ্যে বিচরণ করছে, তথাপি সহজকে উপলব্ধি করতে পারে না, তবে মানুষের পক্ষে তাঁকে উপলব্ধি করবার সম্ভাবনা রয়েছে! কারণ মানুষের জন্ম হয়েছে মুমুক্ষার বেদনা নিয়ে। বৃহতের সঙ্গে যোগেই মুক্তি। এইটে অনুভব সাক্ষিক। উপলব্ধির উপায়টা কি? উপায় হল দুটো, এক—জ্ঞানের পথ, দুই—প্রেমের পথ। জ্ঞানের পথ শুকনো, তাতে হৃদয় থাকে উপবাসী, তাতে সকলের মন উঠে না, প্রেমের পথে হৃদয়ের পিপাসা মেটে, জীবনের জবানীতে, রসের পরিপূর্ণতায় তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। বাংলাদেশ স্মরণাতীতকাল থেকে প্রেমের সাধনায় সহজ হতে চেয়েছে। সব আচার-বিচার, মত ও পথের ভেদাভেদকে প্রেমের সর্বভেদ-বিনাশনের দিব্য আলোকে মিটিয়ে নিয়েছে। প্রেমের রসায়নে সব বিরোধ সমস্যাকে জীবনে সমীকৃত করে নিয়েছে। বাংলাদেশ চিরকাল শাস্ত্রীয় সংস্কার মুক্ত, স্বাধীনভাবে হৃদয়ের নির্দেশ মেনে চলেছে, স্বভাব ধর্মে বাংলাদেশ মানবপন্থী। এই দেশে আর্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাব সত্ত্বেও বাঙালীর ঐ বিশিষ্ট জীবন-সাধনা লুপ্ত হয়ে যায় নি। বরঞ্চ বাঙালী প্রাণশক্তির জোরে আর্য সভ্যতাকে আপন প্রাণধর্মের অনুকূলে রূপান্তরিত করে নিয়েছে। আর্যীকরণের পরে যে অভিজাত জ্ঞান-প্রকর্ষ উদ্দীপ্ত যে বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে সেখানে প্রেমধর্মের সর্বভারতীয় প্রকাশ ঘটেছে বৈষ্ণব কাব্যে। আর লোকজীবন সম্পৃক্ত শাস্ত্রাচার, সমাজ-বিধি বহির্ভূত প্রেম-সাধনার প্রকাশ ঘটেছে লোকসঙ্গীতে। বাউল গান এই লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। বাউল গানে অলঙ্কার বা শাস্ত্রের গুরুভার নেই। হৃদয়ানুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ঘটেছে অথচ গভীর তার ব্যঞ্জনা। প্রাণের মতোই তা সর্বভারমুক্ত অথচ অতল তার রহস্য। "ছত্রমৃগ-মূর্তিগুলিই হল বাংলাদেশের আসল শিল্প-সাধনা। এইগুলিই তার নিজস্ব তপস্যা।" এইখানে বাংলাদেশ অন্যের চেলাগিরি করে নি। বাউল, ভাটীয়ালি ইত্যাদি গানে

বাঙালীর নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। তবুও তার সার্বভৌম আবেদন রয়েছে। কারণ প্রেম এই সব গানের উপজীব্য—হৃদয়বত্তার আবেদনের জন্য এই সব রচনা সহৃদয়কে আকৃষ্ট করে।

বাউল সাধনার স্বরূপ ঃ

'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' কথাটি নিষ্পন্ন হয়েছে বলে সকলে মেনে নিয়েছেন। বাতুল কথাটির অর্থ পাগল। পাগলের কোনও বিধি-বিধান নেই, আচার-বিচার নেই, তাদের চলাফেরা সবই সাধারণ জীবনধারার ব্যতিক্রম। বাউলরা এই রকমের পাগল। তাদের জাতি-পঙক্তির বিচারভেদ নেই, শাস্ত্রীয় আচার-বিচার, বিধি বিধানের বালাই নেই, তারা হৃদয়-ধর্মের সহজ প্রেরণায় "মনের মানুষ" খুঁজে ফিরেছেন। প্রেমই তাঁদের সাধ্য, দেহ-সাধনা। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেছেন,—"বহু শতাব্দী ধরিয়া জাতি-পঙক্তির বহির্ভূত নিরক্ষর একদল সাধক শাস্ত্র-ভারমুক্ত মানব-ধর্মই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাই সমাজের কোন বাঁধন মানেন না।" সমাজের কাছে তাদের একমাত্র কৈফিয়ৎ,—"মরলেই সব দায় ঘুচে যায়। তোমাদের দৃষ্টিতে আমাদের মৃত মনে কর—এই জীবন্ত মরাকে সুফীরা বলেন ফনা।" বাউলেরা জীবনের মূলীভূত সহজ সত্যকে সহানুভূতির পথে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের চিরায়ত সাধনার মূল কথা হল ব্যক্তি-মানুষের ক্ষুদ্র অহং বিশ্ব অহং-এর প্রকাশ। ঐ ক্ষুদ্র অহংকে বিশ্ব অহং-এর সঙ্গে যোগযুক্ত করাতেই নিঃশ্রেয়স্‌। এই তত্ত্ব বৈষ্ণব-সাধনায় শাক্ত-সাধনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব সাধনায় প্রাকৃত নরনারীর উপর রাধাকৃষ্ণত্ব আরোপ করে উভয়ের সামরস্যসম্ভূত অদ্বৈতানুভূতিই তাঁদের মোক্ষ সাধনা। এখানে অতি সূক্ষ্ম আত্মবিগলিত ভোগ আছে। [illegible] নরনারীর উপর কোনও তত্ত্বারোপ না করে, তার আন্তরসত্তা, মনের মানুষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। নরনারীর সহজ দেহাকর্ষণের কামকে বিশেষ উপায়ে প্রেমে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলেন, দেহের ভিতরে মনের মানুষ লুকিয়ে রয়েছে। তাই দৈহিক আসক্তির সরণী ধরে দেহের মধ্যেই অনুস্যূত সূক্ষ্ম সত্তাকে, যাকে মনের মানুষ বলেছেন তাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। উপলব্ধি ঘটলেই তা দেহাতীত, অপার্থিব হয়ে পড়ে। অপার্থিব প্রেম উপলব্ধির জন্য তাঁরা দেহকে আধার রূপে ব্যবহার করেছেন। ব্যক্তি-সত্তাকে এইভাবে বিশ্ব-সত্তায় লীন করে দিতে

চেয়েছেন। তাঁদের সাধনা মর্মানুসারী তাই তাঁরা মরমিয়া, এবং সাধনার উপায় সহজ দেহধর্ম তাই সহজিয়া। এই মূল সত্যে অবিচলিত থেকে বাউল ভারতের বিচিত্র ধর্ম সাধনাকে আত্মসাৎ করেছে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লক্ষ্য করেছেন,—"In the conception of the 'Man of the heart' of the Bāuls, we find a happy mixture of the conception of the Paramātmana of the Upanisads, the Sahaja of the Sahajiyās, and Sufi-istic conception of the Beloved." বাউল সাধনা যেহেতু দেহকেন্দ্রিক সেইজন্য রক্তমাংসের বিক্ষোভ পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই নীর-ক্ষীর তত্ত্ব, চারি-চন্দ্র-ভেদ তত্ত্ব গোপনে অনুষ্ঠেয়। এর মধ্যে আপাতঃভাবে জুগুপ্সার প্রেরণা লক্ষ্য করা যেতে পারে, অনেকে তা লক্ষ্যও করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে দেহ এখানে যন্ত্র। দেহযন্ত্র বাজাবার কৌশল রপ্ত করে মরমে প্রবেশ করাটাই মূলকথা। দেহসুখ মূল লক্ষ্য নয়। একথা ঠিকই উপলক্ষ অনেক সময় লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যায়। সেখানে অধিকারভেদের প্রশ্ন রয়েছে। এইটে স্বীকার করে নিয়ে বাউল গান বিচার করতে হবে। কারণ বাউল গান মূলতঃ সাধন সঙ্গীত।

বাউল গানের ইতিহাস :

বাউল গানের উপর আমাদের নজর পড়েছে আধুনিক কালে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে জমিদারী পরিদর্শনের সময় লালন ফকিরের বাউল গান সংগ্রহ করেন। বাউলের মরমিয়া স্বভাব কবিকে আকৃষ্ট করে। রবীন্দ্রনাথ বাউল-গীতি সংগ্রহ করে প্রচার করেন। এবং হিবার্ট বক্তৃতামালায় কবি বাউল-গীতিকে ভিত্তি করে মানবধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কবির উৎসাহে বাউল গান সংগ্রহ করে প্রচার করেন। সম্প্রতি ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অপরিসীম শ্রম স্বীকার করে বাউল গান সংগ্রহ করে "বাংলার বাউল ও বাউল গান" নামে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন কালবিচার করে দেখাতে চেয়েছেন বাউল গানের উৎপত্তি ষোড়শ শতকের শেষের দিকে হয়ে থাকবে। জগমোহনের আবির্ভাব, গুরু পরম্পরার ইতিহাস (যতটা উদ্ধার করা গিয়েছে), আউলচাঁদের আবির্ভাব কাল ধরে বিচার করলে মোটামুটিভাবে অনুমান করা যেতে পারে ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাউল গানের প্রসার ঘটে থাকবে।

বাউল সাধকদের, বিশেষতঃ প্রাচীনদের কোনও প্রামাণিক জীবনকথা জানার উপায় নেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লালন শাহ্ ফকীর, পাঞ্জ্ শাহ্, মদন বাউল প্রভৃতি বিখ্যাত বাউল সাধক ও গীতিকারেরা বর্তমান ছিলেন।

বাউল গীতিকার লালন শাহ্ ফকির :

বাউল সাধক গীতিকারদের মধ্যে লালন শাহ্ ফকির অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বাসকালে গগন হরকরার মুখে লালনের গান শোনেন এবং সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতিরেকেও লালনের শিষ্যদের কাছ থেকেও লালনের গান সংগ্রহ করেন। লালনের স্বহস্ত লিখিত কোনও পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায় নি। তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন, তাঁর শিষ্যরা সেগুলো লিখে রাখতেন। তাঁদের সংগ্রহশালা থেকে লালনগীতি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

লালন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার ভাঁড়রা গ্রামে আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক প্রবণতা ছিল। পুরীধামে যাওয়ার পথে বসন্তরোগে কবি আক্রান্ত হয়েছিলেন। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান। এক নিঃসন্তান মুসলমান দম্পতী তাঁকে সেবাযত্ন করে সুস্থ করে তোলেন। মুসলমান ব্যক্তিটির নাম সিরাজ। লালন মুসলমানের সংস্পর্শে এসেছিলেন বলে তিনি হিন্দু সমাজে পরিত্যক্ত হন। এবং সিরাজের কাছেই ফিরে যান। তাঁর কাছেই বাউল সাধনায় দীক্ষা নেন। পরবর্তীকালে মুসলমান সম্প্রদায়ের মোমিনগোষ্ঠীর এক কন্যাকে বিয়ে করেন। বাউল সাধনার কথা প্রচার করাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। কোনও নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান লালন মানতেন না বলে শরিয়তী মুসলমানদের কাছেও তিনি অস্পৃশ্য ছিলেন। লালনের গান থেকে আমাদের এই ধারণা হয় যে তিনি অশিক্ষিত ছিলেন না। তাঁর গানে সুফীদের পারিভাষিক শব্দ, হিন্দু যোগশাস্ত্রের তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ দেখে মনে হয় উক্ত বিষয়ে তাঁর অধিকার ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে, ১১৬ বছর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। এখানে লালনের একটি পদ উদ্ধার করে দিলাম :

"চেয়ে দেখ না রে মন দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে ॥
হলে সে চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ হয় দরশন
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেছে ঘিরে।"

ফকির পাঞ্জ্‌ শাহ্‌ :

ফকির পাঞ্জ্‌ শাহ্‌ লালনের মতোই উচ্চ-মার্গের অধ্যাত্ম সাধক। পাঞ্জ্‌ শাহ্‌র পুত্র রফিউদ্দিন খোন্দকার পিতার জীবন কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার থেকে জানা যায় যে, পাঞ্জ্‌ শাহ্‌ হলেন খাদেম আলি খোন্দকারের পুত্র। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার শৈল-কুপা গ্রামে পাঞ্জ্‌ শাহের জন্ম। খাদেম আলি চেয়েছিলেন পুত্র নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে শরিয়তী বিধান মেনে চলবেন। কিন্তু পাঞ্জ্‌ শাহ্‌ হৃদয়-ধর্মের প্রেরণায় বাউল পন্থী হয়ে পড়েন। তিনি নিজে অত্যন্ত সাত্ত্বিক জীবন যাপন করতেন। তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন সুফী সাধক হেরাজ-তুল্লা খোন্দকার। পাঞ্জ্‌ শাহ্‌ সাত্ত্বিকতার জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৯১৪ সালে পাঞ্জ্‌ শাহ্‌ দেহরক্ষা করেন। ফকির পাঞ্জ্‌ শাহের একটি পদ উদ্ধার করে দিলাম :

"ত্রিবেণীর তীরে ধীরে সুধারে জোয়ার আসে।
সুখ সাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে॥
উথলে সুধাসিন্ধু
সু-ধারে সুধার বিন্দু
সুখময় সিন্ধুজলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে
জীব নিস্তারিতে জোয়াব এসে অধর মানুষ যায় তো ভেসে॥"

বাউল গীতির কাব্যমূল্য ঃ

আমরা দেখেছি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ঈশ্বরকে তাঁর মহিমময় উচ্চাসন থেকে মানুষের দ্বারে নামিয়ে এনেছিল মাত্র, একেবারে মানুষ করে গড়ে তোলে নি। জীবের মধ্যে দেবতাকে প্রত্যক্ষ যদি বা করেছে, জীবকে দেবতারূপে দেখে নি। ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য তাঁদের যে আর্তি তা মানবীয় প্রেমের আর্তি থেকে স্বরূপে ভিন্ন। "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, হেন প্রেমা-নৃলোকে না হয়।" বাউলেরা বৈষ্ণবদের ছাড়িয়ে এক পা এগিয়ে গেলেন। তাঁরা মানবীয় সম্পর্কের ভিতর দিয়ে দেবতাকে দেখলেন। মানুষী প্রেমের মধ্যে দিয়ে মানুষের মর্মে প্রবেশ করে অন্তর-দেবতা, মনের মানুষকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এই প্রেম সাধনায় রূপের দেউড়ি পার হতে হবে। রূপের ফাঁদে বাধা পড়লেই যত বিপত্তি। রূপের সরণী ধরে রূপাতীতের গভীরে ডুব দিতে হবে। রূপ ধারণার বস্তু—অরূপ ধ্যানের সামগ্রী। রূপ প্রেক্ষণার অতৃপ্তি—অরূপ প্রৈতির

প্রশান্তি। এই অর্থে বাউলেরা অরূপ রসিক। মানবীয় বৃত্তির আশ্রয়ে তাঁরা অরূপের সন্ধান করেছেন বলেই লোকজীবনের বিচিত্র বৃত্তি তাঁদের রচনায় ক্ষেত্র-বিশেষে স্থূল ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে। তথাপি অনুভূতি উপলব্ধির তাপে লৌকিক উপাদানগুলো বিগলিত হয়ে তাঁদের অভিপ্রায়কে ব্যঞ্জিত করেছে। সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাবে তাঁরা গভীর উপলব্ধিকে প্রকাশ করেছেন। এই রচনাগুলোর আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা যায় না, আপন মনে কোন এক নিভৃত মুহূর্তে গুনগুনিয়ে উঠে, যতই গুঞ্জন করতে থাকে ততই যেন মর্মে দাগ কেটে বসে। এই অনির্বাচ্য উপলব্ধিই এর প্রাণ রহস্য। এখানেই এর কাব্যোৎকর্ষ। বাউল গীতির দু'একটি পদ উদ্ধার করলেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন মিলবে :

"আজি আমার সঙ্গে তোমার হোরি
ওগো রসরায়।
আমার একলা দায় নহে গো,
রয়েছে যে তোমারো দায়।
তোমার সুখের চাই তো হাসি
তোমার ফুঁকের চাই তো বাসি
আমার অঙ্গে তোমার বিলাস,
তাই ধরতে যে হয় আমারো পায়॥"

সহজ ব্যাখ্যায় দেখি যিনি অরূপ তিনি লীলারস সম্ভোগের জন্য রূপ ধারণ করেছেন। প্রেমের দায়ে পড়ে রূপ ধারণ করেছেন। আমাকে না হলে তাঁর লীলা জমে না। তাই তো আমাকেও তাঁর প্রয়োজন। কিন্তু এই কি সব? কেবল মাত্র বুদ্ধি তাড়িত গদ্য ব্যাখ্যায় উক্ত পদের মাধুর্য আস্বাদন করা যায় না। এর দু'একটি কলি ভিতর থেকে যখন গুনগুনিয়ে উঠতে থাকে তখনই চর্বণাত্মক রসাস্বাদ ঘটে। আমাকে না হলে তাঁর আত্মোপলব্ধি ঘটত না, এই জন্যেই :

"আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরন্ময়।"

এর জন্য নিজেরও তৈরী থাকতে হবে, পরমের লীলায় সরিক হওয়ার জন্যই :

"ধন্য আমি শূন্যকুম্ভ পূর্ণকুম্ভ নই
তাইতে তোমার জলের খেলায়
তোমার বুকের তলে রইগো সখি—
বুকের তলে রই।

* * * * *

আমি নাচি তোমার সাথে আনন্দ-নীরে।
আমায় তুমি বাঁধ্‌লা প্রেমের বাহুতে ঘিরে।
তাই জলতরঙ্গে তোমার বুকতরঙ্গে
নাইচ্যা আকুল হই।"

বাউলেরা লীলার আনন্দে সব ছেড়ে পথে নেমেছেন। এই বস্তু অনির্বচনীয়।

বাউলদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের ধাতুগত ঐক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বাউলদের প্রকাশভঙ্গীকেও রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে আত্মসাৎ করেছেন। বাউলদের উপজীব্য ছিল মানুষ। রবীন্দ্রনাথ অরূপলোকে পৌঁছিয়েছেন বিশ্বপ্রকৃতির তাবৎ বস্তুকে আত্মসাৎ করে। রবীন্দ্রনাথে মানবীয় প্রেম বহু ব্যাপক পটভূমিকায় সাধনতত্ত্ব নিরপেক্ষভাবে মহিমান্বিত হয়েছে। অরূপ রসিক কবি বলেই বাউলের ভাব-ভঙ্গি অনায়াসে তাঁর কাব্যে সংক্রামিত হয়েছে। এছাড়া কবির আত্ম-প্রকাশের উপায় ছিল না। এই প্রসঙ্গে "চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে" "সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে" "ঘরেও নহে পারেও নহে" "আগুনের পরশমণি" ইত্যাদি রচনাগুলো ভাব-ভঙ্গিতে একেবারে বাউল ধর্মী। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন ;—"আমরা·····দেখব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই সাধন-পন্থা কিরূপ নূতনভাবে আশ্রয় লাভ করেছে। কেবল মর্ত্যপ্রীতি নয়, মর্ত্য জীবনানুরাগের সঙ্গে অনিবার্যভাবে অরূপানুরাগ এবং পরিশেষে জীবন ও অরূপের সমন্বয়ে রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণতা।" বাউল গীতির ঐতিহাসিক মূল্য এইখানে। কাজেই বলা যেতে পারে যে, সাহিত্যের ইতিহাসে বাউল গীতির চিরন্তন স্থান নির্ধারিত হয়েছে।

● একাদশ অধ্যায় ●

॥ ভারতচন্দ্র ॥

(১)

কবি পরিচিতি ঃ

হুগলী জেলার দামোদর নদের দক্ষিণে ভুরস্থট নামে বর্ধিষ্ণু পরগণা ছিল। ভুরস্থট খ্রীষ্টীয় ১১শ থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাদীক্ষার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। অনুমান করা হয় খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতকের শেষ দিকে ভুরস্থট পরগণায় কৃষ্ণচন্দ্র রায় ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ফুলিয়ার মুখুটি বংশের লোক। কবি কৃত্তিবাসের সঙ্গে এঁর বংশগত যোগ রয়েছে। ভুরস্থট পরগণার অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রামের অধিপতি ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মধ্যম পুত্র মহেন্দ্র রায়। মহেন্দ্র রায়ের পৌত্র সদাশিব রায়ের পৌত্র নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র হলেন ভারতচন্দ্র।

ভারতচন্দ্রের রচিত দুটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটিতে ভারতচন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তার থেকে জানা যায় যে, ফুলিয়ার মুখুটি বংশের নরেন্দ্র রায় তাঁর পিতা, দেবানন্দপুরের জমিদার রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থেকে কবি ফারসী শিক্ষা করেছিলেন, এবং দেবানন্দপুরে থাকা-কালে সংক্ষেপে পাঁচালী রচনা করেছিলেন। অবশ্য ভারতচন্দ্র রচনাটিকে 'ব্রতকথা' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন ;—"ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা।"

কবি ঈশ্বরগুপ্ত ভারতচন্দ্রের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করে "কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত" শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় ১২৬২ সালের ১লা আষাঢ় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি "সনে রুদ্র চৌগুণা" কথাটির ইঙ্গিত ধরে পাঁচালী কাব্যটির রচনাকাল স্থির করেছিলেন ১১৩৪ সন বা ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ। এবং তিনি "কতিপয় প্রামাণ্য লোকের কথামত" কবির বয়স ১৫ বছর বলে স্থির করেছিলেন। এই হিসাবে ভারতচন্দ্রের জন্মকাল হয় ১৭১২ খ্রীঃ। কবির জন্মকাল নিয়ে ...য় অবকাশ নেই। কেননা ১৭৬০ খ্রীঃ ৪৮ বছর বয়েসে ভারতচন্দ্র ... করেন। তবে আপত্তি অন্য ক্ষেত্রে সেইটে হল পাঁচালী রচনাকাল

১১৩৪ সন বা ১৭২৭ খ্রীঃ কি না। "সনে রুদ্র চৌগুণা" হিসাবে ১১৩৪ সন হয় না। রুদ্র ১১ এবং চৌগুণা অর্থাৎ তার ৪ গুণ=৪৪। সুতরাং ১১৪৪ সন বা ১৭৩৭ খ্রীঃ। এই সময় ভারতচন্দ্রের বয়েস হয়েছিল ২৫ বছর। অবশ্য উক্ত সংশোধন গুপ্তকবি নিজেই করেছেন। এইটে গ্রহণযোগ্য মত এবং নানা তথ্য সমর্থিত। কবি "নাগাষ্টক" রচনা করেছেন ৪০ বছর বয়েসে। কাব্যে ঐ বয়েসের উল্লেখ কবি নিজেই করেছেন। দ্বিতীয় কথা পাঁচালী রচনা করেছেন ফারসী শিক্ষার পরে। লক্ষ্য করতে হবে প্রথমে তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত অর্থকরী বিদ্যা নয় বলে অগ্রজদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যান এবং ফারসী শিক্ষা করেন। দুটি ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। ব্যুৎপত্তি অর্জন করে কাব্য রচনায় সময় তাঁর বয়েস ২৫ বছর হওয়াটাই স্বাভাবিক।

১৭১২ খ্রীঃ ভারতচন্দ্রের জন্ম। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে ভুরসুট পরগণার রাজার সদ্ভাব ছিল না। বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র ভুরসুটের বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৭১৩ খ্রীঃ ভুরসুট জয় করেন। এই সঙ্গে পেঁড়ো তাঁর অধিকারে আসে। নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ্যহারা হলেন। ১৭১৭ খ্রীঃ ভারতচন্দ্র মণ্ডলঘাট পরগণার নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে চলে যান। সেখানে থাকাকালে তাজপুর গ্রামের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময়ে সারদা গ্রামের নরোত্তম আচার্যের মেয়ে রাধাকে বিয়ে করেন। এর পর বাড়ী ফিরে এলেন। তাঁর অগ্রজেরা তাঁর বিয়ের জন্য এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য আদৌ খুশি ছিলেন না। তাঁদের তিরস্কারের ফলে তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে যান। দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে থেকে ফারসী শিক্ষা করেন। শিক্ষার শেষে বাড়ী ফিরলেন। এইবার তাঁর অগ্রজেরা সম্পত্তির তদারকের জন্য বর্ধমানের রাজার দরবারে পাঠালেন। (ইতোমধ্যে বর্ধমান রাজের কাছ থেকে হৃত সম্পত্তি ইজারা পেয়েছিলেন।) কিছুদিন বেশ ভালই গেল। তারপর সহোদররা রাজস্ব না পাঠানোতে বর্ধমান রাজ সম্পত্তি খাস করে নেন। ভারতচন্দ্র তার প্রতিবাদ করলে কারারুদ্ধ হলেন। কারারক্ষীকে বশ করে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে বর্ধমান রাজের সীমানা পেরিয়ে কটকে মারাঠা সুবেদার শিবভট্টের আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। পরে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে বৈষ্ণবদের সঙ্গে কিছুকাল বসবাস করেন। সেই সময় বৈষ্ণবগ্রন্থাদি অধ্যায়ন করেন। বৈষ্ণবের ভেক ধরে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে খানাকুলে শ্যালিকা-পতির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এর ফলে তিনি আবার ঘরে ফিরলেন।

জীবিকার জন্য ফরাসডাঙায় ডুপ্লে সাহেবের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে হাজির হলেন। ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর বিদ্যাবত্তা এবং পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন ভারতচন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করতে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে ভারতচন্দ্রকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। কালক্রমে নিজগুণে ভারতচন্দ্র মহারাজার কাছ থেকে "রায় গুণাকর" উপাধি পান। মূলাজোড়ে ১৬ বিঘা জমি এবং পরে তারই কাছে গুস্তে গ্রামের ১০৫ বিঘা জমি লাভ করেন। ১৭৫০ খ্রীঃ থেকে ভারতচন্দ্র মূলাজোড়ে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু ইতোমধ্যে বর্ধমানের মহারাণী মূলাজোড় গ্রাম পত্তনি নেন এবং রামদেব নাগ নামে এক ব্যক্তিকে রাজস্ব আদায়ের কাজে নিয়োগ করেন। রামদেবের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতচন্দ্র দ্ব্যর্থবোধক "নাগাষ্টক" কাব্য রচনা করেন ১৭৫১ খ্রীঃ এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার দেন। এই কাব্যপাঠের পর মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামদেবের অত্যাচার বন্ধ করবার উপায় করেন। এর পর ৪০ বছর বয়সে কবি রাজসভায় ফিরে যান। সেখানেই বাকি দিনগুলোর বেশির ভাগ সময় কাটান এবং ৪৮ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

ভারতচন্দ্রের জীবনী থেকে তাঁর প্রকৃতি সম্পর্কে এই ধারণা জন্মায়, এক—ভারতচন্দ্র অত্যন্ত মেধাবী এবং স্বাধীনচেতা ছিলেন; দুই—তাঁর বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ এবং ধৈর্য ছিল অপরিসীম। বারবার বিপদে পড়েও তিনি ধৈর্যহারা হন নি, উপস্থিত বুদ্ধিবলে রক্ষা পেয়েছেন; তিন—দুঃখ, দারিদ্র্য নানা দুর্বিপাক তাঁর জীবনে বারবার এসেছে, কিন্তু তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি,—তাঁর মনের প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। তিনি জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে দেখেছেন শিল্পীর দৃষ্টিতে। সমকালীন সমাজের অনাচার ভণ্ডামি যার ভিতরে তিনি নিজে বসবাস করেছেন সেগুলোকে দেখেছেন নিরাসক্তভাবে। সামাজিক, রাষ্ট্রিক দুঃখ-দুর্দশা দৈবকৃত নয়,—মানুষের সৃষ্টি, এই ঐহিক দৃষ্টি কখনো ঝাপসা হয় নি। একে তিনি বিদ্রূপ করেছেন সরস, তির্যক ভঙ্গীতে। প্রমথ চৌধুরী "ভারতচন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে কবির শিল্পচেতনাকে বলেছেন, "ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব, তাঁর রচনারীতিতে ফুটে উঠেছে নাগরবৈদগ্ধ্য।"

(২)

অন্নদামঙ্গল কাব্য বিষয়বস্তু :

ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি "অন্নদামঙ্গল" কাব্য। এই কাব্য তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড—শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খণ্ড—বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল, তৃতীয় খণ্ড—মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল। তিনটি খণ্ডের কাহিনী পরস্পরের সঙ্গে অনিবার্য কার্য-কারণ সূত্রে যুক্ত নয়। গল্পগুলো আলাদা আলাদা ভাবে লেখা, এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী। কেবল অন্নদা বিভিন্ন রূপভেদে কাহিনীগুলোর মধ্যে ক্ষীণ যোগসূত্র রক্ষা করেছেন। কাব্যটির রচনাকাল ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ।

এই কাব্যে কবির লক্ষ্য রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্নদাপূজাকে অবলম্বন করে তাঁর পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী বর্ণনা। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে এসে গেছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী, মানসিংহ, জাহাঙ্গীরের কাহিনী, পটভূমিকায় এসেছে বাংলাদেশ এবং দিল্লী। এরই মাঝে অন্নদার দৈবী-মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে (কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়) বলে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনীর সূত্রধার হিসাবে অন্নদাকে কল্পনা করতে হয়েছে। কাব্য কাহিনী সামান্য বিশ্লেষণ করে আমাদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

প্রথম খণ্ডে ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্য রচনার প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নানা দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টি-প্রকরণ ও গ্রন্থোৎপত্তি, হরগৌরীর কাহিনী, দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তিগ্রহণ, শিবের অন্নদা পূজা, কাশীপ্রতিষ্ঠা, ব্যাসকাশীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই সবের মধ্যে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য (চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন) এবং মার্কণ্ডের পুরাণের কাশীখণ্ডের অনুসরণ আছে। এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন হরিহোড়ের লৌকিক কাহিনী। এখানেও মঙ্গলকাব্যের প্রথামতো অভিশপ্ত স্বর্গবাসী বসুন্ধর মর্ত্যে এসেছেন দেবীর পূজা প্রচারের জন্য। বসুন্ধর হল হরিহোড়। পরে তার স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময় হলে দেবী ছলনা করে তাকে ত্যাগ করে ভবানন্দের উপর কৃপা করলেন। ভবানন্দ হল স্বর্গভ্রষ্ট নলকুবর। পথে ঈশ্বরী পাটনীকে দেবী কৃপা করেছিলেন। ঈশ্বরী পাটনী খেয়া পার করে দেওয়ার পর দেখল যে সেঁউতির উপরে মানবীরূপী দেবী শ্রীচরণ রেখেছিলেন সেইটি সোনায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এবং তাকে মন মতো বর দিয়ে দেবী অদৃশ্য হলেন। পথিমধ্যে এই অলৌকিকত্ব প্রদর্শন ভবানন্দের সহজ স্বীকৃতি লাভের প্রস্তুতি বলে মনে হয়। কেননা ভবানন্দ পাটনীর কাছ থেকে উক্ত অলৌকিক

কাহিনী শুনে ঘরে ফিরে এক "মনোহর ঝাঁপি" দেখেন এবং দৈববাণী শোনেন:

"এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে॥"

এইখানে প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। ঈশ্বরগুপ্তের বিবৃতি এবং জনশ্রুতি অনুযায়ী এই খণ্ডটি পৃথকভাবে রচিত হয়েছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে প্রথম খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই কাহিনীর পটভূমিকায় আছে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সংঘাতের ইতিহাস। মোগল সেনাপতি মানসিংহ বাংলায় প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসেছিলেন। ভবানন্দ তখন মানসিংহকে সাহায্য করেন। তাঁর সহায়তায় মানসিংহ যুদ্ধজয় করেন, ফলে ভবানন্দের প্রাধান্য প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এবং তা ক্রমে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই পটভূমিকায় কাহিনীর সূত্রপাত।

মানসিংহ যখন বাংলায় এলেন ভবানন্দ তখন দেবীর বরে বর্ধমানের কাননগো নিযুক্ত হলেন। সেখানে একটি সুড়ঙ্গ দেখে মানসিংহ তৎসম্পর্কে কৌতুহলী হলে ভবানন্দ বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বলতে সুরু করেন। এর বিষয়বস্তু হল বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের বিদুষী, রূপবতী কন্যা বিদ্যার সঙ্গে কাঞ্চীরাজ গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দরের প্রণয় কাহিনী। সুন্দর দেবী কালিকার কৃপায় কি ভাবে গোপন সুড়ঙ্গ পথে বিদ্যার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, ধরা পড়বার পর রাজরোষ থেকে কি ভাবে দেবীর কৃপায় রক্ষা পেয়েছে এবং বিয়ে করে দেশে ফিরে গেছে তাই অসাধারণ শিল্প কুশলতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় হল দুটি জিনিস। (১) বিদ্যাসুন্দরের গল্প কবির মৌলিক উদ্ভাবনা নয়। সংস্কৃতে এই কাহিনী বহুদিন ধরে চলে আসছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য বিহ্লনের "চৌর-পঞ্চাশিকা" বররুচির নামে প্রচলিত "বিদ্যাসুন্দরম্" ইত্যাদি। আর বাংলা কাব্যে দু'তিন শতাব্দী ধরে এই কাহিনী চলে আসছিল। শ্রীধর, সাবিরিদ খাঁ, নিমতার কৃষ্ণরাম দাস, কবিবল্লভ প্রাণরাম চক্রবর্তী এই কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। শতাব্দীর পথে ঘুরপাক খেতে খেতে ভারতচন্দ্রের হাতে এসে এটি কাব্যগুণোপেত হয়েছে। (২) এই কাব্যের কালিকা অন্নদার রূপভেদ বলে মনে হয়। যদিও কাব্যে কালিকার প্রসঙ্গ এসেছে, তবুও তা গৌণ। আসলে বিদ্যাসুন্দর মানবিক প্রণয়োপখ্যান। রক্ত-মাংসের মানুষের দেহ সম্ভোগের কাহিনী। শ্রোতার বিশ্বাস উৎপাদনের

উপায় হিসাবে কবি কালিকার প্রসঙ্গ এনেছেন। লক্ষ্য করতে হবে কালিকার প্রসঙ্গ কাব্যের দুই জায়গায় পাওয়া যায়। সুড়ঙ্গ খোঁড়বার ব্যাপারে, আর মশান থেকে সুন্দরকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে। অতএব এই কাব্যে কালিকামঙ্গলের ঠাট বজায় রাখলেও ভারতচন্দ্র কালিকা মাহাত্ম্য নিবেদন করেন নি।

এখানে স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে প্রথম খণ্ডের সঙ্গে এর নাড়ির যোগ নেই। অন্নদার অন্নপূর্ণার মূর্তি অপসৃত, ভবানন্দের দেবীর কৃপালাভের বিষয় একমাত্র কাননগো নিযুক্ত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, মানসিংহের মতো মুরুব্বী পাওয়াতেই শেষ হয়ে গেছে। মুখ্য হয়ে উঠেছে বিদ্যাসুন্দরের প্রণয় কাহিনী। মনে হয় ভবানন্দের কাছে মানসিংহের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী শোনবার বেনামদারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কাছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী শুনছেন।

তৃতীয় খণ্ডের পটভূমিকায় আছে দিল্লী। মানসিংহ যুদ্ধজয় করে ভবানন্দকে নিয়ে দিল্লীতে গেছেন। যুদ্ধ বৃত্তান্ত সম্রাট জাহাঙ্গীর জানতে চাইলে মানসিংহ সব বিবৃত করে জানালেন দেবীর ভক্ত ভবানন্দ কি ভাবে বিপর্যয় থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। জাহাঙ্গীর তা বিশ্বাস করলেন না। উপরন্তু সব কিছু ভূতুড়ে কাণ্ড বলে উড়িয়ে দিয়ে হিন্দু দেব-দেবীর যৎপরোনাস্তি নিন্দা করলেন। ভবানন্দ তার প্রতিবাদ করায় তাঁকে কয়েদে যেতে হল। কয়েদখানায় দেবীর স্তুতি করলেন। এইবার দেবী জাহাঙ্গীরকে ভূত দেখাতে সুরু করলেন। সমগ্র দিল্লী নগরী ভূতের উপদ্রবে তছনছ হয়ে গেল। জাহাঙ্গীরের রাজ্যপাট যায় যায় অবস্থা। এহেন বেগতিক অবস্থায় পড়ে সম্রাট অনুতপ্ত হলেন। সম্রাটের অনুতাপ দেখে দেবীর দয়া হল। তিনি জাহাঙ্গীরকে এক অনৈসর্গিক দৃশ্য দেখালেন। আকাশে বাদশাহী দরবার বসেছে। তিনি বাদশাহ হয়ে বসেছেন, তাঁর অনুচরেরা আমীর ওমরাহ পদে বসে আছেন, দেবরাজ ইন্দ্র মাথায় রাজছত্র ধরে আছেন। এইসব অদ্ভুদ কাণ্ড-কারখানা দেখে সম্রাট ভবানন্দকে মুক্তি দিলেন, "রাজা" খেতাব দিলেন, পারিতোষিক দিয়ে বললেন, "ভাল মতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা।" এবং দিল্লীতে ধুমধাম করে দেবীর পূজা করলেন। এরপর ভবানন্দ দেশে ফিরবার পথে কাশীতে দেবীর পূজা দিয়ে গেলেন। কিছুদিন সুখ সম্ভোগের পরে নরলীলা সংবরণ করে স্বর্গে ফিরে গেলেন।

এই কাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীর সঙ্গে ক্ষীণভাবে যুক্ত। ভবানন্দের গৌরব কথনের সূত্রে অন্নদার কথা এসে পড়েছে। সুতরাং লক্ষ্য করছি অন্নদা তিনটি খণ্ডের যোগ রক্ষা করেছেন। আসলে রাজা গল্প শুনতে

চেয়েছেন। ভারতচন্দ্র রাজাকে খুশি করবার জন্যে অন্নপূর্ণা পূজাকে অবলম্বন করে গল্প বলতে সুরু করেছেন। কখনো কবি নিজে বলছেন, কখনো বা কাব্যোক্ত চরিত্রের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। গল্পের মধ্যে এসে পড়েছে আরেকটা গল্প। ক্ষীণসূত্রে এক গল্প আরেক গল্পের সঙ্গে যুক্ত। গল্প বলবার এমন কৌশল যে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলে, রঙ্গে ব্যঙ্গে উত্তরোল, তির্যক কটাক্ষে, বিদ্রূপে ঝিকমিক্ করে উঠে। কবি যুগ-পরম্পরাগত কাহিনীকে আত্মীকরণ করে মধুচক্র রচনা করেছেন। তাঁর ব্যক্তি-মেজাজের বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আখ্যান কাব্য। ছন্দে, অলঙ্কারে, বাক্‌রীতিতে "অন্নদামঙ্গল" বাংলা কাব্যে অনন্য। সমগ্র মধ্যযুগীয় বাঙালী কবিদের মধ্যে মুকুন্দরাম এবং ভারতচন্দ্রের রচনায় স্টাইলের ছাপ আছে। ভারতচন্দ্র স্টাইলিষ্ট।

(৩)

ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টির স্বরূপ ও মঙ্গলকাব্যের কবিদের সঙ্গে পার্থক্য:

ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" কাব্যের কাহিনী কথনে মঙ্গলকাব্যের আদল বা ছাঁদ গ্রহণ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর মনোভঙ্গী (attitude) মঙ্গলকাব্যের কবিদের সমগোত্রীয় নয়। মঙ্গলকাব্যে লক্ষ্য করেছি কাব্য রচনার কারণ হিসাবে দৈবাদেশের উল্লেখ করা হয়, দেবতাকে খুশি করে পার্থিব জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির কামনা, বিশেষ দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার তার মুখ্য উদ্দেশ্য। "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে লক্ষ্য করছি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি কাব্য রচনা করেছেন, তাঁকে খুশি করে ঐহিক সম্পদ লাভ তাঁর উদ্দেশ্য। অন্নদাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের অছিলায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের গৌরব গাথা রচনা করেছেন। আরো লক্ষণীয় হল চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর বন্দনার পাশাপাশি চৈতন্য বন্দনা করা হয়, "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে চৈতন্য বন্দনা করা হয় নি।

দ্বিতীয় কথা হল এই যে, মঙ্গলকাব্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয় চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে, ছলে বলে কৌশলে পূজা আদায় করতে দেখি। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রের কাব্যে এই রকমের প্রসঙ্গ নেই। অন্নদাদেবী স্বচ্ছন্দ

স্বীকৃতি পেয়েছেন। মনে হয় এই সময় মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক সহজ হয়ে পড়েছে। এইজন্যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে তীব্র নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে, এই কাব্যে তা হয় নি। তা ছাড়াও লক্ষ্য করি এর আগেকার মঙ্গলকাব্য-গুলোতে দৈবশক্তির অলৌকিক লীলা ধূসর ছায়াচ্ছন্ন কাব্যজগতের সঙ্গে বেশ মানানসই। সেখানকার নরনারীরা কাল্পনিক, তাদের চলাফেরা, হাবভাব আদিম সরল বিশ্বাসের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না। ঐ পরিবেশে সাপের অত্যাচার, কমলে-কামিনীর আবির্ভাব আমাদের বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করে না। পক্ষান্তরে "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে দেবীর অলৌকিক শক্তি প্রকাশ আমাদের পরিচিত ইতিহাস-কথা এবং ইতিহাসের ব্যক্তিদের আশ্রয় করাতে আমাদের বিশ্বাস-বোধ আহত হয়। কাব্য পরিবেশ এবং দেবতার লীলার মধ্যে সঙ্গতি নেই। বিশেষ যখন লক্ষ্য করি সম্রাট জাহাঙ্গীর ভূতের হাতে নাস্তানাবুদ হওয়ার পরে বলেন, "ভাল মতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা।" তখন হাসি সংবরণ করা যায় না। শুধু তাই নয়, এর ভিতরে দেবদেবী সম্পর্কে দীর্ঘকাল পোষিত ধারণাকে প্রচ্ছন্নভাবে আঘাত করেছেন কবি। এ-তো একেবারে Satirist-এর দৃষ্টি। ভক্তির ছিটেফোঁটাও নেই। বরঞ্চ দেখছি পুরাণোক্ত এবং মঙ্গলকাব্যোক্ত দেবদেবীকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করেছেন। দেবতা এখানে সহজ স্বীকৃতি পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তা বক্রদৃষ্টি সম্বর্দ্ধিত। ভারতচন্দ্রের ব্যঙ্গ করবার প্রবণতা সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে আছে। আপাত চাকচিক্যময় জীবনের ভিতরটা যে কত ফাঁপা সেইটে হাসির আলো ছড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। মুকুন্দরামও চরিত্রের অসঙ্গতিগুলোকে ব্যঙ্গ করেছেন, সমাজকে বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু তাতে জ্বালা নেই। জীবনের দিকে কৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। কোন রকম আঘাত করবার ইচ্ছে নেই মুকুন্দরামের। ভারতচন্দ্রের কৌতুক বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত হয়ে স্যাটায়ারে রূপান্তরিত হয়েছে। কৌতুকের পর্যায়ে আর থাকে নি—তাতে খানিকটা জ্বালা আছে। এই জ্বালাকে নিরাবরণ না করে বুদ্ধিদীপ্ত তির্যকতায়, সরস ইঙ্গিতে তার চারপাশে সাময়িক কৌতুকের ভাবাবহ সৃষ্টি করেছেন। এর আবেদন মার্জিত বুদ্ধির কাছে।

তৃতীয়তঃ মঙ্গলকাব্যে দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনের অলৌকিক পরিবেশের ঘন আবরণ ছিঁড়ে 'ভেরেণ্ডার থাম', 'ভাঙা চাল', 'মাটিয়া পাথরা', 'খুঞার বসন' উঁকি-ঝুঁকি দেয়। সাধারণ মাটি ঘেঁষা মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠে ঠিকই, কিন্তু সে সব দেবমাহাত্ম্য প্রকাশের অবলম্বন হিসাবে আসে। পক্ষান্তরে এই কাব্যে দেবতার অলৌকিক কীর্তিকলাপকে ছাপিয়ে উঠেছে

মানুষের কথা। আর এই মানুষ বাস্তব জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। এর উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। নরনারীর রক্ত-মাংসের আকর্ষণ এখানে শিল্পায়িত হয়েছে। কোন অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নিয়ে প্রেমকে শোধন করেন নি কবি। কেবল যুগাগত কাহিনীর স্থূলতাকে শিল্পচাতুর্যে আবৃত করেছেন। দেহসম্ভোগকে বর্ণনার গুণে রমণীয় করে তুলেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—"ইংরাজীতে যাহাকে gusto বলে, সেই জীবনরস-উচ্ছলতার সবটুকু উপভোগ শক্তি দিয়া তিনি এই কলুষিত অথচ মোহকারী সৌন্দর্যের চরম স্বাদুতা আস্বাদন করিয়াছেন। উচ্ছৃঙ্খল যৌবন-মাদকতার রূপসজ্জাময় প্রতিবেশ রচনায়, সংলাপে, গানে, সহায়ক পাত্রপাত্রীর নিপুণ সমাবেশে, বর্ণনা-বিবৃতিতে উপচাইয়া পড়া রস সঞ্চারে তিনি সমগ্র কাব্যটিকে একটি কামকেলি বিলাসের পীঠস্থানের মর্যাদা দিয়াছেন।" একে অশ্লীল বলা যাবে না।

অতএব আমরা অনায়াসে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, ভারতচন্দ্র আদৌ ভক্ত কবি নন। ভক্তের দৃষ্টিতে অন্নদাকে দেখেন নি—দৈবনির্ভরতা তাঁর মধ্যে নেই। জীবন ও জগতের প্রতি তাঁর মনোভঙ্গী বস্তুনিষ্ঠ এবং বিদ্রূপাত্মক। তাই মঙ্গলকাব্যের কবিদের সঙ্গে তাঁর সগোত্রতা নেই। বলা উচিত মঙ্গলকাব্যের কাঠামোতে তিনি আধুনিক জীবন চর্চা করেছেন।

রচনারীতি :

ভারতচন্দ্রের কাব্য পাঠ করলে যেটা প্রথমেই চোখে পড়বে সেইটে তাঁর রচনারীতি। কবি কাব্য-কাহিনী বর্ণনা করেছেন কখনো নিজে কখনো বা কাব্যোক্ত চরিত্রের মুখ দিয়ে। মাঝে মধ্যে ছোট ছোট গীতি কবিতা ব্যবহার করে কাহিনীর ভিতরকার যোগসূত্র রক্ষা করেছেন। কবি স্বয়ং এবং কাব্যের পাত্রপাত্রীরা সকলেই তির্যক ভঙ্গীতে কথা বলে। সকলেই শ্লেষদক্ষ, ব্যঙ্গনিপুণ। সকলের কথাবার্তা বুদ্ধিদীপ্ত, সৃষ্টি করে অভাবনীয় চমক। ঘুম-জড়ানো মনকে নাড়া দিয়ে যায়। কথা বলাও যে একটা আর্ট সেইটে ভারত-চন্দ্রের রচনা পড়লেই বোঝা যায়। গ্রাম্য ভাষাকে ছেনে দেশজ, তৎসম, তদ্ভব, হিন্দী, ফার্সীর সমন্বয়ে ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। এই ভাষা মার্জিত, গ্রাম্যতামুক্ত, ঝর্‌ঝরে, তক্‌তকে। ওস্তাদের হাতে কাটা হীরক-খণ্ডের মতো তার দীপ্তি। ডঃ সুকুমার সেন ভারতচন্দ্রের কাব্যে লক্ষ্য করেছেন "রচনার দ্যুতি"—বাক্-বৈদগ্ধ্য। শব্দচয়নের এবং ব্যবহারের মুন্সীয়ানায় বাক্য হয়ে উঠে সরস ও সরল। লক্ষ্য করি আগাগোড়া কাব্যে স্মিত মন্তব্যে,

ইঙ্গিতে, সংকেতে, শ্লেষ-কটাক্ষে ভাষা ঝলমল করে উঠেছে, তেমনি তার সাবলীল গতি। এর মূল কারণ ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বিন্যাস নৈপুণ্য।

ভারতচন্দ্র শব্দকুশলী কবি। শব্দধ্বনি দিয়ে, এমন কি অর্থহীন শব্দের ব্যবহার করে তিনি ছবি আঁকেন, অভিলষিত ভাবোদ্দীপন করেন। মধ্যযুগে গোবিন্দদাস ছাড়া তাঁর জুড়ি মেলে না। এই প্রসঙ্গে দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, শিবের তাণ্ডব নৃত্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন :

"লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলক্কল তরঙ্গা॥"

কেবল ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করে কবি নৃত্যরত শিবের কম্পিত জটাজালে গঙ্গার তরঙ্গ-বিক্ষেপ ফুটিয়ে তুলেছেন। ছলচ্ছল, কলক্কল জলের প্রবাহ-ধ্বনি, টলট্টল তার স্বচ্ছতার দ্যোতনা সৃষ্টি করে। চোখ এবং কানের কাছে এর যুগপৎ আবেদন রয়েছে। "চ্ছ", "ট্ট", "ক্ক" যুক্তাক্ষরগুলোর উপরে যে ধাক্কা এসে পড়ে তাতে গঙ্গার ভয়াল রূপটিকে দ্যোতিত করে, যা ছলছল, কলকল শব্দের ব্যবহারে সম্ভব নয়। শিবের তাণ্ডব নৃত্যের ভয়ালতার সঙ্গে গঙ্গার এই রূপ-কল্পনার অন্তরঙ্গতা রয়েছে। একেই বলে আর্ট।

ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ব্যবহারে লক্ষ্য করি প্রথাজীর্ণ উপমাদির মধ্যে নতুন দ্যুতি সঞ্চারিত করেছেন। নতুন ইঙ্গিতে সংকেতে তা প্রাণচঞ্চল। যেমন সুন্দর বিদ্যার রূপ বর্ণনা করেছে—

"তড়িত ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥"

রাধিকার রূপ-বর্ণনায় বিদ্যুতের উপমা বৈষ্ণব কবিও ব্যবহার করেছেন "মেঘমাল সঞে তড়িতলতা জনু"—কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের চমকানি। মুহূর্তে আবির্ভূত,—নিষ্ক্রান্তির সংকেতে সচকিত। রূপতৃষ্ণা এর মধ্যে নিশ্চয় আছে, কিন্তু বর্ণনায় নিসর্গের মামুলি তুল্য যোগটুকু আছে। মেঘ এবং বিদ্যুতের সম্পর্ক স্বাভাবিক, সেইটে উপমান হয়েছে রাধিকার রূপের, আভাস দিচ্ছে ইন্দ্রিয়োত্তর জগতের। এই রূপ আমাদের বাসনা মথিত করে, নয়নলোভন, কিন্তু ধরাছোঁয়া যায় না। পক্ষান্তরে ভারতচন্দ্রে লক্ষ্য করছি, বিদ্যার বসনাবৃত দেহে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি। লালসা-কামনাকে জাগিয়ে তোলে। "লুকাইতে চাহে" ক্রিয়াপদ লালসার সঙ্কেত দেয়। বিদ্যা বুঝি বা রূপ সচেতন, তাই বসনের আড়াল দিতে চায়, তবুও তার দীপ্তি ঢাকা থাকে না। অথচ কামনার ফাঁদে বন্দী থেকেও রূপের সূক্ষ্মতা ব্যঞ্জিত হয়। বিদ্যুতের দাহ

ছেঁকে নিয়ে কবি রূপ সৃষ্টি করেছেন। ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যের অন্যতম রূপকার।

ভারতচন্দ্র বাংলা কাব্যে প্রথম শিল্পী যিনি নানা ধরণের সংস্কৃত ছন্দ, (ভুজঙ্গ-প্রয়াত, তোটক, তূনক ইত্যাদি) সার্থক ভাবে, বাংলা ছন্দের মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত ছন্দের সাধারণ বৈশিষ্ট্য চরণান্তিক মিলের অভাব। কবি তাকেই সুকৌশলে ব্যবহার করলেন মিল রক্ষা করে। অথচ তা কোথাও আড়ষ্ট নয়। ভারতচন্দ্রের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সরসতা ও প্রসাদগুণ। রমেশচন্দ্র যথার্থ বলেছেন,—"Bharatchandra is a complete master of the art of versification and his appropriate phrases and rich descriptions passed into bye-words." সহজ কথায় ভারতচন্দ্রের লেখায় শব্দ, অলঙ্কার, ছন্দ সব কিছু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যেমন ভাষার "কারুকার্য", তেমনি তার "উজ্জ্বলতা"। রচনার মধ্যে ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। এই হল "স্টাইল"—ভারতচন্দ্র স্টাইলিষ্ট কবি।

রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যরূপ" প্রবন্ধে বলেছেন,—"সাহিত্যে যখন কোন জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন।···সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে···সেই বিষয়টি যে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা।" ভারতচন্দ্রের লেখায় ঐ "অপূর্বতা" ফুটে উঠেছে। এইখানে তাঁর কবিকৃতির সাফল্য। এর মূলে আছে কবির পরিমিতি বোধ, শোভনতা বোধ। অশ্লীল বিষয়ও বলবার ঢঙে শোভন হয়ে উঠে। ভারতচন্দ্র মিতবাক্ এবং চারুবাক্। তিনি যথার্থ রূপদক্ষ কবি।

(৪)

ভারতচন্দ্রের প্রভাব ও আধুনিকতার পূর্বাভাস :

ভারতচন্দ্রের কাব্যে আমরা লক্ষ্য করেছি, জীবন ও জগতের প্রতি মোহমুক্ত বক্র মনোভঙ্গী, লক্ষ্য করেছি বাস্তব জীবনপ্রীতি। তাঁর বাস্তব জীবনপ্রীতি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, জীবনের ফাঁক-ফাঁকি উদ্ঘাটন করবার শিল্পকৌশল, আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত কাব্যসৃষ্টি ফরমায়েসী ব্যাপার নয়, এই কথা ভারতচন্দ্র বেশ ভাল করেই জানেন। অথচ ফরমায়েসী কাব্য রচনা করে তাঁকে জীবিকা

নির্বাহ করতে হয়েছে। তাই সজ্ঞানে রাজার মনস্তুষ্টি করবার আড়ালে তাঁকেই বিদ্রূপ করেছেন। রাজা ও তাঁর সভাসদেরা এমন দেবমাহাত্ম্যমূলক গীত শুনতে চেয়েছেন যার উপর কবির নিজেরই আস্থা নেই। ঐ অন্ধবিশ্বাসকে তিনি সুচতুরভাবে বিদ্রূপ করেছেন। সহজ কথায় বলা যেতে পারে, যে সমাজকে আশ্রয় করে জীবিকার সংস্থান করেছেন সেই সমাজের ধ্যান-ধারণা, জীবন-চর্চা, বিশ্বাসকে তিনি শ্লেষ কটাক্ষে জর্জরিত করেছেন। এইখানে ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা। এই আধুনিকতা ফুটে উঠেছে ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনায়, ফুটে উঠেছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী-বর্ণনায়। বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়-লীলাকে আধ্যাত্মিক স্তরে না তুলে শুধু শিল্প কুশলতায় রমণীয় করে তুলেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের কবিদৃষ্টির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—"এক অভিনব বাস্তববোধের, এক নূতন সমাজ-সচেতনতা ও তীক্ষ্ণ মোহমুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টির জীবন পর্যালোচনার এক স্বতন্ত্র স্বকীয়তার জন্য আধুনিকতাধর্মী।"

ভারতচন্দ্রে আধুনিকতার যে পূর্ব লক্ষণ দেখি তাই পরবর্তীকালে নানা কার্যকারণ সূত্রে পরিপুষ্টি লাভ করেছে। উপন্যাসে বাস্তবতাধর্মী জীবন ও সমাজ পর্যালোচনায়, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিতে সেইটে অনুভব করা যায়। দেব-দেবীকে নিয়ে তিনি যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে তার সম্প্রসারিত রূপ লক্ষ্য করা যায় ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর বসুর ব্যঙ্গাত্মক রচনায়। দেবদেবীরা সাহিত্যে এসেছেন বিদ্রূপের অবলম্বন হিসাবে। প্রমথ চৌধুরীর রচনারীতির উপরে তাঁর প্রভাব পড়েছে। প্রমথ চৌধুরীর সব লেখাতেই তির্যকভঙ্গী, শ্লেষ, বিদ্রূপ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভাষাও ঝকঝকে তকতকে।

বাংলা কাব্যের ছন্দের উপরে তাঁর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। পয়ার ছন্দের বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতচন্দ্রের পূর্বেকার কাব্যছন্দর সঙ্গে ভাষার উচ্চারণভঙ্গীর সঙ্গতি ছিল না। স্বাভাবিক উচ্চারণ-ভঙ্গীকে ছন্দের খাতিরে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মাঝে মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা যায়। ভারতচন্দ্রের হাতে এসে ঐটে আর ব্যতিক্রম থাকল না—সাধারণ ধর্ম হয়ে দাঁড়ালো। ভারতচন্দ্র উচ্চারণভঙ্গী এবং ছন্দের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত করলেন। ফলে ছন্দের মুক্তি ঘটে গেল, তার গতি হল সাবলীল। এখন আর পড়তে গেলে হোঁচট খেতে হয় না—অসমান অংশগুলোকে গানের সুরে মেলাবারও দরকার হয় না। পয়ারের কাঠামোকে মেনে নিয়েই কবি

ছন্দের রূপান্তর সাধন করে দিলেন। ভারতচন্দ্র ছন্দের যে রূপান্তর সাধন করলেন তার উপরে ভর করে পরবর্তীকালের কাব্য ছন্দ বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। অর্থাৎ কবিতা পাঠ করবার ভঙ্গী এবং ছন্দ পারস্পরিক আনুকূল্যে সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

একালে অনেকে বলেন শিল্পে রূপটাই বড় কথা, বিষয়টা গৌণ। এ নিয়ে তর্ক থাকতে পারে, আছেও। কিন্তু রূপের একটা মূল্য আছে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। রূপবাদী শিল্পীদের একটি বিশেষ স্থান আছে সাহিত্যের জগতে। এই দিক থেকে ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের রূপবাদী শিল্পীদের অগ্রগণ্য। তাঁদের উপর তাঁর প্রভাবও কম নয়। প্রমথ চৌধুরী তার অন্যতম উদাহরণ। ঐহিক চেতনা তৎপর, তীক্ষ্ণভাষী, পরিশীলিত বুদ্ধি, রূপবাদী ভারতচন্দ্র প্রমথ চৌধুরীকেও মুগ্ধ করেছেন। এতেই প্রমাণ হয় ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা এবং তাঁর প্রভাবের নিগূঢ়তা।

(৫)

ভারতচন্দ্রের রচনার নমুনা :

(ক) "কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায় ॥
মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥"

(খ) "বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ॥"

(গ) "আমি রাজার কুমার আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার ॥
বিদ্যাপতি মোর নাম বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম ॥
শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর ॥"

(ঘ) "আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥"

(ঙ) ভারতচন্দ্রের কিছু কিছু কাব্য পঙক্তি আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যেমন: "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন", "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার", "নীচ যদি উচ্চভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায়ে হাসে", "মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়", "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর" ইত্যাদি।

● দ্বাদশ অধ্যায় ●

॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিকতার আভাস ॥

(১)

সাহিত্য জীবনের শিল্পায়িত রূপ। আমাদের জীবন সমাজের সঙ্গে ঘাতে-সংঘাতে মোচড় খেতে খেতে এগিয়ে চলে অনাগত দিনের দিকে। এখানে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, অধ্যাত্মবাদ সব কিছুই আছে। বাইরেকার বিভিন্ন ঘটনার ধাক্কা এসে লাগে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে। ফলে চলতি জীবনধারার খাত-বদল ঘটে যায়। এই খাত-বদল সহসা একদিনে ঘটে না—ধীরে ধীরে নানা শক্তি, ঘটনা ভিতর থেকে চাপ দিতে থাকে, গতিও পরিবর্তিত হতে থাকে ধীর লয়ে। তারপর সহসা কোন ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পরিবর্তনের গতি হয় ত্বরান্বিত। আমরা সহসা লক্ষ্য করি যে আমরা অনেক বদলে গিয়েছি। ঠিক যেই সময়টা ঐ পরিবর্তন স্পষ্টগোচর হয়, অর্থাৎ যে কালের যে লগ্নে এসে বাঁক ফেরা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে সেই লগ্নটিকে আধুনিক বলে চিহ্নিত করি। তাহলে দেখা গেল আমাদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের, ধ্যান-ধারণা, মননের খাত-বদলের সঙ্গে "আধুনিকতা" কথাটি যুক্ত—সাল তারিখের ব্যাপার এইটে নয়। আর যেহেতু সাহিত্য জীবনের শিল্পরূপ তাই সাহিত্যে তার ছাপ পড়ে। এক কালের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আরেক কালের সাহিত্যের পার্থক্য ঘটে যায়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু তার প্রস্তুতি অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই পরিবর্তনের সূচনা কি ভাবে হল সেইটে আলোচনা করে দেখা দরকার। এমন ধারণা ঠিক নয় যে, এই দেশে ইংরেজ না এলে আধুনিক যুগ আসত না। বলা ভাল অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে পরিবর্তনের সূচনা দেখা দিয়েছিল, ইংরেজ বিজয়ের পরে তার সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য-ইতিহাস, বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে সেই পরিবর্তন হল ত্বরান্বিত।

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশ মোগল শাসনের অধীনে এল। তখন থেকেই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হল। সুবাদাররা আসতেন, দেশ শাসন করতেন, কিন্তু তাঁরা এই দেশের মানুষের সঙ্গে, সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি। বরঞ্চ লক্ষ্য করি তাঁরা সঙ্গে করে

এনেছিলেন বাদশাহী মেজাজ ও রুচি। এই সময় থেকেই নগর সভ্যতার পত্তন হল। বিদেশী বণিকেরা ব্যবসায় করবার পরওয়ানা নিয়ে হাজির হল বাংলা-দেশে, গড়ে তুলল বাণিজ্য কেন্দ্র। আর যাঁরা এই দেশে সুবাদার হয়ে আসতেন তাঁরা দেশকে শোষণ করে দিল্লীর রাজকর যুগিয়েছেন, আবার নিজেদের বিলাস-ব্যসনের জন্য নানা ফন্দি-ফিকিরে অর্থ যোগাড় করেছেন। গড়ে তুলেছেন বিলাস-বহুল নগরী। দিল্লীর দরবারী ঢঙে তাঁরা চলাফেরা করতেন। মোগল সুবাদাররা এবং বিদেশী বণিকেরা যে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে তুললেন তার ফলে বাঙালীর সমাজ শহর এবং গ্রামে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। অথচ এই দুয়ের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের কোন সমতা থাকল না। শহুরে-জীবনে বিলাস-ব্যসনের জৌলুষ আর গ্রাম্য-জীবনে অশিক্ষা, দারিদ্র্যের গাঢ় অন্ধকার। কেবল একটা বিষয়ে থাকল সমতা সেইটে হল চিত্তের আবদ্ধতা। মধ্যযুগীয় জীবন যাত্রায় এই বিপর্যয় দেখা গেল সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা ষোলকলায় পূর্ণ হল।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ প্রকৃত পক্ষে দিল্লীকে নামমাত্র কর দিয়ে স্বাধীনভাবে নবাবী করতে লাগলেন। তিনি রাজস্ব-ব্যবস্থার যে পরিবর্তন সাধন করলেন তাতে জমিদার এবং প্রজার সম্পর্কের প্যাটার্ন পাল্টে গেল। মুর্শিদ কুলি খাঁ কর আদায়ের যে বন্দোবস্ত করলেন, রাজকোষ বৃদ্ধির জন্য নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন, জমিদাররাও তা ফাঁকি দেওয়ার জন্য নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে লাগলেন। জমিদার ও প্রজার সম্পর্কও এরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ। টাকা আদায়ের এবং তাকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় উদ্ভাবন ব্যবহারিক চেতনার উন্মেষের দিকে ইঙ্গিত করে। জীবনধারায় যে খাত-বদল হচ্ছে তা বেশ বোঝা যায়। এই দুর্বিপাক দৈব-সৃষ্ট নয়,—মানুষের সৃষ্টি, এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় সন্ধানও দৈব নয়—মানবিক।

নবাব আলিবর্দীর আমলেও এর হেরফের হয় নি। তখন বর্গীর হাঙ্গামায় দুর্যোগ আরো ঘনীভূত। বর্গীর হাঙ্গামাকে ছোট করে না দেখেও বলা যেতে পারে যে, ঐ হাঙ্গামায় অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আঘাত পড়েছে ঠিকই কিন্তু তা নবাব, নবাবজাদাদের, ভূস্বামীদের শোষণ যে ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তদপেক্ষা বৃহত্তর বা গভীরতর ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে নি। দেশের অর্থ ক্ষমতা-বানদের হাতে ছিল পুঞ্জীভূত। কারণ ক্লাইভের উক্তি থেকে জানতে পারি তিনি সিরাজের ধনাগারে হীরা-জহরৎ দেখেছেন "piles on either hand" যার থেকে তিনি বিনীতভাবে মাত্র ৪০ লাখ টাকা নিজের জন্যে নিয়েছিলেন!

অথচ ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবাব বর্গীদের নিরস্ত করেছেন মোটা টাকার দাবি মিটিয়ে। এই টাকা সংগ্রহ করেছেন বিদেশী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ফেঁপে উঠা ধনকুবের শেঠদের কাছ থেকে। এই ভাবে রাজশক্তি ক্রমে বৈশ্যশক্তির হাতের মুঠোয় চলে আসে। আর এই বৈশ্যশক্তির রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ, ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র, ইংরেজ বিজয় নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। বাঙালীর জীবনযাত্রাকে সম্পূর্ণ নগরমুখী করেছে। এর পরেকার অধ্যায় আধুনিক। সে ইতিহাস স্বতন্ত্র। কেবল লক্ষণীয় হল আধুনিকতার সূচনা এই ভাবে হয়েছে।

অতএব লক্ষ্য করছি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ছক পাল্টাতে আরম্ভ করেছে। জীবনযাত্রার ছাঁদ বদলাতে সুরু করেছে। মানুষের ভাবনা-চিন্তারও পালা বদল সুরু হয়েছে একটু একটু করে। মানুষ এবার দেবতার করদ-রাজ্যে নতশির প্রজা হয়ে থাকতে রাজী নয়। একটু একটু করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। জীবনে যে দুর্বিপাক নেমে আসে তার সমাধানের জন্য দেব-নির্ভরতা ছেড়ে মানবিক উপায়ের উপর ঝোঁক পড়েছে। অবশ্য দেবতা একেবারে অস্বীকৃত নন, একেবারে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় নি, কিন্তু তাঁর উপরে অখণ্ড আস্থা নেই। দেবতার অবস্থান এখন ভাবস্মৃতিতে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্য করেছেন,—"বর্তমান যুগেও আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের প্রত্যক্ষীকৃত অলৌকিক দেবমহিমার কথা আলোচনা করি ও উহার প্রতি ক্ষীণ বিশ্বাসও পোষণ করি। কিন্তু এই অপ্রাকৃত শক্তিকে ভাবস্বীকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না করিলেও কার্যতঃ মানবিক প্রতিকারের উপায়ই প্রয়োগ করিয়া থাকি।" অর্থাৎ ভক্তি যে উবে গেছে তা নয়—ভক্তির গভীরতা নেই। মোটা কথাটা হল মানুষের বৈষয়িক বুদ্ধি প্রখর হয়ে উঠেছে—ঐহিক চেতনা-তৎপর হয়ে উঠছে মানুষ।

(২)

ভারতচন্দ্রের আধুনিকতা :

আগে বারবার বলেছি সাহিত্য জীবনের শিল্পায়িত রূপ। জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঘটনাগুলো ভারমুক্ত হয়ে শিল্পায়িত হয় কাব্যে। একালে জীবনের খাত-বদলের ছবি কমবেশি পরিস্ফুট হল ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং গঙ্গারামের

কাব্যে। ভারতচন্দ্র মঙ্গলকাব্যের ছাঁচে আধুনিক জীবনচর্চা করেছেন। ভারতচন্দ্রে লক্ষ্য করছি, তিনি ঐহিক চেতনা-তৎপর। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করে কাব্য রচনা করেছেন বৈষয়িক সমৃদ্ধির দিকে নজর রেখে। তাঁর ঈশ্বরী পাটনী দেবীর কাছে রাজ্যপাট প্রার্থনা করে নি—চেয়েছে "সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" দেবী যখন হরিহোড়কে কৃপা করেছেন তখন লক্ষ্মী চঞ্চলা এই বাস্তববোধ থেকে সে দেবীর সঙ্গে চুক্তি করেছে যে, তার দিক থেকে কোন ত্রুটি না ঘটলে দেবী তাকে ত্যাগ করবেন না। কালকেতু এই কথা ভাবতেই পারে না। এছাড়া ভারতচন্দ্রের দেবদেবীকে নিয়ে বিদ্রূপ, বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বিন্যাসে লৌকিক মনোভঙ্গী, জগৎ ও জীবনের প্রতি বিদ্রূপাত্মক (Satirical) মনোভঙ্গী আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত। তাঁর কথা বলবার বিশেষ ঢঙ নিঃসন্দেহে আধুনিক। তাঁর কাব্যে নাগরিক মনোভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কাব্য-কবিতা যে নগরমুখী হতে চলেছে তা বেশ বোঝা যায়। পরবর্তী কাব্য-সাহিত্যের বারো আনাই নগরভিত্তিক, শহুরে জীবনের কাহিনী। শুধু তাই নয়, নিদেনপক্ষে ভাষাশিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পরবর্তী-কালের কথা-সাহিত্যে যেখানে পল্লীজীবনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেখানে ভাষাশিল্পে নাগরিক মেজাজ ফুটে উঠেছে। সেখানে লক্ষ্য করি প্রতিটি শব্দ ওজন করা, পাঠকচিত্তে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তাঁরা সজাগ। শব্দ বাছাই এবং বিন্যাস নৈপুণ্যে ভাষা হয়ে উঠে শিল্প। পাথর কুঁদে মূর্তি নির্মাণ করবার মতো। ভাবকে যথাযথ ভাবে ধরে দেওয়ার জন্য ভাষার ঘষামাজা করতে হয়। শব্দের economy-র উপর নজর খুব সজাগ। ভারতচন্দ্রের লেখায় এই গুণটি রয়েছে। এইখানে তাঁর আধুনিকতা।

রামপ্রসাদের আধুনিকতা ঃ

আখ্যানধর্মী কাব্য-কবিতার বস্তুনির্যাস ছেঁকে নিয়ে গীতি-কবিতা রচিত হয়েছে এমন নিদর্শন আধুনিক বাংলা কাব্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। গল্পের বিষয় গীতি কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে এমন নজীরও দুর্লভ নয়। রামপ্রসাদে এসে প্রথম লক্ষ্য করা যায় মঙ্গলকাব্যের বস্তুনির্যাস ছেঁকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, বাস্তবিক জীবনের ক্রূরতা, বঞ্চনা আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। জ্বালা-যন্ত্রণার সামান্য ইঙ্গিতে অভিঘাত সৃষ্টি করে ভক্তহৃদয়কে গীতিসুরে উজার করে দিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিচিত্তের ব্যথা-বেদনার সুর শোনা যায়। চারপাশের দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুকে অবলম্বন করে ব্যক্তিচিত্তের আকৃতি

প্রকাশ করা আধুনিকতা ধর্মী। বৈষ্ণব-গীতিতে গোষ্ঠীমনোভাব প্রবল—রামপ্রসাদে ব্যক্তিচিত্তের প্রকাশ মুখ্য। রামপ্রসাদ ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, রাজ অনুগ্রহের উপর তাঁকে ভরসা করে থাকতে হয়েছে। তাতেও দারিদ্র্য ঘোচে নি। কিন্তু সাধক কবি সাধনার জোরে সব কিছু হজম করে নিয়ে মহাচৈতন্যলোকে বিচরণ করেছেন, কিন্তু সেখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না, বাস্তব দারিদ্র্যের জ্বালায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। বাস্তবজীবন তার জ্বালা-যন্ত্রণা, হাহাকার নিয়ে করাল মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। এখানেই তৎকালীন প্রচলিত কাব্যধারার সঙ্গে তাঁর প্রভেদ। বৈষ্ণব কাব্যে এহেন বঞ্চনার কোন প্রসঙ্গ নেই। বরঞ্চ বৈষ্ণব কাব্যে দেখি কবি-প্রতিভার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বস্তুজগতের রূপটাই পাল্টে গেছে। রামপ্রসাদের কবিকৃতিতে বস্তুজগৎ বস্তুস্বরূপে থেকেও ভিন্নতর তাৎপর্য দ্যোতনা করছে—অধ্যাত্ম জগতের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করছে। প্রাত্যহিক জীবনের হাহাকার, অভাব, বঞ্চনার মৃৎবেদিকায় অধ্যাত্ম সাধনার আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের দারিদ্র্য-বঞ্চনা দৈবী-মহিমায় আবৃত। রামপ্রসাদের সঙ্গে পূর্ববর্তীদের যে প্রভেদ সেইটেই তাঁর আধুনিকতা।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কাব্যে "Racy speech of the peasants" আমদানী করতে চেয়েছিলেন। তাতে কাব্যের শিল্পগত উৎকর্ষ বাড়ে কি বাড়ে না সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু মনোভঙ্গীটা আধুনিক। রামপ্রসাদের কবিকৃতিতে দেখি অনুভূতি প্রকাশের বাহন হিসাবে দৈনন্দিন জীবনের মুখের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে তা মণ্ডিত। রূপক-উপমা, সব চারপাশে ছড়িয়ে থাকা জীবনধারা থেকে সংগৃহীত। প্রতিদিনকার দেনা-পাওনার ভাষা কাব্যলোকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মনে হয়, প্রতিদিনকার ব্যবহারে দীর্ণ-জীর্ণ ভাষা এক সাধক কবির ব্যক্তিত্বের স্পর্শে কাব্যত্ব অর্জন করেছে। অথচ ঐ শব্দগুলো অধ্যাত্ম বিভামণ্ডিত হয়েও আপন বস্তু ধর্ম বিসর্জন দেয় নি। এইখানে রামপ্রসাদের আধুনিকতা। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বাণীতেও অনুরূপ লক্ষণ রয়েছে। শাক্ত কবির অনেক পদ আজ প্রবচনে রূপান্তরিত হয়েছে।

গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণঃ

গঙ্গারাম দত্তের "মহারাষ্ট্র পুরাণ" বা "ভাস্কর পরাভব" ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে

রচিত। "মহারাষ্ট্র পুরাণ" কাব্য হিসাবে উঁচু দরের নয়। এই কাব্য প্রসঙ্গে লক্ষণীয় কবির ঐতিহাসিক বোধ। বাংলাদেশে বহু ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে, বহু বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু সেই সবই ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে আছে। বাঙালী কবির মন সেই সব ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করে নি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর হাঙ্গামা বাঙালীর জীবনে দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসেছিল। এই ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙালী কবির কল্পনাকেও নাড়া দিয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাকে কাব্যের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করবার প্রবণতা ইতিহাস চেতনার লক্ষণ তথা আধুনিক চেতনা উন্মেষের দিকে ইঙ্গিত করে।

গঙ্গারাম কাহিনী কথনে পুরাণের আদর্শ অনুসরণ করেছেন ঠিকই কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিতের অভিযানের বর্ণনায়, পথঘাটের বর্ণনায়, দেশে বিপর্যয়ের বর্ণনায় ইতিহাস কথা অনুসরণ করেছেন। পাপ-পুণ্যের সহজ বোধ কাব্যের মৌলিক প্রেরণা। এই কাব্যে লক্ষ্য করি মুসলমান শাসকদের অনাচারে, অত্যাচারে রুষ্ট মহাদেব নন্দীকে পাঠিয়ে সাহু রাজাকে বাংলাদেশ থেকে পাপকে তাড়াতে হুকুম করলেন। ভাস্কর পণ্ডিত মারাঠাবাহিনী নিয়ে বাংলায় অভিযান করলেন। এবারে মারাঠাদের অত্যাচারে, নারীনিগ্রহে দেবী পার্বতী ক্ষুব্ধ হলেন, ফলে ভাস্করের পতন হল। এর মধ্যে লক্ষণীয় হল যে দেবদেবী ঘটনার নিয়ন্তা হলেও তাঁদের ইচ্ছাকে রূপায়িত করবার যন্ত্র হল মানুষ—ভূত-প্রেত, সাপ, হনুমান নয়। দৈব নিয়ন্ত্রণ প্রথাগত ভাবে এসেছে—উপর থেকে আলগাভাবে জুড়ে দেওয়া, না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না। কেননা লক্ষ্য করছি বর্গীদের হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত নবাব আলিবর্দী মানকরার শিবিরে ভাস্কর পণ্ডিতকে মারাঠাদের সঙ্গে একটি সন্তোষজনক বোঝাপড়া করবার অছিলায় ডেকে এনে যে ভাবে নিহত করলেন এবং দেশকে বর্গীমুক্ত করলেন সেইটে পরিচ্ছন্ন মানবিক উপায়। যদিও গঙ্গারাম বলেছেন দেবীর কোপে ভাস্করের বুদ্ধিলোপ ঘটেছিল বলেই তিনি নবাবের শিবিরে নিরস্ত্র হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাই তাঁকে নিহত করা সম্ভব হয়েছে। এই কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। কূটনীতির দিক থেকে ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ঝোঁকটা মানবিক কার্যকলাপের উপরে পড়েছে। ইতিহাসের বিষয় কল্পনায় জারিত হয়ে কাব্যের স্তরে উঠে নি। কিন্তু ইতিহাসকে কাব্যের বিষয় হিসাবে গ্রহণ এবং তৎপ্রতি আনুগত্য আধুনিকতার পূর্বাভাস বলে গণ্য হতে পারে। ইতিহাসের কাব্য রূপান্তরণের জন্য আমাদের "পলাশির যুদ্ধ" (১৮৭৫) কাব্য পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সুতরাং দেখা গেল অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন সুরু হয়েছিল, মানুষের চেতনার উপর তার ধাক্কা এসে পড়ল। একটু একটু করে চেতনার মোড় ফেরা সুরু হল। এর প্রথম লক্ষণ ব্যবহারিক জীবন-সচেতনতা এবং ইতিহাস বোধ। কাব্যশিল্পে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও তির্যকভাবে তার প্রতিফলন ঘটল। ভারতচন্দ্রের ঐহিক চেতনায়, নাগরি-বৈদগ্ধ্যে, ভাষাশিল্পে, রামপ্রসাদের ব্যক্তিক অনুভবে, তার প্রকাশ রীতিতে, গঙ্গারামের ইতিহাসবোধে আধুনিকতার সূচনা দেখা গেল। এরপর ইংরেজ বিজয় তার আনুষঙ্গিক কার্যকারণ সম্পর্ক এই বোধকে আরো পরিপুষ্ট করেছে। সেই ইতিহাস স্বতন্ত্র। এইখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য-পরিক্রমার সমাপ্তি। পরবর্তী ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচ্য।

গ্রন্থপঞ্জী

১। দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য।
২। দীনেশচন্দ্র সেন : ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।
৩। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা, ১ম খণ্ড।
৪। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা।
৫। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : চণ্ডীমঙ্গল।
৬। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড।
৭। ডঃ ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, ১ম পর্যায়।
৮। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ।
৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : গীতিকাব্য, বিদ্যাপতি ও জয়দেব : বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড।
১০। মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত : চর্যাপদ।
১১। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
১২। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।
১৩। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য : লোক সাহিত্য, ১ম খণ্ড।
১৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : গোপীচন্দ্রের গান।
১৫। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য।
১৬। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতীয় সাধনার ঐক্য।
১৭। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি।
১৮। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস।
১৯। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস।
২০। Sir John Woodroffe : Shakti and Shakta.
২১। Dr. S. Dasgupta : Obscure religious cults as background of Bengali literature.
২২। Acharya D. C. Sen : Eastern Bengal Ballads.
২৩। C. Day Lewis : The Poetic image.
২৪। T. K. Roy Chowdhury Bengal under Akbar and Jahangir.
২৫। Rene Wellek and Austin Warren : Theory of Literature.